রবীন্দ্রনাথ-অনূদিত 'কুমারসম্ভব'-এর দ্বিজেন্দ্রনাথ-কৃত সংশোধন

'মালতী-পুঁথি' : পৃ. ৪৩

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মন ও শিল্প

মৈত্রেয়ী মিত্র

জি জ্ঞা সা
কলকাতা
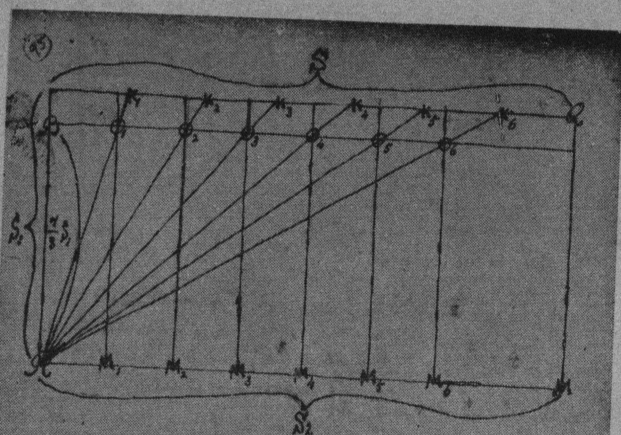
Observing that the common denominator $\overline{V}(=7) > 2^2$ but $< 2^3(=8)$ and that therefore $2^M = 8$ [(6·5)], obtain the following marginal rectangles by the method indicated in Prop. VI and the extended diagonals of bimarginal rectangles by the method indicated in Prop III.

I. The marginal rectangles

$\square\, \overline{RM_1} \left(= \frac{1}{8} S_2\right)$
$\square\, \overline{RM_2} \left(= \frac{2}{8} S_2\right)$
$\square\, \overline{RM_3} \left(= \frac{3}{8} S_2\right)$
$\square\, \overline{RM_4} \left(= \frac{4}{8} S_2\right)$
$\square\, \overline{RM_5} \left(= \frac{5}{8} S_2\right)$
$\square\, \overline{RM_6} \left(= \frac{6}{8} S_2\right)$
$\square\, \overline{RP} \left(= \frac{7}{8} S_1\right)$

II. The extended diagonals.

RO_1K_1	of the bimarginal rectangle		BM_1
RO_2K_2	"	"	BM_2
RO_3K_3	"	"	BM_3
RO_4K_4	"	"	BM_4
RO_5K_5	"	"	BM_5
RO_6K_6	"	"	BM_6

‘রক্ষোমেট্রি’ বা ‘Paper folding measurement’
খাতার একটি পৃষ্ঠা।

Dwijendranath Thakur : Mon o Silpa
by Moitreyee Mitra

প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮৮ : মে ১৯৮১

প্রকাশক
শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা : প্রকাশন বিভাগ
১এ কলেজ রো । কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট । কলিকাতা ৪

'রেখাক্ষর বর্ণমালা' : পৃ. ১

মা ও তিন মামীমাকে

“সৌন্দর্য্য” : ‘পারিবারিক খাতা’র একটি পৃষ্ঠা।

নিবেদন

আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে দ্বিজেন্দ্রনাথ বিষয়ে পড়াশুনো আরম্ভ করেছিলাম। ডক্টর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর নির্দেশে এই গ্রন্থ রচিত হয়। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য এটি পেশ করি। তাঁদের অনুমোদনের পর. পর বৎসরই গবেষণা-গ্রন্থটিকে কিছু পরিবর্তন ও সংশোধন করে ছাপার উপযোগী পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। কিন্তু নানা কারণে ছাপার কাজ শেষ করা সম্ভব হয় নি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু সাধারণের কাছে তাঁর দার্শনিক রূপটি অধিক পরিচিত। সেই পরিচিত দিকটি ছাড়াও তাঁর চরিত্র ও সাহিত্যকর্মের অন্যান্য বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এই বই-এর মধ্যে কিছুটা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। বিস্মৃতপ্রায় এই আশ্চর্য মানুষটির প্রতি পাঠক সমাজের কিছুমাত্র আগ্রহ সঞ্চার করতে পারলে আমার এ প্রয়াস সার্থক মনে করব।

গবেষণামূলক গ্রন্থ বলেই প্রামাণিকতা রক্ষার জন্য নানা তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ধৃত করতে হয়েছে। ফলে এতে টীকার পরিমাণ একটু বেশি। দ্বিজেন্দ্রনাথের অনেক রচনাই এখনো সাময়িক পত্রিকার পাতাতেই থেকে গেছে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে তার যেটুকু খোঁজ পেয়েছি— তার একটি তালিকা গ্রন্থশেষে দিয়েছি। এ ছাড়া অন্যান্য রচনাপঞ্জীও পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে।

গ্রন্থটির প্রস্তুতি ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকেই নানাভাবে সাহায্য করেছেন। প্রথমেই নাম করতে হয় শ্রীপুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের। এই পরিকল্পনা তাঁরই চিন্তাপ্রসূত। তিনি আমায় জোর করে এ পথে না নিয়ে এলে আমি হয়তো কখনোই এ কাজে হাত দিতাম না। এর পরেই মনে আসে বন্ধুবর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কথা। তাঁর দক্ষ পথ-প্রদর্শন ছাড়া আমি এ কাজ শেষ করতে পারতাম না। নিজের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সময় করে এই ব্যস্ত মানুষটি ধৈর্যসহকারে যেভাবে পদে পদে আমায় সাহায্য করেছেন তার জন্য তাঁর কাছে আমি ঋণী। শ্রীশঙ্খ ঘোষ গ্রন্থমধ্যে তাঁর একটি ব্যক্তিগত চিঠি আমায় ব্যবহার করতে দিয়েছেন। বিভিন্ন পরামর্শ ছাড়াও শেক্সপীয়রের মূল রচনাটিও তিনি আমায় খুঁজে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া প্রথম থেকে শেষ

পর্যন্ত তিনি একবার লেখাটি পড়ে দেন। দর্শন বিষয় আলোচনা করার সময় বারবার শ্রীসতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাহায্য নিতে হয়েছে। যেখানেই অবোধ্য ঠেকেছে তিনি আমায় প্রয়োজনীয় অংশ বুঝতে সহায়তা করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে দুষ্প্রাপ্য পত্রিকাদি ঘেঁটে গ্রন্থসূচী এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনার তালিকা প্রণয়নে বিশেষ শ্রমস্বীকার করেছেন শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। এ ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রনাথের কিছু চিঠি ও অপ্রকাশিত রচনার সন্ধান তিনি দিয়েছেন; প্রয়োজনমতো পাণ্ডুলিপির আংশিক প্রস্তুতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে এবং মুদ্রণ-ব্যাপারেও তাঁর সযত্ন সহকারিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-ভবনের কর্তৃপক্ষ গ্রন্থশেষে প্রদত্ত পাণ্ডুলিপির প্রতিচিত্রণ ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন। এ ছাড়া যাঁদের সহায়তা ও পরামর্শে এই গ্রন্থ পুষ্ট হয়েছে তাঁরা হলেন— ড. নীহাররঞ্জন রায়, ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীশিশির মিত্র, শ্রীমতী ম্যারিয়ন দাশগুপ্ত, শ্রীরমাপ্রসাদ দে, শ্রীতরুণ চক্রবর্তী, শ্রীসুভাষ চৌধুরী; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জাতীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ও বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-ভবনের কর্মীবৃন্দ এবং আমার বোন ও ভগ্নিপতি শ্রীমতী রাণু ও ড. অসীম রায়চৌধুরী। এঁরা সকলেই কোনো-না-কোনো ভাবে আমায় সাহায্য করেছেন। আরো অনেকের কথা হয়তো উল্লেখ করা হল না। এঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী।

শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয় এই রচনাটি প্রকাশের ভার গ্রহণ করে আমায় চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রীগোপাল প্রেসের কর্মীগণ গ্রন্থমুদ্রণে আনুকূল্য করেছেন।

নানা প্রতিকূলতার মধ্যে গ্রন্থটির রচনা ও প্রকাশের কাজ করতে হয়েছে। বৈদ্যুতিক গোলযোগ ইত্যাদি কারণে ছাপার কাজেও বারবার বাধা পড়েছে। বেশ-কিছু ছাপার ভুলও থেকে গেল। বিষয়ের অপূর্ণতা সম্বন্ধেও আমি অবহিত। আশা করি সহৃদয় পাঠক এর জন্য ক্ষমা করবেন।

জাকির হুসেন কলেজ
দিল্লী
২৬ জানুয়ারি ১৯৮১

মৈত্রেয়ী মিত্র

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মন ও শিল্প

যুগভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৪০) দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম। তখন যুগপ্রতিবেশ ও স্বদেশে কালান্তরের প্রেরণা ও প্রবর্তনা। দ্বিজেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে ও সাহিত্যে এই যুগের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন না ঘটলেও অবশ্যই তার একটা প্রভাব পড়েছে। সেজন্যই তাঁর জীবন এবং সাহিত্য পর্যালোচনার আগে সেই নবজাগরণের যুগ, তার পরিপার্শ্ব ও ভাব-মণ্ডল সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কোনো মহৎ শিল্পীই দেশকালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন। তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই তাঁকে অন্য সকলের থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করছে। এবং এই বৈশিষ্ট্যই তাঁর রচনার প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু সেইসঙ্গে এই সত্যও মেনে নিতে হবে যে লেখক তাঁর রচনায় যুগসম্পর্কে তাঁর মনোভঙ্গিকে একটি বিন্যাস দান করবেন।

'আধুনিক ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী একটি স্বর্ণযুগ।'[১] কিন্তু তাঁর প্রাগ্‌বর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বাঙালির ইতিহাসে সংকট ও সংক্রান্তির পর্ব। এই সময়েই বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের অবসান এবং ইংরেজ আমলের গোড়া পত্তন। এই-রকম ক্রান্তিকালে কোনো একটি দেশে যত রকমের নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা সম্ভব বাংলায় তার সবই দেখা দিয়েছিল।

সে সময় কোম্পানির (ইস্ট ইণ্ডিয়া) দুটি রূপ— বণিক ও শাসক। উভয়-ক্ষেত্রেই তারা একশ্রেণীর বাঙালির সাহায্য লাভ করে। এবং সেই বাঙালি সম্প্রদায়ও নানাভাবে ইংরেজ-সহায়তা পায়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬) প্রপিতামহ জয়রাম ঠাকুরও (?-১৭৫৬) ইংরেজ শাসক সংস্থার অধীনে কাজ করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন এবং সেই অর্থের সাহায্যে জমিদারি ক্রয় করেন। উত্তরাধিকারসূত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ এই সম্পত্তি পান এবং দক্ষতার সঙ্গে ঐ প্রাপ্য বিষয় রক্ষা এবং বৃদ্ধি করেন।

বিদেশের যা-কিছু সুনির্বাচিত তাকে সর্বতোভাবে পরিগ্রহণ করে স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর উন্নতি করা তাঁর জীবনের প্রধান কাম্য ছিল। বে-সরকারী

ইউরোপীয় সংস্কার সহায়তায় তিনি তাঁর সেই কামনাকে বাস্তবে পরিণত করতে আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর মতো আরো কয়েকজন মনীষীও এইভাবে চিন্তা করেন।

গত শতকে এদেশের সমাজে যে চিন্তাবিপ্লব দেখা দেয় তাকে ঐতিহাসিকগণ 'সামাজিক বিপ্লব' আখ্যা দেন। চিন্তাজগতের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে ব্যাপক জাগরণ ঘটে তার কথা ভাবতে গিয়ে স্বভাবতই মনে পড়ে ইউরোপের কালান্তর ও ক্রান্তির সাক্ষ্যবহ রেনেসাঁসের কথা।

ইউরোপের এই রেনেসাঁসের প্রকাশ প্রধানত তিনটি ধারায়— প্রাচীন জ্ঞান ও কাব্যকলায় নতুন আবিষ্ক্রিয়া, জীবন সম্বন্ধে মানুষের নতুন আশা-আনন্দ এবং ধর্ম বা জীবনাদর্শ সম্বন্ধে নতুনবোধ। এই নবজন্মের প্রভাবে পাশ্চাত্য জগৎ তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রথাশ্রয়িতা ছাড়িয়ে আধুনিক হয়ে ওঠে। প্রাচীন মূল্যবোধের পরিবর্তে নতুন মূল্যবোধ একই সঙ্গে মানসিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আনল।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে জাগরণ ঘটে তাকেও এমনি একটি রেনেসাঁস বলা যেতে পারে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বা সমালোচক এ সিদ্ধান্তকে মেনে নেন নি। কেউ বা এর মধ্যে আংশিক মিল দেখেছেন এবং আমাদের জাতীয় জীবনে রেনেসাঁসের একটি স্থান নির্ধারণ করেছেন।[২]

'বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরাজ জাতির ইতিহাসে।'[৩] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সংঘাত ও সামঞ্জস্যে এ দেশে এক নবযুগের সূচনা হল। এবং সমগ্র শতাব্দী ধরে এর রূপায়ণের কাজে রামমোহন (১৭৭৪-১৮৩৩)[৪] থেকে বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) পর্যন্ত বহু মনীষী এবং যুগন্ধর ব্যক্তি কমবেশি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

নবরূপায়ণের কার্য মূলত শুরু হয় শিক্ষাকে ভিত্তি করে, এই বিশ্বাসে যে পশ্চিমের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন বিষয়ে আমরা যে নতুন নতুন জ্ঞান লাভ করব তা যদি ঠিকমত আমাদের সমাজে গ্রহণ করা যায় তবেই আমাদের দেশ এবং সমাজের উন্নতি সম্ভব। কোনো কোনো অগ্রণী চিন্তাবিদ আবার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের শিক্ষাবিপ্লবকেও স্বাগত জানান।

ভারতবাসীরা ব্যাবসাসূত্রে ব্রিটিশমানসের সংস্পর্শে এসে বুঝতে পারলেন

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে ইংরেজ বলীয়ান, তাই তার ক্ষমতা অসীম। বাঙালির মন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে সে তার নিজের প্রচলিত ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সব-কিছুই যাচাই করে নিতে চাইছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের আগে বাংলা সাহিত্যের জগতে যে পরিবর্তনের সূচনা হয় কোনো কোনো ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তার স্তরবিন্যাস এইভাবে চিহ্নিত হয়েছে :

১ খ্রীস্টান মিশনারি যুগ, ১৮০০-১৮২০

২ ইংরাজী শিক্ষা পর্ব বা ডিরোজিও যুগ (হিন্দু কলেজ), ১৮২০-১৮৩০

৩ সংস্কার যুগ (রামমোহন ও বিদ্যাসাগর), ১৮৩০-১৮৫৯

৪ নব্যহিন্দু যুগ (বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ দেব প্রমুখ), ১৮৫৯-১৯০০[৫]

এর সঙ্গে সঙ্গেই যেন এল দ্বিজেন্দ্রনাথের

৫ নব্যরোমান্টিক যুগ (দ্বিজেন্দ্রনাথ), ১৮৭০-১৯০০

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতীচিবিশ্বে বিজ্ঞান প্রাধান্য পেয়েছিল। পুঁথিগত চিন্তাচৈতন্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনল। সমগ্র ইউরোপেই হার্দ্য বিশ্বাস আহত। এই প্রতিমুখী রোমান্টিক আবেগময় কাব্যে জীবনের জটিল কোনো ধারণাকে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে ইংল্যাণ্ডের সমাজে যে অবক্ষয়ের যন্ত্রণা তারই ফলস্বরূপ প্রত্নমূল্যমান ভেঙে গিয়ে কবি এবং শিল্পীর চার দিকে একটি নিঃসঙ্গ নির্মম জগৎ গড়ে উঠল।

ভারতবর্ষেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সনাতন ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে নতুনবোধ, আত্মপ্রতীতি গড়ে উঠল। আলোকপ্রাপ্ত বাঙালিমানসের ক্রমশই পশ্চিমী ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটল। দেশের নানারকম গঠনব্রতে বাঙালির অংশগ্রহণ একালেরই ঘটনা।

এ কারণ ছাড়াও অন্য একটি কারণে বাঙালির একটি বৃহদংশ সে সময় সংঘবদ্ধতার প্রয়াসী হন। 'সাধারণ ভাবে খ্রীস্টীয় সমাজ এবং বিশেষভাবে খ্রীস্টান পাদ্রীগণ তখন ভারতবাসীদের আচার-আচরণ, সমাজব্যবস্থা, পূজার্চনা প্রভৃতির নিন্দাভাবে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল।'[৬] প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, পুস্তক, সাহিত্যের মাধ্যমে এর প্রতিবাদ জানানো দরকার দেখা দিয়েছিল। নানারকম মিশ্রিত কারণেই তৎকালীন জনজাগরণ ঘটে।

সংঘবদ্ধ গঠন বা কোনো গোষ্ঠীকে যদি এই জাগরণের আধার বলে ধরতে হয় তবে তা ব্রাহ্মসমাজ। আর এই জাগৃতির অন্যতম প্রথম প্রবক্তা হিসেবে রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) নামই উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু সেই যুগে তাঁর পক্ষে একা এ কাজ অত্যন্ত কঠিন ছিল। যে যুগে সাধারণ মানুষ অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কারে অন্ধ ; যে সময় সাধারণের হাতে দু-একটি গ্রন্থ ব্যতীত কোনো যথোচিত সংবাদপত্রের মাধ্যম ছিল না— সেই সময় অনর্পিত সমাজ-সংস্কার যে কী কঠিন কাজ তা পরবর্তীকালে অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। দেশবাসীর এই অভাব রামমোহন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ; তাই তিনি সংবাদপত্রের অভাব দূর করবার চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী কোলেট (১৮২২-৯৪) বলেছেন :

> It is characteristic of Rammohun's many-sided activity that during the period of his energetic and theological controversy, he was busily engaged in promoting native journalism and native education. His role was essentially that of the Enlightener ; his one aim in publishing treatises on Unitarian divinity, in founding schools and colleges, and in conducting two newspapers was to enlighten the minds of his fellow countrymen.[৭]

রামমোহনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে (অর্থাৎ ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতায় আসবার পরে,) তাঁর সংবাদপত্র পরিচালনা, এবং যুক্তি, বুদ্ধি ও তর্কদ্বারা মিশনারীদের মতের প্রতিবাদ করায় কলকাতার বাঙালি হিন্দুসমাজ আত্মসচেতন হলেন এবং তাঁদের মধ্যে গোষ্ঠীচেতনা ফিরে এল।

রামমোহন কলকাতা আসার আগে রংপুরে ছিলেন। সেখানে তাঁর বাসভবনে বিভিন্নধর্মের মানুষ সমাগত হতেন। রামমোহন তাঁদের কথা শুনতেন এবং তাঁর একেশ্বরবাদে বিশ্বাস ঘোষণা করেন। সেখানে, শোনা যায়, তিনি গ্রন্থাকারে প্রথমে তাঁর মত প্রকাশ করেন এবং পরে সেখানকার তৎকালীন জজসাহেবের দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত, গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য, গ্রন্থ প্রকাশ করে তাঁর মতের প্রতিবাদ করেন। ফলে তিনি কলকাতায় আগমনের পূর্বেই আলোচনা এবং গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে বাদানুবাদের সঙ্গে পরিচিত হন।

দেশের সর্বত্র একটা আন্দোলন-স্রোত বইতে থাকে। কলকাতায় অনেকেই তাঁর পাশে এসে মিলিত হলেন। এঁদের সবাইকে নিয়ে তিনি ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করলেন।

তাঁর একেশ্বরবাদ প্রচারের ফলে দেশীয় হিন্দু পণ্ডিতগণ অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। এদিকে আবার খ্রীস্টান মিশনারীগণের সঙ্গেও তাঁর বিবাদ উপস্থিত হল।[৮] রামমোহন কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থ' এবং তার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হল (১৮১৫-১৬)। এই গ্রন্থ প্রকাশকেই বাংলায় রেনেসাঁসের মূল ঘটনা বলে এই কারণে গ্রহণ করা যায় যে, এটি প্রকাশের ফলেই দেশের মানুষের মধ্যে একটি নতুন চেতনার সূচনা হল এবং বাইরের বহু মনীষীই আবার নতুন করে প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। বইটি যদিও ধর্মসংস্কারমূলক তবে তার মধ্যে যে ধর্মের উল্লেখ তা ঠিক বিধি-বিধান-সমন্বিত ও পরকালসর্বস্ব নয়। তার প্রধান উপজীব্য হল ইহকালেরই উৎকর্ষ সাধন।

ব্রাহ্মধর্মের মূল আদর্শ হল :

'The ideal of the harmonious development of all the faculties of man, physical, intellectual, moral and spiritual, as the highest object of religion.'[৯]

তাঁরা এ শিক্ষা গ্রহণ করলেন থিওডোর পার্কার (১৮১০-৮৮)-এর ধর্মগ্রন্থ থেকে। ব্রাহ্মসমাজের গঠনের মধ্যদিয়ে শিক্ষিত বাঙালি নিজের প্রকাশের পথ খুঁজে পেল। রামমোহনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজের দুই দিকপাল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এবং কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩২-৮৪) কথা মনে আসে।

কিন্তু রামমোহনের ইউরোপ-যাত্রার পর থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব পর্যন্ত অথবা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান পর্যন্ত দেশের যুবমানসের নেতৃত্ব করলেন হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) এবং তাঁর শিষ্যরা। রামমোহন-পন্থীরা নন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-৫৯) সাময়িকী 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ অনূদিত—সেই যুগের বিপ্লবী ও প্রগতি লেখকদের 'গীতা' *Age of Reason* -এর রচয়িতা টমাস পেইনের (১৭৩৭-১৮০৯) মৃত্যুবর্ষে ডিরোজিওর জন্ম; পেইনের আরব্ধ কৃতি এ দায়িত্বের

দায়ভাগ যেন ডিরোজিও-র উপর বর্তেছিল। ডিরোজিও-পূর্ববর্তী অন্য একজন বিদেশীর নামও উনবিংশ শতাব্দীর নবরূপায়ণে মনে আসে। তিনি স্কটল্যাণ্ডবাসী ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২)। তিনি উপলব্ধি করেন এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত না হলে এদেশের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটবে না।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) তাঁর গ্রন্থে[১০] বলেছেন, লৌহ যেমন চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয় ডিরোজিও-শিষ্যগণ সেইরকম তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই বইতেই শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮২৫ থেকে ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দুই দশক বাংলার নবযুগের জন্মকাল বলে সূচিত করেছেন।

ডিরোজিও-মতাবলম্বী বা তাঁর শিষ্যদের সাধারণত রামমোহন-বিরোধী গোষ্ঠী বলে ধরা হয়। এর প্রধান কারণ বোধ হয় রামমোহন এবং তাঁর শিষ্যেরা ধর্মবিশ্বাসী ও জাতীয়-ভাবাপন্ন। কিন্তু এই দুই গোষ্ঠীকে বিপরীত গোষ্ঠী বলে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কেননা যে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানকে রামমোহন অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেই মতবাদ বা পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রসার ডিরোজিও-পন্থীদের নিবিড় অনুরাগের দ্বারাই এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

রামমোহনের সমসাময়িক ডিরোজিও-শিষ্যগণ— কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১০-৮৫), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-৭৮), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৪-৬৮), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০), তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৬-৫৭), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-৬৮) প্রভৃতি তরুণ-ছাত্রগণ কলকাতার তৎকালীন সমাজে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এই সময়ে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ সবদিকেই নবযুগের সূচনা হয়েছিল। এবং সেই নবযুগের প্রবর্তনে এঁদের সকলের দানই স্বীকার্য।

ইংরেজ শাসকবর্গও প্রথম পর্বে নানা কারণে ভারতীয় সংস্কারগুলিকে যথেষ্ট সমীহ করে চলতেন। অংশত ভয়, অংশত জনসাধারণকে খুশি করার ইচ্ছেয় এবং অংশত রাজনৈতিক কারণে ইংরেজ শাসনকর্তাগণ সকল বিষয়েই প্রাচীন নিয়মকানুনগুলিকে আঁকড়ে থাকার প্রয়াসী ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে অনেক আলোচনা ও তর্কবিতর্কের ফলে তাঁরাও প্রাচীনের জায়গায় নূতনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। ইংরেজ পক্ষে মেকলে ও বেণ্টিঙ্ক এই নবযুগের সারথি হয়েছিলেন।[১১]

ভারতীয় মনের কাছে এই যুগমুহূর্তে প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে কাকে গ্রহণ করবেন— এই প্রশ্ন বড়ো হয়ে উঠেছিল। এঁদের ভিতরেও নবীনের জয়যাত্রা ঘোষিত হল। দেশীয় উচ্চশিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বুঝলেন প্রাচীনকে আঁকড়ে থাকলে দেশের উন্নতি পিছিয়ে থাকবে। এঁদের মধ্যে রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও— এই তিনজন সর্বপ্রথম দেশবাসীকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যান।

যে সমন্বয়ের আদর্শ আমাদের রেনেসাঁসের মূল সেই সমন্বয়ের প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম রামমোহনের মধ্যে দেখা গেল। তাঁর সামাজিক চেতনা এবং বিশ্ববীক্ষায় আধুনিকতার সূত্রপাত।[১২] এই আধুনিকতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের স্থান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। হিন্দু কলেজই আমাদের নবজাগৃতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। এই কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং রামমোহন রায়ের কলকাতায় আগমন দুইই সমসাময়িক ঘটনা।

রামমোহন রায়ের দেহাবসান হল ১৮৩৩-এ। এবং ডিরোজিওর মৃত্যু ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে। দ্বিজেন্দ্রনাথের আবির্ভাব এর কয়েক বছর পরে অর্থাৎ ইয়ং-বেঙ্গল গোষ্ঠীর কর্মযজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বেই উদ্‌যাপিত হয়। তবে কোনো একটি যুগের নূতনত্বের সূচনা হঠাৎ বিশেষ একটি সময়ে হয় না। তার প্রস্তুতি চলতে থাকে অনেকদিন ধরেই। সেই জাতীয় বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখলে একা রামমোহনের ভিতরেই নতুন যুগ সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয় নি সত্য, তবে রামমোহন, হিন্দু কলেজ এবং প্রথম সংবাদপত্র থেকেই নতুন যুগের যে সূচনা —এ-সত্য স্বীকার করতেই হবে।

রামমোহনের সময়ে তিনি যেমন 'শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তিদের' মধ্যে সমাজের মাথা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক সেরকমই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও (১৮২০-৯১) তাঁর সময়ে সমাজের অগ্রণী আদর্শ পুরুষ রূপে গৃহীত হয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পাবার পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ পান। আর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৪০-এ। অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথের মানসিক বিন্যাসের এবং চিন্তাজগতের যে গঠনকাল, বাল্য এবং কৈশোর, তা কেটেছে এমন সময়ে যখন বাংলার শিক্ষিত সমাজে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব।

ডিরোজিও-পন্থীদের ঐকান্তিক প্রয়াস এবং বাস্তব প্রয়োগের ফলেই

রামমোহনের অভীপ্সিত পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়। সেই ডিরোজিও-শিষ্য বা ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর চিন্তা দ্বিজেন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই প্রভাবান্বিত করেছিল।[১৩]

দ্বিজেন্দ্রনাথের মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা— সিপাহী বিদ্রোহ, ঘটে। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকীর্ণ স্ফুলিঙ্গ শাসকবর্গ অত্যন্ত দ্রুত নির্বাপিত করতে সক্ষম হন। কারো ব্যক্তিগত জীবনে এ ঘটনার কী প্রভাব তার বিচার না করেও জাতীয় জীবনে এর সামগ্রিক প্রভাব মেনে নেওয়া যেতে পারে। সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনায় বাংলাদেশের এবং তার সমাজের এক নবকল্যাণ সাধিত হল। এক নবশক্তি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জেগে উঠল।

দ্বিজেন্দ্রনাথের নিকটপরিবেশেও এই দুই দশকের ভিতর যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল তাদের অন্যতম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'ধর্মান্তর' গ্রহণ। আজীবন অনুশীলিত ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তন এল। একদিকে সেখানে দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের আচার-অনুষ্ঠান চলতে লাগল, অন্যদিকে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে ৭ই পৌষ দিবসে দেবেন্দ্রনাথ (দ্বিজেন্দ্রনাথ তখন তিন বৎসরের শিশু মাত্র) প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন। এর আগে পিতামহ দ্বারকানাথ এই ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এমনও শোনা যায় একসময় তিনি একা সমাজের সমস্ত ভার বহন করতেন। এবার তাঁর পুত্র এই ধর্মমত গ্রহণ করে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকল্পে জীবনমন সমর্পণ করলেন। তিনি এ পথে আসায় ব্রাহ্মসমাজ নতুন জীবন এবং শক্তি পেল। এই ঘটনার পরেই ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার বিদেশে যান এবং ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে সেখানেই তাঁর দেহাবসান ঘটে।

পরিণত বয়সে, শৈশবের এই-সকল স্মৃতি দ্বিজেন্দ্রনাথের মনে স্থায়ী হয় নি। তবে এ-সব ঘটনার একটা ছাপ যে তাঁর উপর পড়েছিল এ ধারণা সম্ভবত অযৌক্তিক নয়।

রামমোহন রায় দ্বিজেন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল। পিতা রামমোহনের বিশেষ বন্ধু এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেও দেবেন্দ্রনাথ অল্পবয়সে

রামমোহন-প্রবর্তিত পথে আসেন নি। এবং তিনি নিজে হিন্দু কলেজে ভর্তি হলেও ডিরোজিও-শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর তেমন ঘনিষ্ঠতা হয় নি।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। সমবয়সী এই দুই মনীষী পরে একসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করলেন ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে। পরিণত বয়সে দ্বিজেন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদক হলেন। তাঁর জন্মকালেই বলা যায় বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের জন্ম। কেননা অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষী এতে ধর্মব্যাখ্যান ছাড়াও নীতিগর্ভ বিজ্ঞানবিষয়ক এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব-ঘটিত প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন।

> 'বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।··· সাময়িক পত্রের দ্বারাই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচিপ্রবেশ।···তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া সাময়িক পত্রের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করিল।··· [ইহার] সরল সহজবোধ্য রচনাগুলি বাঙ্গালা গদ্যের দৃঢ়তা ও সংযম আনিল।'[১৪]

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নব আলোকে আলোকিত হয়ে নতুন পরিবেশে ভারতের 'প্রাচীন সনাতন ঐতিহ্যকে কর্মে চিন্তায়' গ্রহণ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টাকে সত্যপথে চালিত করলেন। রামমোহনের হাতে বাঙালি রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় চেতনায় বিপ্লব এল। আবার তাঁরই হাতে বাংলা গদ্য সাহিত্যে বাস্তব রূপ নিল। সে ভাষার মাধুর্য না থাকলেও তা সহজবোধ্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করে বাংলা গদ্যের চলার পথ মসৃণ করে দিলেন। তাঁর ভিতর যে সাহিত্যিক মনের বাস ছিল তার স্ফুরণ ঘটল পরবর্তী জীবনে তাঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যে।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা গদ্যের সংশোধনে বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। পাশ্চাত্য ধারায়, ঠিক নিয়মবদ্ধভাবে বাংলা সাহিত্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানালোচনা তিনিই প্রথম শুরু করেন। আর বিদ্যাসাগর যে গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠা করলেন তা সাহিত্য এবং সংসারের সবরকম প্রয়োজন মেটাতে পারত।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র পরিচালকবর্গের অনেকেই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। গদ্যের প্রথম যুগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, পরে সংস্কৃত কলেজ গোষ্ঠী

এবং তারও পরে হিন্দু কলেজ গোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আনলেন। এই লেখকদের মধ্যে উল্লেখ্য প্রতিনিধি রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪) এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজনারায়ণ বসু উনবিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য নাম। 'ধর্ম ও সমাজচিন্তায়, শিক্ষা ও সাহিত্যে, দেশপ্রেমে ও রাষ্ট্রীয় চেতনায়—সব দিক দিয়াই তিনি সমাজকে আগাইয়া দিতে ব্যগ্র ছিলেন।'[১৫]

রাজনারায়ণ বসুর নিজস্ব সাহিত্যরচনার পরিমাণ অতি সামান্য কিন্তু সাহিত্যজগতের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। বাংলাভাষার একাধিক লেখক তাঁর কাছে সাহিত্যরচনার প্রেরণা লাভ করেন। মাইকেলের তিনি সহপাঠী ছিলেন। এবং মধুসূদন এঁর কথা মনে রেখে অনেক কবিতা রচনা করেন। ব্রাহ্মধর্ম উজ্জীবন-কার্যে ইনি দেবেন্দ্রনাথকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। আবার দেবেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গেও যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল।[১৬] রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যপূর্ণ পত্রাদি পাঠে এই সম্পর্কের গভীরতা জানা যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তাধারায় রাজনারায়ণ বসুর প্রভাব বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথও যে এই মানুষটির দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন 'জীবনস্মৃতি' পাঠে সে কথা জানা যায়।

যাঁরা ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক আদর্শটিকে (norm) অক্ষুণ্ণ রেখেও যুগ-প্রতিবেশের সঙ্গে তার একটি সহজ মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম। স্বাদেশিকতাই ছিল তাঁর সেই মিলনের উপায়। 'হিন্দুমেলা'র সাহায্যে তিনি প্রথম তাঁর চতুষ্পার্শ্বের আয়তন ডিঙিয়ে গেলেন। আত্মবোধ ও দেশাত্মবোধের যুগ্মসূত্রে তাঁর মন মুক্তি পেল বৃহত্তর যুগপরিবেশে।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সময়ে সমাজজীবনে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। রেনেসাঁসের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সমাজ এবং স্বদেশের সংস্কার সাধন ঘটেছে। এবং তার তার ফলে দেশবাসীর শিক্ষাধারা পরিবর্তিত হয়েছে। দর্শন ও সাহিত্য আমূল পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ নূতন রূপ লাভ করেছে।

তবে আমাদের দেশের এই রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ইউরোপের রেনেসাঁসের সঙ্গে সম্পূর্ণ তুলনীয় নয়। কেননা পশ্চিমের দেশগুলিতে রেনেসাঁসের প্রভাব

ফরাসি বিপ্লবের পরে সমাজের সকল স্তরের মানুষের উপরই পড়েছিল। কিন্তু আমাদের দেশে পুনর্জাগরণ সর্বব্যাপী নয়। এর প্রসাদে সমস্ত অবস্থায় মানুষের চিন্তাজগতের দ্বার খোলা সম্ভব হয় নি।

সকল দেশেই মানুষের মধ্যে দুটি ধারা বা দ্বৈত সংস্কৃতিচর্চা দেখা যায়। এদের একটি লোকসংস্কৃতি বা জনযান, অন্যটি বিদগ্ধমণ্ডলীর (Elite) ধারা। অন্যদেশে দেখা গিয়েছে এই দুই ধারা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করেছে। কিন্তু এখানে এই দুই শ্রেণীর সভ্যতা, বা দুই শ্রেণীর সংস্কৃতি, বিশ্বাস, শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তাধারা— সমস্তই আপন আপন গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। এই দুই ধারা সমান্তর স্রোতে চলেছে। সেজন্য এদের ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়া বা এগিয়ে আসা সম্ভব হয় নি। প্রথম দিকে এই দুই ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের বিশেষ চেষ্টা হয় নি। পরবর্তীকালে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) এদের মধ্যে সংগতি সাধনের বিশেষ চেষ্টা করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ যে সমাজের মানুষ সেখানে বিশেষ অর্থে রেনেসাঁস এসেছিল। তার প্রচলিত সংস্কারের ভিত নড়ে উঠেছিল। প্রধানত রেনেসাঁস-বাহিত ভাবধারার বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে বা নতুন নতুন মতবাদ এসে পৌঁচেছে। এই নবজাগরণের যুগ, অন্তিম বিশ্লেষণে, প্রকৃত প্রস্তাবে age of enlightenment-এর যুগ। এখানে একই সঙ্গে যথার্থবাদ (Utilitarianism), যুক্তিবাদ (Rationalism) এবং দ্বিতীয় পর্বে নব্য-রোমান্টিকতা (Neo-Romanticism), অতীন্দ্রিয়বাদ (Transcendentalism) প্রভৃতি নানামুখী মতাদর্শের কথা শোনা যায়। এবং এই সমস্ত-কিছু একসঙ্গে এসে চিন্তাজগতে একটি আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং সেখানে একটি দ্রবমান ধাতুপাত্রে বা melting pots-এ যাবতীয় তাৎক্ষণিক ধ্যানধারণা মিশে গিয়েছিল। দেশের অগ্রণী মানুষেরা সকলেই সমাজ-সংস্কারের ভূমিকা নিচ্ছিলেন কিন্তু এঁদের মধ্যে অনেকেরই মানসিকতার প্রতিকৃতি বহির্মুখী। মনীষীরা এতদিন পর্যন্ত বাইরে প্রত্যক্ষভাবে কাজ এবং সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু প্রথম যাঁদের মধ্যে ভাবুকের জন্ম হল দ্বিজেন্দ্রনাথের তাঁদের অন্যতম। তাঁকে উপলক্ষ করেই যেন চিন্তানায়কের প্রমূর্তিটি ম্লান হয়ে এল আর ভাবুকের প্রতিমাটি (image) জন্ম নিল। একটি নির্দিষ্ট মত বা 'ism' দ্বারা তাঁর জীবনদর্শন নিয়ন্ত্রিত হয় নি। কর্মযোগ, ভাবযোগ বা জ্ঞানযোগ— কোনো

একটি অন্যনিরপেক্ষ মার্গের দ্বারাই তিনি নিজেকে পরিচালিত করেন নি। সমস্ত চিন্তাধারার ঘূর্ণির মধ্যেই তিনি একটি স্থিরকেন্দ্র। তাই যুগসত্তার (Zeitgeist) সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কিন্তু এক কথায় খারিজ করে দেওয়া সহজ নয়।

বিহারীলালের কবিতায় আত্মলীন প্রকাশ দেখা গেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনাতে ব্যক্তির সচেতন আত্মপ্রকাশ আরো উচ্চারিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্থির-কেন্দ্র হিসেবে যুগের সঙ্গে বিশেষ যোগ রক্ষা করে, যুগকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাঁর নিজস্ব একটি জীবনবোধ রচনা করেন। তবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ক্রমশ একটি নির্জন সত্তার উপর তাঁর অধিকার দিনে দিনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর এই নিজস্ব আধুনিকতা তুলনীয়। তিনি নব্য-রোমাণ্টিক, এবং অধ্যাত্ম এষণায় নিঃসঙ্গ। নিজেকে এই নিঃসঙ্গতায় নিয়ে যাবার ফলেই দ্বিজেন্দ্রনাথ কোনো বহির্মুখী মূল্যবোধে আশ্রিত হতে চান নি। এই সময়েই প্রথম তিনি সম্পূর্ণ আত্মস্থ ও আত্মগত (subjective) দৃষ্টিকোণকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর অতিনিরূপিত, মতবাদ-চিহ্নিত যুগপরিবেশের ঊর্ধ্বে একটি পরিণত ভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালের কবি জীবনানন্দ দাশেও (১৮৯৯-১৯৫৪) আমরা অনুরূপ একটি যুগজাগরণ অথচ অতিশায়ী কবিস্বভাব দেখতে পাই। সে অর্থে দ্বিজেন্দ্রনাথ উনিশ-শতকের জাতক হয়েও বিশ শতকের স্নায়ব মানসিকতাকে যেন ছুঁয়ে আছেন।

২

ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডল ও কবি-ব্যক্তিত্ব

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে জোড়াসাঁকোর বাড়ি সম্বন্ধে লিখেছেন: 'সেই যুগে পারস্য-আরবের ইসলামীয় সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান-সম্পদ ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা, এই তিন সুগভীর চিন্তাধারার ত্রিবেণীসংগম হল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে।'[১] বাংলাদেশের সংস্কৃতির জাগরণ ঘটেছে এই বাড়িতে। শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, নৃতত্ত্ববিদ্যা, স্ত্রী-শিক্ষা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই আজকের বাঙালি সমাজ উত্তর কলকাতার এই বাড়িটির নিকট ঋণী।

বাংলাদেশের এই বাড়ির পুরুষরা 'পিরালী' বংশোদ্ভূত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের প্রতিষ্ঠাতা জগন্নাথ কুশারীর পূর্বপুরুষ কিভাবে এক অন্যায় ষড়যন্ত্রে কুলীনত্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে 'পিরালী' ব্রাহ্মণে পরিণত হন সে কথা বা সে কিংবদন্তী বাঙালি সমাজে বহুল প্রচলিত।

ধর্মে পতিত হবার ফলে এঁদের যেমন ক্ষতি হল তেমনি আবার তাঁরা পরম সাহসী হয়ে উঠলেন কেননা তখন কোনোকিছু হারানোর ভয় থেকে তাঁরা মুক্ত। সেই সাহসের ফলস্বরূপ জগন্নাথ কুশারীর এক বংশধর, পঞ্চানন, এবং তাঁর পিতৃব্য, সুখদেব, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, তাঁদের বাসস্থান যশোহরের গ্রাম পরিত্যাগ করে ভাগীরথী-তীরবর্তী গোবিন্দপুর নামক যে গ্রামে এসে প্রথম উঠলেন সেখানকার নীচুজাতের সকলে তাঁকে 'ঠাকুর' সম্বোধন করতেন। পরে ইংরেজরা এই 'ঠাকুর'কেই তাঁদের পদবী বলে ধরে নেওয়ায় ক্রমশ তাঁরা 'ঠাকুর' নামে খ্যাত হলেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়ি তার 'জোড়াসাঁকো' নাম এবং পূর্ণ গৌরব লাভ করেছে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলে। ঐশ্বর্যের মধ্যে দ্বারকানাথ ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। কিন্তু সে ঐশ্বর্যকে বৃদ্ধি করে সৌন্দর্য এবং মাধুর্য দান করেন দ্বারকানাথ। জোড়াসাঁকোয় তাঁর গৃহপ্রবেশের দিন বহু ইংরেজও নিমন্ত্রিত হন। সেখানেই যেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মিলন সূচিত হয়।

দ্বারকানাথের পরে জোড়াসাঁকোর দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে এসে পড়ল তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকার জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথের হাতে। মহর্ষি এ গুরুভার অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করলেন। দেবন্দ্রনাথের বাল্য এবং যৌবন কেটেছে প্রচণ্ড বিলাসিতার মধ্যে। কিন্তু একটু পরিণত বয়সে তাঁর মনে এক ঐশী সন্ধিৎসা বা ধর্মভাব জাগে। পার্থিব ভোগবিলাস অপেক্ষা স্বর্গীয় আনন্দই যে মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত, হঠাৎ একদিন, আশ্চর্যজনকভাবে এ কথা তাঁর মনে হয়। তাঁর এই রূপান্তরের কথা পরবর্তীকালে তিনি বিশদ-ভাবে তাঁর 'আত্মজীবনী'তে বলে গেছেন।

দেবেন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনে (১৮১৭-১৯০৫) তাঁর যুগটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রামমোহনের আদর্শ ও ধর্মমতকে তিনি চিন্তায় ও কর্মে বহন করেছেন। ' "নবজাগরণ ও স্বদেশী আন্দোলন" উভয়ের তাৎপর্যই তাঁর জীবনে ও কর্মে প্রকাশিত হয়েছে।'[২]

ঈশ্বরোপলব্ধি হবার পরে একসময় দেবেন্দ্রনাথ কয়েকদিনের জন্য সংসার ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সংসারই যে তাঁর সাধনার ক্ষেত্র, সেখান থেকে নিঃশর্ত প্রত্যাহারেই যে মুক্তি নেই, এ কথা মনে হবার পরেই তিনি আবার ফিরে আসেন। সেইবারের পরে তিনি অনেকবার দূরাঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন; এমন-কি, হিমালয়েও গেছেন কিন্তু সংসার ত্যাগের কথা আর কখনো ভাবেন নি। তাঁর জীবন সংসার এবং মানুষের মঙ্গল কামনায় ও ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত হয়েছে।

রামমোহন যে নবজাগরণের প্রদীপটি জ্বালিয়ে দিলেন তাকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করলেন দেবেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্ম-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে দেবেন্দ্রনাথের আমলে। সমাজ-সংস্কার, ধর্ম-সংস্কার এবং ধর্মপ্রচার ছাড়াও বাংলাসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের দান অসামান্য। নিজে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি বেশি করেন নি— কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি করা অপেক্ষা সাহিত্যিক সৃষ্টি এবং সাহিত্য সৃষ্টির পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার মধ্যেই তাঁর প্রকৃত কৃতিত্ব। বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগের প্রকাশ মাত্র পনেরো বছর বয়সেই 'সর্বতত্ত্বদীপিকা' সভা স্থাপনে। এর পরে তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা এবং সেইসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' স্থাপনের মধ্য দিয়েই তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বা বেদান্ত প্রচার তত্ত্ববিদ্যার প্রধান লক্ষ্য হলেও সেই পত্রিকাতেই

প্রথম সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, জীবনী, সমাজনীতি, এমন-কি, কখনো কখনো রাজনীতি-বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের ১১ মার্চ (২৯ ফাল্গুন ১৭৬১ শক) জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় ঠাকুর-বাড়ির ঐশ্বর্য সর্বোচ্চ শিখরে। তখনো দ্বারকানাথ ঠাকুর জীবিত। জ্যেষ্ঠ পৌত্রের জন্মের বছর তিনেক পরেই তাঁর দ্বিতীয় এবং শেষ বিদেশ যাত্রা।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন। সে সমস্যার ছাপ দ্বিজেন্দ্রনাথের উপর পড়ে নি। তিনি তখন নিতান্তই শিশু। পিতার স্নেহক্রোড়ে দুঃখদারিদ্র্যের ছাপ তাঁকে অনুভব করতে হয় নি। অবশ্য ঠাকুর-পরিবারের সন্তানেরা কখনোই ঐশ্বর্য বা বিলাসিতার মধ্যে মানুষ হন নি। তাঁদের শৈশব ও বাল্য অত্যন্ত সাধারণভাবে, সাধারণ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মতোই কেটেছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের পিতা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালিসমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আলোক-উদ্‌ভাসিত নূতন পরিবেশ ভারতের সনাতন ঐতিহ্যকে কর্মে ও চিন্তায় তিনি গ্রহণ করেন এবং রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ধর্মমতকে ঠিকমত চালিত করেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করে বাংলা গদ্যের পথ পরিচ্ছন্ন করে দেন। 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' গ্রন্থে ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাদি সংকলিত হয়েছে। 'আত্মজীবনী'ও একটি সুললিত গ্রন্থ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে যে রসবোদ্ধা হৃদয়ের অধিষ্ঠান দ্বিজেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য আত্মজ সেই মনের যোগ্য উত্তরবাহী।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মাতার নাম সারদা দেবী। অনেকগুলি সন্তান-সন্ততির জননী এই মহিলা নিশ্চয়ই অশেষ গুণের অধিকারিনী ছিলেন। ধৈর্য ক্ষমা এবং আত্মস্থ কর্তৃত্ববোধের প্রকাশ একই সময়ে তাঁর চরিত্রে ঘটেছিল। তিনি নিষ্ঠাবান সাধারণ হিন্দুঘরের মেয়ে। স্বামীগর্বে তিনি গর্বিতা ছিলেন এবং স্বামী যখন তাঁদের বাড়িতে প্রচলিত লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন তখন তিনি অন্তঃকরণ থেকে তাঁর স্বামীর মত-ই ঠিক বলে গ্রহণ করে ছলেন কিনা তা জানা যায় না। স্বামীর প্রতি তাঁর ভক্তি বা অনুরাগ কোনো অংশেই কমে নি। তবে বাহ্যত পারিবারিক নানা আচার-অনুষ্ঠানে

তিনি প্রাচীন লোকাচারকেই সমর্থন করে গেছেন। প্রকাশ্য কোনো প্রতিবাদ জানান নি।

সারদা দেবী যে ব্যক্তিত্বশালিনী এবং কর্তব্যপরায়ণা মহিলা ছিলেন তা অনুমান করা যায়। জোড়াসাঁকোর বিরাট পরিবার, সন্তান-সন্ততি, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, পৌত্র-পৌত্রী, আত্মীয়-স্বজন, কুটুম্বাদি, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী প্রভৃতি সকলকে নিয়ে বাড়ির সদস্য সংখ্যা বহু। তাঁদের দেখাশোনা এবং পরিচালনার ভার সারদা দেবীর হাতেই ছিল। স্বামী যে সময় বাইরে থাকতেন তখন সংসারের সমস্ত ভার স্বাভাবিক নিয়মেই সারদা দেবীর হাতে এসে পড়ত। এই-সব সময় তাঁর দেবেন্দ্রনাথের জন্য উদ্‌বেগ বা তিনি ফিরলে তাঁকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানাতেন তার ছবি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে পাওয়া যায়। কন্যা সৌদামিনী দেবীও এ বিষয়ে লিখেছেন।[৩]

অবনীন্দ্রনাথ (১৮৭১-১৯৫১) তাঁর স্মৃতিচারণে দেবেন্দ্রনাথ, সারদা দেবী এবং তখনকার জোড়াসাঁকোর পারিবারিক ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখছেন: 'আমার স্পষ্ট মনে আছে কর্তাদিদিমার [সারদা দেবী] সে ছবি, ভিতর দিকের তেতলার ঘরটিতে থাকতেন। ঘরে একটি বিছানা, সেকেলে মশারি সবুজ রঙের, পঙ্খের কাজ করা মেঝে, মেঝেতে কার্পেট পাতা, এক পাশে একটি পিদিম জ্বলছে— বালুচরী শাড়ি প'রে, সাদা চুলে লাল সিঁদুর টক্‌টক্‌ করছে— কর্তাদিদিমা বসে আছেন তক্তাপোষে।'[৪]

এই রত্নগর্ভা রমণীর পুত্রকন্যারা প্রায় সকলেই খ্যাতনামা। তাঁরা রচনায় এঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নি। ফলে পুত্রকন্যাদের মানসিক গঠন ও চরিত্রের বিকাশে যাঁর অসীম প্রভাব অনস্বীকার্য তাঁর সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না।

পাঁচ বছর বয়সে দ্বিজেন্দ্রনাথের হাতে-খড়ি হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সহোদর সত্যেন্দ্রনাথ এবং খুড়তুতো ভাই গণেন্দ্রনাথ একসঙ্গে এক শিক্ষকের নিকট পড়া আরম্ভ করেন।[৫] সত্যেন্দ্রনাথের লেখা থেকে জানা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের সংস্কৃত শিক্ষার শিক্ষক ছিলেন রামনারায়ণ পণ্ডিত, যিনি 'বহু বিবাহ' নাটক রচনা করেছিলেন।

এই সময়ে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' ও কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' দ্বিজেন্দ্র-নাথের প্রিয় গ্রন্থ ছিল। এক বৃদ্ধ কর্মচারীকে তাঁরা সকলে দাদা বলে

ডাকতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় যতক্ষণ না তাঁর কাছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শোনা যেত ততক্ষণ তাঁর মুক্তি ছিল না। সাত কিংবা আট বৎসর বয়স থেকেই দ্বিজেন্দ্রনাথের বাংলা লেখার ঝোঁক আরম্ভ হয়। যা-কিছু মনে আসত তাই গদ্যে কিংবা পদ্যবন্ধে লিখে ফেলতেন। এই সময় বাংলা স্কুলে তিন ভাই ভর্তি হলেন। তিনি, গণেন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ ছোটোবেলায় অনেক সময় একসঙ্গে থাকতেন। সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় এ সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬]

কিছুদিন বাংলা পড়ে তিনি একেবারে সংস্কৃত 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' আরম্ভ করে দিলেন। তখন ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের পড়বার মতো বাংলা বই খুব বেশি ছিল না। 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' শেষ করার পর তিনি 'রঘুবংশ' শেষ করলেন।[৭]

এর পর তিনি সেণ্ট পল্‌স স্কুলে ভর্তি হন। স্কলারশিপ পাবার জন্যই যে লেখাপড়া তা দ্বিজেন্দ্রনাথ কখনোই পছন্দ করতেন না। তা হলেও দু বছর সেণ্ট পল্‌স স্কুলে পড়ার পর স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। তখন এই কলেজের নাম ছিল হিন্দু কলেজ। পাস করবার জন্য যে বাঁধাধরা পড়া তা তাঁর একেবারেই ভালো লাগল না। 'ইতিহাসের পুস্তকখানি এত নীরস ছিল, যে বইখানির একটি পাতাও উল্টাইয়া দেখিলাম-না। অঙ্ক আমার ভালো লাগিত।[৮] কিন্তু ক্লাসের বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে অঙ্ক কসা ও গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার ভাল লাগিত Trigonometry ও Mensuration ; বাড়ীতে ইচ্ছে মত আমি তাহাই আলোচনা করিতাম।... [লাইব্রেরি হইতে বই লইয়া] আমার যাহা ভাল লাগিত আমি তাহা বাড়ীতে বসিয়া পড়িতাম। হয়তো কোনদিন স্কুল কামাই করিতাম।... কিন্তু কলেজের পড়া একেবারে না করিয়া পরীক্ষা দিয়ে উপরের ক্লাসে ওঠা দুষ্কর।... [বাংলায় বেশি নম্বরের জন্য] কোন রকমে প্রমোশন পাইলাম।[৯] কিন্তু পুনরায় বাৎসরিক পরীক্ষা দিবার পূর্বে কলেজ পরিত্যাগ করিলাম।'[১০]

ছোটোবেলায় দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভাইবোনেরাও মেজকাকীমার (গিরীন্দ্রনাথের স্ত্রী, যোগমায়া দেবী) খুব ভক্ত ছিলেন। মা, সারদা দেবী, এতগুলি সন্তানের প্রতি মনোযোগ দিতে পারতেন না। তাই তাদের সমস্ত আদর-আবদারই কাকীমার কাছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের বাল্যকালে মহর্ষি একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত ছিলেন। তিনি পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলে জোড়াসাঁকোর বাড়ি দু ভাগে ভাগ হয়ে যায়। বাড়ির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র মিত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। তবে শিশুকাল থেকেই তিনি বড় একটা কারো সঙ্গে মিশতেন না। পরবর্তীকালে বন্ধুদের মধ্যে মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।[১১] এঁর কথা ভেবেই তিনি লেখেন :

প্রবীণ সাধুর সঙ্গে বিপ্র যুবা বিনা ভঙ্গে
বহুকাল সখ্যডোরে বাঁধা
বয়সের যে অনৈক্য তার প্রতি নাহি লক্ষ্য
সে অনৈক্যে প্রীতির কি বাধা॥

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের অন্যতম। বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন স্কুলের শিক্ষক রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। প্রিয়নাথ সেনকে (? -১৯১৬) লিখিত 'দ্বিজ চাতক'-এর কিছু কিছু চিঠি তাঁদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের কথা প্রকাশ করে।[১২] কলকাতার লর্ডবিশপ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এঁরা প্রায়ই আসতেন। 'দক্ষিণের বারান্দায় দ্বিজেন্দ্রনাথের আসর জমে উঠত। তাঁর আকাশ-ছোঁওয়া হাসির শব্দে বাড়ী গমগম করত। পাঁচ নম্বরের বাড়ী থেকে গগনেন্দ্রনাথ সমরেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ সেই হাসির টানে এসে জুটতেন।' রথীন্দ্রনাথও এই অট্টহাসির উল্লেখ করেছেন : 'জ্যাঠামহাশয়ের কাছে সেই সময়কার গণ্যমান্য অনেক লোকই দেখা করতে আসতেন। তাঁদের গুরু-গম্ভীর আলোচনার বৈঠক ঘর থেকে আমরা বহুদূরে থাকতুম, তবু থেকে থেকে কানে আসত তাঁর সেই অট্টহাসির শব্দ।'[১৩] তাঁর হাসি এতই মনোরম ছিল যে তা প্রায় একটি কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। 'প্রবাসী'-র একটি রচনাতেও এর সুন্দর বর্ণনা আছে।[১৪]

পরিণত বয়সে গান্ধীজীর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের যে সম্পর্ক দাঁড়ায় তা প্রায় বন্ধুত্বেরই পর্যায়ভুক্ত। শান্তিনিকেতনে বিধুশেখর শাস্ত্রী, পিয়ার্সন, এণ্ড্রুজ প্রমুখ অনেক মনীষীই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিত হয়ে ওঠেন।

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮ বছর বয়সে যশোহর জেলার নরেন্দ্রপুর-নিবাসী তারাচাঁদ চক্রবর্তীর কন্যা সর্বসুন্দরী দেবীর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি 'সংবাদ প্রভাকর'-এ এই সংবাদ বের হয়: 'গত শনিবার রাত্রিতে তাঁহার [দেবেন্দ্রনাথের] জ্যেষ্ঠ পুত্রের এবং রবিবার রাত্রিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভবিবাহকার্য সর্বাঙ্গ সুন্দররূপে সুনির্বাহ হইয়াছে।'

দ্বিজেন্দ্রনাথের পাঁচ পুত্র— দ্বিপেন্দ্র, অরুণেন্দ্র, নীতীন্দ্র, সুধীন্দ্র ও কৃতীন্দ্র এবং দুই কন্যা— সরোজা ও উষা। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যান এবং তিনি এবং তাঁর স্ত্রী হেমলতা দেবী (যাঁকে শান্তিনিকেতনে সকলে বড়োমা বলে ডাকতেন) দ্বিজেন্দ্রনাথের দেখাশোনা করেন। এই পুত্রের অকালমৃত্যুতে দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীর শোকাচ্ছন্ন হন। 'দীপুদা, অরুদা, নীতুদা, কৃতি'— এঁদের সঙ্গে বাল্যের যে-সব সুখস্মৃতি জড়িয়ে আছে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে সে-সব ছবি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন।[১৫] পুত্র সুধীন্দ্রনাথের ভিতরের সাহিত্যিক মনটি তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদনাও তাঁর অন্যতম সাহিত্যিক কীর্তি। সরোজা এবং উষার যথাক্রমে মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। জ্যেষ্ঠ জামাতাকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রচুর চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়।

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের প্রতি বাল্যকাল থেকেই এঁর প্রবল অনুরাগ। বাল্মীকির রামায়ণ এবং কালিদাসের মেঘদূত[১৬] এঁর প্রিয় কাব্য ছিল। এদিকে ইংরেজী সাহিত্যের সেকস্‌পীয়র, বায়রন এবং কীট্‌সের খুব ভক্ত ছিলেন। শেষ বয়স পর্যন্ত সেকস্‌পীয়রের রচনা পড়তে ভালোবাসতেন। তাঁর ঘনিষ্ঠদের অনেকেই তাঁর কাছে সেকস্‌পীয়র আবৃত্তি শুনেছেন। ডিকেন্‌সের উপন্যাস এবং আরব্যোপন্যাসও তাঁর খুব প্রিয় ছিল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি পৌত্র সৌম্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই দুটির পাঠ শুনেছেন।[১৭]

প্রধানত কাণ্ট এবং তা ছাড়াও অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিকের গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। জার্মান ও ফরাসী দার্শনিকগণ তাঁদের প্রধানতম। অবসর সময়ে তিনি ভারতীয় দর্শন গ্রন্থ পাঠ করতেন।

বই পড়া তাঁর জীবনের প্রধানতম নেশা ছিল। বৃদ্ধ বয়সে গ্রন্থচর্চাই তাঁর

প্রধান অবলম্বন ছিল। 'তিনি প্রতিদিন Public Library যাইতেন। কখনো দর্শন বা অন্যান্য গ্রন্থাদি লইয়া যাইতেন এবং সেই গ্রন্থ পড়িতেন।'[১৮]

বাল্যকাল থেকেই মাতৃভাষার প্রতি দ্বিজেন্দ্রনাথ অনুরক্ত ছিলেন। সে সময় তিনি কবিতা রচনা এবং সময় অসময়ে ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন। হাল্কা রসের কবিতাও তিনি প্রচুর লিখেছেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে সংস্কৃত থেকে মেঘদূত কাব্যখানি অনুবাদ করেন। তাঁর বয়স যখন কুড়ি তখন এটি প্রকাশিত হল।[১৯]

প্রকৃতির সৌন্দর্যলীলা দ্বিজেন্দ্রনাথকে অধীর করে তুলত। তিনি একজন যথার্থই প্রকৃতিপ্রেমিক ছিলেন। হঠাৎ একসময় তাঁর মনে এই প্রশ্নের উদয় হল, 'প্রকৃতির সৌন্দর্যরাশি, ঐ সুদূর আকাশের বর্ণমাধুরী আমার চিত্তকে এমন নাড়া দেয় কেন? আমার মন এবং আকাশের সঙ্গে কী সম্বন্ধ?'[২০] এরপর থেকেই তিনি তত্ত্ববিদ্যা আলোচনা করতে লাগলেন। এর থেকেই যেন প্রমাণ হয় যে, তাঁর তত্ত্বচর্চা জীবনবীক্ষারই অঙ্গীভূত ছিল। তাঁর প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ 'তত্ত্ববিদ্যা'র প্রকাশ ১৮৬৬তে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন।[২১] তা ছাড়াও তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকার পৃষ্ঠায়— 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' প্রভৃতিতে— তাঁর অজস্র রচনা ছড়িয়ে আছে।

'স্বপ্ন-প্রয়াণ' রচিত হয় 'তত্ত্ববিদ্যা' রচনার পরে। রূপক কাব্য হিসেবে বাংলা সাহিত্যে এর বিশেষ স্থান আছে। তবে কবি নিজে এ সম্বন্ধে বলেছেন: 'আমার যথার্থ কবিতার mood যখন ছিল— অর্থাৎ সেই বাল্যকালে আমি একাব্য লিখি নাই বলিয়া ইহা আমার মনোমত হয় নাই। সেই সময় তত্ত্ব-বিদ্যার আলোচনায় মশগুল ছিলুম তাই জন্য উহাতে metaphysics ঢুকিয়াছে।'[২২]

বাল্যকাল থেকেই দ্বিজেন্দ্রনাথ দেশানুরক্ত জ্ঞানব্রতী। বাংলা শেখা, বাংলা ভাষায় কথা বলা এবং বাংলা ভাষায় যে অভাব তা পূরণ করে বাংলা ভাষার পুষ্টি সাধন করা দ্বিজেন্দ্রনাথের সাধনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনাও আরম্ভ করেছিলেন। তারও আগে তিনি "দ্বাদশ-প্রতিভা-বর্জিত জ্যামিতি" লেখেন এবং 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'তে তা প্রকাশিত হয়। 'ভারতী'-তেও কয়েক বৎসর এই লেখা দেখা যায়।[২৩]

দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্ব-সচেতন হয়েও স্বদেশ আত্মার সন্ধানী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন: 'জাতীয় ভাব অলীক বাক্যাড়ম্বরের সামগ্রী নহে— কঠোর সাধনার সামগ্রীও নহে। তাহা সহৃদয় অন্তঃকরণের একটি অকৃত্রিম সহজ শোভন ভাব; তাহা যাঁহার আছে তাঁহার আছে; যাঁহার নাই তাঁহার অন্তঃকরণের মরুভূমি হইতে তাহা জোর করিয়া ফলাইয়া তোলা অসম্ভব।··· স্বজাতির যাহা প্রকৃত গৌরবের বিষয় তাহা জাগাইয়া তুলিলেই জাতীয় ভাব আপনা আপনি জাগিয়া উঠিবে।'[২৪]

স্বদেশপ্রীতির বশবর্তী হয়েই দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে হিন্দুমেলা স্থাপন করেন। ১৮৭৫-এ তিনি একটি চিঠিতে লেখেন: 'আমার কবিতার স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে; ইহার বিশেষ কারণ মেলার হাঙ্গামা।'[২৫] ১৮৭৪ সনের ১৮ই এপ্রিল দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রেরণা-পরামর্শে, নবগোপাল মিত্রের (১৮৪০-১৮৯৪) উদ্যোগে এবং গণেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে এই স্বদেশী মেলার প্রতিষ্ঠা। 'স্বজাতীয়দের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন'— করাই ইহার উদ্দেশ্য। প্রথমদিকে এই মেলা চৈত্র সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হত বলে এই মেলার নাম 'চৈত্রমেলা' ছিল। প্রথম তিনবৎসর গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর সম্পাদক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে চতুর্থ থেকে সপ্তম বৎসর দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন এর সম্পাদক। এ ছাড়াও মেলার অষ্টম (১৮৭৪) ও দশম (১৮৭৬) অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন।

হিন্দুমেলা বছরে একবার অনুষ্ঠিত হত। পরে এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উদ্যোক্তাগণ 'ন্যাশনাল সোসাইটি' স্থাপন করেন। ন্যাশনাল সোসাইটির সভ্যগণ মাসে একবার মিলিত হতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ এর অধ্যক্ষ সভার সদস্য ও ১৮৭৪ সনে সহ সভাপতি হন।

বিদ্যোৎসাহ ও সাহিত্যচর্চার উদ্দীপক নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের যোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ড যাত্রার আগে থেকেই তাঁদের বাড়িতে মধ্যে মধ্যে 'বিদ্বজ্জন সমাগম'[২৬] সাহিত্যিক সম্মেলন হত: 'এই সভার উদ্দেশ্য— সাহিত্যসেবীদের মধ্যে যাহাতে পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব বর্ধিত হয়।··· শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই সম্মিলনের নামকরণ করিয়া দিয়াছিলেন··· এই "সমাগমে" তখন··· লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-সেবীগণকে নিমন্ত্রণ করা হইত।'[২৭] ১৮৭৪ সনের ১৮ এপ্রিল এই সভার

প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচরণ সরকার, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রায় ১০০ জন গুণী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। নানা রকম অনুষ্ঠানের শেষে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বপ্নবিষয়ক স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর বাসভবনে একটি সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ১২৮৯ সালে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারে (জুলাই ১৮৮২) ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে স্বল্পায়ু সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হন। এই প্রথম অধিবেশনের জন্য রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রতিবেদন, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত একটি পুরাতন পাণ্ডুলিপি (যা পরে নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়[২৮] 'জীবনস্মৃতি' সম্পাদনাকালে গ্রন্থপরিচয়ে প্রকাশ করেছেন) থেকে জানা যায়— প্রথম বৎসর ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতি এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথও সহযোগী সভাপতি নির্বাচিত হন।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংগৃহীত ১২৮৯ সালের ১৪ অগ্রহায়ণের অধিবেশনের কার্যবিবরণ থেকে জানা যায় যে প্রথম প্রস্তাব অনুযায়ী ভূগোলের পরিভাষা স্থির করার জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। সেই সমিতির সভ্যগণের অন্যতম ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।[২৯]

১৮৮২ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় থিয়সফিকাল সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা স্থাপিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ সোসাইটির অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৮৬০ খৃস্টাব্দে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ইণ্ডিয়ান সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার যখন চেষ্টা করেন, তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন নি ঠিকই কিন্তু গণেন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ দুজনেই এঁদের একহাজার টাকা করে অর্থ সাহায্য করেন।

'দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৩০১ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি উপর্যুপরি তিনবৎসর (১৩০৪-১৩০৬ : ইং ১৮৯৭-১৯০০) এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।[৩০] তিনি পরিষদের

সভাপতিরূপে 'একালের দর্শন' সম্বন্ধে চারি দিন বক্তৃতা করেন।" সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত এইরকম একটি ভাষণ 'নানা চিন্তা' বইতে মুদ্রিত হয়েছে।

এই বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলেন, 'এই দুই বৎসর সাহিত্য পরিষদ যেভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা তাহার স্থায়িত্বের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাহার উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইলে, শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের সহিত ইংরাজি সংস্কৃতজ্ঞ ভদ্র, বিনীত এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের জোটপাট সংঘটন করিয়া, কিরূপ প্রণালীতে কার্য করিলে ভাল হয়, তাহা আমার যতদূর সাধ্য তাহা আমি সংক্ষেপে বলিয়া চুকাইয়াছি। আপনাদের বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে আপনারা যাহা ভাল বোঝেন তাহাই করিবেন।'[৩১]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ১৩২০ সালের ২৭-২৯ চৈত্র টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্মিলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন।[৩২] সাহিত্য সম্মিলনে তিনি যে অভিভাষণ দেন তা 'প্রবাসী'[৩৩] এবং পরে 'নানাচিন্তা' গ্রন্থভুক্ত হয়ে মুদ্রিত হয়।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ এবং পরে আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। তিনি ছয় বৎসর যোগ্যতার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের পদে কাজ করেন। ১৮৯৪ থেকে ১৮৭১ তাঁর কার্যকাল। 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮০৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে (ইং ১৮৮১) আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন ট্রষ্টি বা বিশ্বস্ত অধিকারী, ১৮১১ শকের ২৫ মে মাঘ···হইতে আচার্য, ১৮২১ শকের ১লা অগ্রহায়ণ (১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ) হইতে সভাপতি এবং ১৮০৬ শকের ১লা শ্রাবণ হইতে আচার্য ও সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।'[৩৪]

সমাজের অনেক অনুষ্ঠানে দ্বিজেন্দ্রনাথ আচার্যরূপে 'বেদী গ্রহণ' করেন পুরোনো 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'[৩৫] এবং সমসাময়িক অনেকের রচনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি যেন এ-সব অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। কনিষ্ঠদের সমাজের কাজে উৎসাহ দানেও তাঁর সমান আগ্রহ ছিল।[৩৬] মহর্ষিভবনে ব্রাহ্মোৎসবের বার্ষিক অনুষ্ঠান মাঘোৎসবে দ্বিজেন্দ্রনাথ আচার্যের আসন গ্রহণ করতেন। এই-সব অনুষ্ঠানে সমাজের বাইরের অনেকেও বেশ উৎসাহী ছিলেন।

তৎকালীন নানা সংবাদপত্র সাক্ষ্য দেয় যে তিনি আচার্যরূপে অনেক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন। বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বকে একত্রিত করবার ক্ষমতা থেকে বোঝা যায় তাঁর পরিণত যৌবনে তিনি সামাজিকতার অনুশীলনে উদাসীন ছিলেন না।[৩৭] বিভিন্ন ধর্মের এবং বিভিন্ন বর্গের ব্যক্তি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বহুবার একত্রিত হয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের সময়েও সে-ধারা অক্ষুণ্ণ থেকেছে। জীবনের শেষার্ধে তিনি যখন স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করেন, তখন, মনে হয় যেন, তিনি একটি নির্দিষ্ট মণ্ডলীর বাইরে মেলা-মেশা পছন্দ করতেন না। সে সময় আশ্রমটিই যেন একটি ঘনিষ্ঠ ভাবমণ্ডল। কিন্তু এরই মধ্যে যেন কবি নিরুক্ত—the soul selects her own society— কথাটি তাঁর সম্বন্ধে সত্য। তাঁকে ঘিরে একটি সহজাত অথচ অনারোহ মহিমা বলয়িত হয়ে উঠেছিল। তা হলেও নিছক বহিরঙ্গ আনুষ্ঠিকতা সম্পর্কে তিনি স্পষ্টতই অনাগ্রহী ছিলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ সতীর্থ নবগোপাল মিত্রের মৃত্যুর পর আয়োজিত শোকসভায় তিনি উপস্থিত থাকতে চান নি। কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন তাঁর সভা-পরিচালন-কাজে অক্ষমতা।[৩৮] আসল কারণ মনে হয় তাঁর সেই মানসিকতা যা বহির্মুখী অনুষ্ঠানিকতা ও গোষ্ঠীবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিকতাকে শেষ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করেছিল।

সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। 'ভারতী'র সূচনা থেকেই যদিও তিনি তার সঙ্গে জড়িত এবং যদিও সাত বছর তিনি এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন তা হলেও সাময়িক পত্রিকার ধারায় তাঁর বিশেষ দান 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পরিচালনায়। তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর এই পত্রিকার সম্পাদনা করেন। 'হিতবাদী' পত্রিকাটিরও সূচনা থেকেই তিনি তার সঙ্গে যুক্ত। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ঐ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান উদ্যোক্তা। সম্পাদনের ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ কোনো হাত না থাকলেও কৃষ্ণকমল দ্বিজেন্দ্রনাথের পরামর্শ অনুসারেই কাগজখানি পরিচালনা করতেন।

সংগীতের ক্ষেত্রেও দ্বিজেন্দ্রনাথের দান উপেক্ষণীয় নয়। তিনি অনেকগুলি ব্রহ্মসংগীত রচনা এবং তাতে সুর সংযোজন করেছেন। অধিকাংশ গান 'ব্রহ্মসংগীত' গ্রন্থে মুদ্রিত। ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি গ্রন্থমালায় ব্রহ্মসংগীত-বহির্ভূত গানেরও সন্ধান পাওয়া যায়।[৩৯]

আমাদের দেশে আকারমাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবক দ্বিজেন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথই প্রথম স্বরলিপি প্রবর্তন করলেও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তা প্রথম প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় বলেছেন : বাঙ্গালায় প্রথম স্বরলিপি যে আমার রচিত, তাহা একেবারে নিঃসন্দেহ। সৌরীন্দ্র মোহন তাহার পরে তাড়াতাড়ি একটি স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া ছাপাইয়া দিল।'[৪০]

'ব্রহ্মসংগীত' গ্রন্থখানি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'বড়দাদা আর আমি দুজনে মিলে কোন কোন সময় গান রচনা করতুম। ব্রহ্মসংগীতের কতকগুলি আমাদের যুক্ত রচনা, কতক বা আমাদের নিজস্ব রচনা।'[৪১]

হার্মোনিয়ম যন্ত্রটিও দ্বিজেন্দ্রনাথের পিতাই প্রথম বাড়িতে আনেন। ভারতবর্ষেও সেই প্রথম হার্মোনিয়ম এল। দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম এই যন্ত্রটি বাজাতে শেখেন। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর গানের অনুষঙ্গ হিসেবে এই যন্ত্রটি চান নি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ একসময় বাঁশি বাজাতেও ভালোবাসতেন। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্বন্ধে লিখেছেন : 'ললিতকলাতেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ একটা জ্ঞান ছিল। আমরা ছেলেবেলায় তাঁহাকে হার্মোনিয়ম বাজাইতে দেখিয়াছি, বাঁশীও বাজাইতেন, কত প্রকারের বাঁশী আসিয়া তাঁহার ঘরে জমিত তাহার ঠিক নাই।'[৪২] 'কেহ কিছু প্রার্থনা জানাইলে তিনি তাহাকে না বলিতে পারিতেন না।' ফলে এই পুরানো বাঁশিগুলিও একটি একটি করে দান-খয়রাতের ফলে ফুরিয়ে যেত এবং নতুন বাঁশি এসে পুরাতনের জায়গা নিত।

ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হলেও চিন্তার জগতে কখনোই তিনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি অনেক ভেবেছেন। তাঁর বিজ্ঞানচেতনা লক্ষণীয়।[৪৩] তিনি অঙ্ক কষেছেন এবং নতুন নিয়মে জ্যামিতি লিখেছেন। তাঁর জ্যামিতিবিষয়ক রচনার একটি উদ্ধৃতি :

> জ্যামিতি বিদ্যা যদিও আমাদের দেশ হইতে গ্রীস দেশে গিয়াছে সত্য, কিন্তু গ্রীস দেশে তাহার অনুশীলনের যেমন একটি অপূর্ব প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে তেমনটি আমাদের দেশে কস্মিনকালেও হয় নাই। পুঙ্খানুপুঙ্খ যুক্তি প্রণালী দ্বারা সত্য নির্ণয় করিবার যে একটি পদ্ধতি, ইউক্লিডের জ্যামিতি তাহার একটি অনন্যসাধারণ আদর্শ। ইহা সত্ত্বেও আমরা এটুকু বলিতে ছাড়িব না যে ইউক্লিডের জ্যামিতির ভিত্তিমূল সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য

নহে। ইউক্লিডের গোড়ার তত্ত্বগুলি যদি আমাদের দেশোচিত সহজ বুদ্ধি দ্বারা স্থিরকৃত হইত তাহা হইলে ইউক্লিডের জ্যামিতি সর্বাংশে নির্দোষ হইত। ইহা অচিরাৎ প্রদর্শন করা যাইবে সহজবুদ্ধিতে যাহা সহজে ধরা পড়ে অত্যন্ত মার্জিত বুদ্ধিতে তাহা অনেক সময় এড়াইয়া যায়। এই কারণে ইউক্লিডের জ্যামিতির ভিত্তিমূলে কতকগুলি দোষ পৌঁছাইয়াছে। আমরা ইউক্লিডের বিরোধী পক্ষ বলিয়া নহে পরন্তু তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত বলিয়া তাঁহার সেই দোষগুলি সংশোধনে আন্তরিক প্রয়াস পাইতেছি।[৪৪]

বক্সোমেট্রি সম্বন্ধে তিনি ইংরেজিতে একটি গ্রন্থ রচনা করেন বলে জানা যায়। 'কাগজের বাক্স রচনা' নামে 'ভারতী ও বালক'-এর ১২৯৫র চৈত্র সংখ্যায় তিনি যে পদ্য প্রকাশ করেন তার মুখবন্ধে বলেন:

স্থত্রে না গাঁথিয়া— আঠায় না জুড়িয়া— শুদ্ধ:কেবল কাগজ কাটিয়া মুড়িয়া এবং তাহার দুই এক স্থানে ছিদ্র কাটিয়া— ডালা এবং তালা সমেত সর্বাঙ্গস্থন্দর বাক্স রচনার নূতন একটি প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া নিম্নে তাহা পদ্যে লিপিবদ্ধ করা হইল। কাজ চলা গোছের রীতিমত একটি বাক্স— ছেলেখেলা গোছের নহে। যিনি চক্ষে দেখিয়া বুঝিয়া লইতে ইচ্ছা করেন প্রণেতা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

বাক্স রচনা শেষ হবার পরে:

ভিতর বাহির আর চৌদিক পরখি
বলিবে 'ক্যাবাত! এযে অপূর্ব নিরখি।
ভার হবে যে তোমায় সামলিয়া রাখা
বাক্স পেলে পেলে যেন লাখ শ খানি টাকা।

কাগজের বাক্স রচনা শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর একটি ব্যসন ছিল।[৪৫]

'রেখাক্ষর বর্ণমালা' ১৩২৯ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন সাময়িক পত্রেও তাঁর এ পুস্তকের আলোচনা দেখা যায়।[৪৬] এ ছাড়াও তাঁর হস্তাক্ষরে মুদ্রিত, 'রেখাক্ষর বর্ণমালা'ও প্রকাশিত হয়। তবে সাধারণের মধ্যে বেশি প্রচার হয় নি। বন্ধুসমাজেই আবদ্ধ ছিল। প্রসঙ্গত রাজনারায়ণ বসুকে লেখা তাঁর একটি চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে:

আমার রেখাক্ষর ছাপা হইয়াছে— আমি তাহা স্বহস্তে ছাপিয়াছি, Printer and Publisher.

দশ কপি ছাপাইয়াছি— Public-এর জন্য নহে কিন্তু apostles দিগের জন্য— I want 10 apostles not 12 ; since decimel system has in the present century superceded all other numerical systems in the field of exact science.

Each one of the apostls will be required to furnish himself with 10 disciples. Each of which 10 disciples will be again similarly propelled by stringent vows to seek out 10 disciples for himself and so on to infinity.

1 + 10	1st batch
11 + 100	2nd batch
111 + 1000	3rd batch

এইরূপে The Grand রেখাক্ষর শাস্ত্র will be গুরু পরম্পরায় প্রবাহিত।

(a বিদ্যা which will do wonders)

তাঁর এই রেখাক্ষর ঠিকমত অনুশীলিত হলে আজ বাংলা-ভাষীদের কাজের ক্ষেত্রে উপযোগী হত বলে অনেকের ধারণা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই রেখাক্ষর আগাগোড়া কবিতায় রচিত। একটি নমুনা :

বত্রিশ সিংহাসন

ব্যঞ্জন বরণ নহে চৌত্রিশের কম।
কারে রাখি, কারে ঠেলি, সমস্যা বিষম॥
'এক ব-এ বস্ আছে।' হারে রেখাচার্য।
চালাবে দন্ত্য-ন অ্যাকা দুই ন-এর কার্য
অন্ত্য ব নতুন করি গোপনে মন্ত্রণা,
ত্যজিল বরণমালা— ঘুচিল যন্ত্রণা।
এ দুটো আছিল মোর দুচক্ষের বিষ।
চৌত্রিশের দুই গেল রহিল বত্রিশ॥
বর্গে বর্গে বসি গেল বর্ণ আট আট
চারি আটে হয়ে গেল বত্রিশ ভরাট॥[৪৭]

রেখাক্ষর এবং বক্সোমেট্রি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক সুন্দর বিবরণের একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

তত্ত্বজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটি সৌখীন কলা তাঁর মনোরাজ্য অধিকার করে বসল— বাক্সরচনা প্রণালী, [৪৮] আর রেখাক্ষর বর্ণমালা। এতে এত সময় নষ্ট করা হল কেন? জিজ্ঞাসা করলে বড়দাদা হেসে বলেন, এ শুধু ছেলেখেলা নয়, এ দুই বিদ্যা সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত। লিখতে বসলে লেখবার নানা সরঞ্জাম চাই, কাগজ, কাগজ রাখার বাক্স, পকেট বই— এই সকল সামগ্রী আগে থাকতে সংগ্রহ করতে হয়— তাই লেখা-পড়ায় দিনকতক ক্ষান্ত দিয়ে বড়দাদা লেখবার জিনিস তয়েরির কাজে মন দিলেন। একদিকে যেমন কাগজের কারুকার্য, অন্যদিকে লিখন প্রণালী সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করে রেখাক্ষর বর্ণমালার সৃষ্টি করলেন। সাহিত্য ব্যবসায়ীর যাতে সময় সংক্ষেপ হয় এই উদ্দেশ্য। এই দুই শখের বিদ্যায় তাঁর বিস্তর সময় এবং পরিশ্রম ব্যয় হল। এই দুই বিদ্যা যদিও সামান্য তবু বড়দাদা অসামান্য ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে তাদের আয়ত্ত করতে নিযুক্ত রইলেন। তার জন্যে চিন্তা শিক্ষা ও সাধনা যা কিছু প্রয়োজন কিছুই বাকি রাখেন নাই। বাক্সতত্ত্বের জন্যে সমুদায় গণিতশাস্ত্র মন্থন করে তাঁর কাজের উপযোগী বিষয় সকল সংগ্রহ করতে হয়েছে, সেই সংক্রান্ত নূতন নিয়মাবলী প্রস্তুত করতে হয়েছে।··· এই তো গেল বাক্স-প্রকরণ। রেখাক্ষর, সেও এক অপূর্ব বস্তু, তাতে কত কবিত্বরস, কতরকম রেখাপাতের কৌশল ছড়াছড়ি, না দেখলে তার মর্যাদা বোঝা যায় না।[৪৯]

তাঁর রেখাক্ষর বর্ণমালা এবং তার লিখন প্রণালীর মতোই তাঁর অতি সাধারণ শব্দকোণ রচনা বা ম্যাজিক স্কোয়ার সৃষ্টি এ সমস্তই তাঁর বিজ্ঞানীসুলভ মনের পরিচায়ক।[৫০] আরো একটি আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় খেয়ালের প্রকাশ দেখি তাঁর দাবা খেলার নিয়মাবলী কখনো কবিতা কখনো বা ছকের সাহায্যে লেখায়। এই জাতীয় একটি কবিতা :

চূড়ার মাঝে চন্দ্র থুয়ে ঘোড়ায় চড়ে নাবো দুয়ে ॥
ভর দিয়ে রেকাব জিনে দুই থেকে ওঠো তিনে ॥
চৌ গাঁয়ে নেবে পড়। ঘোড়া রেখে হাতি চড় ॥

গজের পিঠে সেজে বেরিয়ে, ছয়ে যাও পাঁচ পেরিয়ে॥
সিন্ধুকূলে লাগিয়ে নাও। ঘোড়ায় চ'ড়ে আটে যাও॥
ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগিয়ে, নয়ে নাবো রাগ বাগিয়ে॥
মত্তর হাতীর এড়িয়ে হাত
ঘোড়ার চালে কিস্তিমাত॥[৫১]

এ ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতিধর্মী রচনা[৫২] থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথের আরো একটি ছোটো খেয়ালের কথা জানা যায়। তিনি হেঁয়ালি রচনা করতে ভালবাসতেন। তার দুটি নমুনা :

১ বল দেখি তিন অক্ষরে কথা,
প্রথম অক্ষরদ্বয়ে সবে যায় বাঁধা
শেষ দু অক্ষরে আর সবে যায় বেঁধা
মূর্খে কি বলিতে পারে পণ্ডিতের ধাঁধা।
রসিক

২ ইংরাজিতে বলে যাহা প্রথম অক্ষর,
বাঙলায় তাহা বলে দ্বিতীয় অক্ষর,
প্রথমে দ্বিতীয়ে তাহা জানায় আপত্তি,
সব তাতে ঘাড় নাড়ে, বিষম বিপত্তি,
দু অক্ষরে ফল একি বল দেখি ভাই,
কেহ বলে বড় মিষ্টি কেহ বলে ছাই।
নোনা

ভাষা ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁর রচিত 'উপসর্গ বিচার' বা 'উপসর্গের অর্থবিচার'[৫৩] প্রভৃতি নিবন্ধ থেকে এ কথা জানা যায়। 'প্রবন্ধমালা'-য়[৫৪] দেখি "যুক্তির বদলে গায়ের জোর" অংশে বিভিন্ন ভাষার শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ভাষার শব্দবৃদ্ধির প্রয়াসে তিনি প্রচুর পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মতোই তিনি সাহিত্যিক পরিভাষা তৈরি করতে চেয়েছিলেন।[৫৫] তাঁর এই ভাষা-সচেতনতা সম্বন্ধে পৌত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ জ্ঞাত ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন।[৫৬]

রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত 'খেয়াল খাতা' বা পারিবারিক স্মৃতিলিপিতে তাঁর

নিজস্ব হস্তাক্ষরে একটি ছড়া পাওয়া যায়। তাতে তিনি নিজেকে 'জটায়ু পক্ষী' বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৭] শব্দের দ্বিত্ব বর্জন সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা এই চিঠিতে বানান সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে :

নগেন

বহুত আচ্ছা—নিম্নলিখিত কয়েকছত্র কবিতা (?) সংকলিত পত্রিকায় এক কোণে প্রকাশের জন্য দিলাম—

—বর্ণমালী! বাণী মা কি বলিতেছেন শোনো।
তেলা শিরে তেল দিয়ে ফল নাই কোনো॥

...

অর্চ্চনার ঘটা এ যে বড্ড জমকালো।
শুদ্ধমতি ভকতের অর্চনাই ভালো॥
অর্জ্জনের দেহ ফুলি হইয়াছে ঢাক।
কাজ নেই তাহাতে— অর্জন বেঁচে থাক॥
পর্ব্ব গর্ত্ত অতিশয় গর্ত্ত এটা।
পর্ব গর্ভ লিখিলেই চুকি যায় লেঠা॥

...ইত্যাদি

ভাবজীবনে একাকীত্ব বা নিঃসঙ্গতার ধারারক্ষী এই মানুষটি তাঁর চারপাশের সাধারণ মানুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে বা তাদের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন নি। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন : 'Average man-এর জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া দিলে বিজ্ঞানের উত্থানদ্বারে কপাট পড়িয়া যাইত।' তাই তিনি স্বীকার করেছেন : 'Average ম্যানের প্রতি আমার শ্রদ্ধাও তেমন নেই—আর তাহার উপরে আশা ভরসাও স্থাপন করিতে পারি না।'[৫৮]

দ্বিজেন্দ্রনাথ নির্লিপ্ত হলেও ছাপার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। ছাপার সময় লেখাটি যাতে বিকৃত না হয়ে যায় সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন এবং যত্নশীল ছিলেন। কবিতায় এবং গদ্যে লেখা অনেকগুলি চিঠিতেই তাঁর এই উদ্‌বেগ প্রকাশ পেয়েছে।[৫৯] একবার একই বিষয় নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে তিনি একাধিক পত্রাঘাত করেন। সেই চিঠিগুলি দেখলেই বোঝা যাবে তাঁর রচনা সম্বন্ধে তিনি কিভাবে চিন্তা করতেন। এখানে সেই রকম দুটি চিঠি তুলে দিলাম :

পরম সম্মানাস্পদ সম্পাদক মহাশয়,

শ্রীর অবতারণায় উল্টা শ্রী হইয়া দাঁড়াইতেও পারে ; অতএব কাজ নাই। যেমন আছে তাহাই থাক! বিশেষত ছাপার ব্যাপারটাকে আমি বাঘ দেখি। আপনাকে আর আর উত্ত্যক্ত করিব না—যাহা করিয়াছি—'গতস্য শোচনা নাস্তি।'

অনুরক্ত

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অথবা অন্য চিঠি :

সম্মানাস্পদ প্রীতিভাজনেষু

আবার ভাবিতেছি শ্রী' বসাইলে মন্দ হয় না। অতএব পূর্বে যেখানে করিয়াছিলেন সুশ্রী এবং বিশ্রী তাহার পরিবর্তে শ্রীহীন করিবেন তাহাই ভাল। আর আর বিষয়ে পূর্বের পত্রে যেরূপ লিখিয়াছি সেইরূপ করিয়া দিবেন।

অনুরক্ত

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি যেমন নিয়ত তৎপর ছিলেন, সমসাময়িক অন্যান্য রচয়িতাদের সম্বন্ধেও তিনি সেরকমই অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। নতুন বাক্যরুচি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের চেয়েও হয়তো কোনো অংশে কম ছিল না : 'সাহিত্য-জগতে অপরিচিত গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনা প্রণালীর প্রশংসা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত "ভারতী"-তেই প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিবরের "মায়াতরু"-র কল্পনা ও গীত, সাগরবালা, স্বপ্নসঙ্গিনী প্রভৃতি অশরীরী চিত্রের সৃষ্টি ও তাঁহার নাট্যছন্দের সুখ্যাতি প্রথমে ঐ "ভারতী" মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে।'[৬০]

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনে প্রচলিত অর্থে কর্মবৈচিত্র্য বা ঘটনাবৈচিত্র্য নেই। কিন্তু তাঁর মন বিচিত্রমুখী ; তাঁর আগ্রহ নানা বিষয়ে সঞ্চারী। প্রসঙ্গত, স্মৃতিচর্যা সূত্রে একজন আধুনিক সাংবাদিক শিল্পী বলেছেন :

আশ্রমের এক প্রান্তে এক প্রাচীন ঋষি বাস করতেন। আত্মভোলা, ঋষিসুলভ শুভ্র এবং শ্মশ্রু। পাখী ও কাঠবিড়ালীদের সঙ্গে তাঁর ভাব। দর্শনশাস্ত্র অনুশীলনে বিরাম নেই। অনুশীলনে ক্লান্তি বোধ হ'ল, কিছু

রিক্রিয়েশন দরকার, কিছু খেলা দরকার। দর্শন অনুশীলন ছেড়ে খেলায় মাতলেন। কি সাংঘাতিক খেলা!... শুধু তাই নয়, শাস্ত্র অনুশীলনে কোথায়ও এসে ব্যাখ্যা আটকে গেল, ব্যাখ্যা দরকার। তখনই আপন রিকশ'খানায় চেপে হাল্কা কয়েকগাছা রেশমী দাড়ি ওড়াতে ওড়াতে ছুটলেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে।[৬১]

তাঁর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত পরিচিতের বর্ণনা থেকে এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব নয় যে, এই মানুষটি সব দিক থেকেই সাধারণ গণ্ডিকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন, যদিও সেই অতিক্রান্তিতে না ছিল আধ্যাত্মিক আড়ম্বর, না ছিল পারিপার্শ্ব থেকে আত্মপ্রত্যাহার।

বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় তাঁর বিষয়ে একটি তাৎপর্যময় উক্তি করেছেন: 'সংসারে লোকের অনেক দিক থাকে, সংসারীকে অনেক দিকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, অনেক কার্য করিতে হয়, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের যদি কোন দিক থাকে, যদি তিনি সমগ্র কিছু আরাধনা করেন, তবে তাহা একমাত্র জ্ঞান...।'[৬২] এই জ্ঞানার্চনার বিষয়ে তাঁর কোনো সময়জ্ঞান ছিল না। এমনও দেখা গেছে: 'লিখিতে লিখিতে ভোর হইয়া গেল, চাকরকে ডাকিয়া শয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময় শুনিলেন প্রভাতের বিহঙ্গম বৈতালিকগণ তাহাদের গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আর শয়ন করা হইল না, স্নান করিয়া দৈনিক দুই মাইল পর্যটন সমাপ্ত করিয়া খাতা লইয়া আবার লিখিতে বসিলেন।'[৬৩]

তাঁর এই একাগ্রতা এবং একনিষ্ঠতা বিষয়ে আরো অনেক প্রচলিত গল্প অনেকেরই জানা। প্রাত্যহিক, ব্যবহারিক জীবনে অনেক সময়েই তাঁর আত্মবিস্মৃত ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। 'নির্জন নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ আশ্রমে' লেখাপড়া করেই তিনি সময় কাটাতেন। 'বিধাতা জন্মকাল হইতেই তাঁহাকে দার্শনিকের ছাঁচে ঢালাই করিয়া গড়িয়াছিলেন। দার্শনিকের জ্ঞানানুরাগ ও সংসার ব্যাপারে অনভিজ্ঞতা দুইই তাঁহাতে সমমাত্রায় ছিল।'[৬৪] এ বিষয়ে প্রচলিত গল্প-গাথার উল্লেখ অনেকেই করেছেন।

সাংসারিক অর্থে জ্ঞান তাঁর ঠিক ছিল না। ঘিয়ে ভাজা লুচি খেতে গিয়ে হাতে ঘি লাগায় তিনি জলে লুচি ভেজে আনার হুকুম দেন— এ গল্প তাঁরই পুত্রবধূ করে গেছেন।[৬৫] 'ঘি দিয়ে লুচি ভাজা অত্যন্ত অন্যায়' এ কথা মনে

হওয়ায় তিনি মুনীশ্বরকে অত্যন্ত বকাবকি করেন। পরে আবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ভুল সংশোধন করে নেন।

তাঁর চশমা হারানোর গল্পটিও অত্যন্ত পরিচিত। দ্বিজেন্দ্রনাথের ভৃত্য কালী প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ যা বলেছেন প্রসঙ্গত তা উদ্ধৃত করছি:

তার উপর কত রাগ, কত তম্বী, কত ঝড় তুফান গালিবর্ষণ হচ্ছে, আমরা দেখছি অনেক সময় অকারণে; চশমা খুঁজে পাচ্ছেন না তাকে কত ধমকান হচ্ছে, চীৎকার ধ্বনিতে আকাশ ফেটে যাচ্ছে অথচ সেই চশমা হয়ত নিজের পকেটে— পকেটে বলাটাও ঠিক হ'ল না, তাঁর চোখের উপর কপালে ঠ্যাস্‌কান রয়েছে—আমরা দেখিয়ে দিলে শেষে হেসে অস্থির। এদিকে একহাতে যেমন তিরস্কার, পরক্ষণে অন্যদিকে অন্যহাতে তেমনি পুরস্কার। এইরূপ ক্ষতিপূরণের কাজ চলেছে, কালীও এই গালিগালাজ চড়টা চাপড়টায় কোন ভ্রূক্ষেপ না করে মনের সুখে কাজ করে যাচ্ছে।[৬৬]

তাঁর এই বিস্মৃতি, বিশেষ করে চশমা হারানোর গল্প, অনেকের কাছেই শোনা গেছে। হেমলতা দেবী তাঁর এই শিশু-সুলভ স্বভাবের কথা অনেককে বলেছেন। তাঁদেরই একজনের চিঠি থেকে নিম্নবর্ণিত ছবিটি পাওয়া যায়:

বড়মা একদিন বললেন যে, 'বাবামশায় (শ্বশুরকে তিনি বাবামশায় বলতেন) একদিন তাঁর ঘর থেকে চীৎকার করছেন, "আমার চশমা কোথায় গেল, আমার চশমা কোথায় গেল," আমরা তো হন্তদন্ত হয়ে খুঁজছি; কোথাও চশমা পাচ্ছি না, অথচ চশমা যে তাঁর চোখেই পরা আছে আমরা কেউই তাও লক্ষ করিনি। তারপর মুনীশ্বরকে ডাকলাম। মুনীশ্বর তাঁর কাছে গিয়ে পিছন দিকে চশমাটা তুলে আবার বসিয়ে দিল, আর তখন উনি হো হো করে হেসে উঠলেন, আর আমরাও বেশ লজ্জিত হলাম যে তাঁর চোখের দিকে আগে দেখিনি। চোখেই যে সেই চশমা আঁটা আছে, আত্মভোলা মানুষটির সে খেয়াল ছিল না বা অনুভূতি ছিল না, এতই গভীর দর্শন চিন্তায় মগ্ন থাকতেন।[৬৭]

তাঁর আচার-আচরণ সমস্তই মন্ময় প্রবণতা অনুযায়ী। প্রচলিত প্রথা নিয়মকানুন কিছুই তিনি মানতেন না। সামাজিক অনুশাসন বা 'লোকে বলবে'— এই চিন্তা তাঁকে একেবারেই বিব্রত করত না। সেজন্যই তাঁকে

বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পোশাকে অনেক সময়েই দেখা যেত। 'চশমার যে যে স্থান শরীরের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকে কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব হয় বলিয়া তিনি চশমার সেই স্থানে তুলা জড়াইয়া লইতেন। বেড়াইবার সময় চাপকান ঝুলিয়া থাকায় অসুবিধা হয়, তিনি বাম দক্ষিণ স্কন্ধে মোটা ফিতা দিয়া তাহা বাঁধিয়া লইতেন। চটি জুতোয় বুড়ো আঙ্গুলে লাগে তিনি তজ্জন্য জুতোর সেই স্থানটুকু গোল করিয়া কাটিয়া লইতেন।'[৬৮] সৌমেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেছেন: 'একটা কামিজের উপর একটা কামিজ উল্টো করে পরা, হাতের মোজা দস্তানা দড়ি দিয়ে বাঁধা এই ছিল তাঁর বেশ। পড়ার আর লেখার বিরাম নেই আর তার মাঝে চোখ বন্ধ করে কোথায় যেন ডুব দিয়ে কি দেখে নিতেন।...

চৌকির চারদিকে কাঠের ফ্রেম মশারি দিয়ে ঘেরা। চৌকিতে বসে মোমবাতির আলোয় টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে গভীর রাত পর্যন্ত লিখে চলেছেন দাদামশায়।'[৬৯]

কঠিন তত্ত্ববিদ্যা শোনাবার আর কোনো শ্রোতা না পেয়ে হাতের কাছে বাড়ির দাসীকেই তিনি দর্শনশাস্ত্রের শ্রোতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর মতো দুরূহ কাব্যও তাকে শুনিয়েছেন; দাসী, বড়োবাবু যখন শোনাচ্ছেন তখন নিশ্চয় এ কোনো ঠাকুর-দেবতার কাহিনী, এ কথা মনে করে, কাব্যপাঠান্তে কপালে হাত ঠেকিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করছে এই ঘটনার উল্লেখ তাঁর আত্মীয়ের রচনায় পাওয়া যায়। তাঁর অন্যরচনা প্রসঙ্গে অন্য এক স্মৃতিচিত্রণে তাঁর চরিত্রের আর-একটি দিক প্রকাশ পেয়েছে: 'নিরহঙ্কারী বাবামহাশয় কোনো কিছু একটা লিখে কেবলই বলতেন, "লেখাটা আমার ঠিক হয়েছে কিনা এবং তোমাদের অন্তরস্থ সত্যের ভাব ও ধারণার সঙ্গে মিল আছে কিনা, ভাল করে পড়ে দেখে বুঝে আমাকে বল"।'[৭০]

পশুপক্ষীর প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা ছিল। তারাও তাঁর এ ভালোবাসার সম্পূর্ণ মর্যাদা দিত। কেননা তিনি যখন নীচু বাংলার বারান্দায় বসে থাকতেন তখন এরা সবাই তাঁকে ঘিরে থাকত। কিন্তু এর ফলে কখনো কখনো যে বিপত্তি ঘটে নি তা নয়। কিন্তু সেই চোখ ঠোকরানো বা কাঠ-বিড়ালীর জামার ভিতর ঢুকে তাঁকে বিব্রত করা কোনো কিছুতেই এদের প্রতি তিনি বিরূপ হন নি। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রসন্ন আত্মভোলা ব্যক্তিত্বের যে আলেখ্য তা প্রায় একটি উপান্ত্য প্রকৃত মরমীর (nature mystic) ছবি তুলে ধরে।

এই আলেখ্য St. Francis of Assisi-র কথা মনে করিয়ে দেয়। নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের মতো এখানে তিনি দূরবর্তী হয়েও দ্যুতিসঞ্চারী। সত্যেন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে তাঁকে তুকারামের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

'যে কেহ তাঁহার নিকটে আসিত, তাহাকেই তিনি সরল হৃদ্যতার প্রীতি-পার্শে বদ্ধ করিয়া লইতেন। তাঁহার শিষ্টাচার-সৌজন্যে কিছুমাত্র কপটতা ছিল না। কোন মানুষ নহে, বনের পশুপক্ষী, জীবজন্তুও তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহাকে আপন করিয়া লইত। তিনি বসিয়া থাকিতেন, আর কাক, শালিক, কাঠবেড়ালী প্রভৃতি কেহ বা মস্তকে, কেহ বা শরীরে, কেহ বা পদপ্রান্তে খেলা করিয়া বেড়াইত।'[৭১]

জ্ঞানে, বিদ্যায় এবং জীবনযাত্রায় তিনি ঋষিতুল্য ছিলেন। অপরের দুঃখ বা অসুবিধা তিনি বুঝতে চেষ্টা করতেন। কারো সাহায্য প্রয়োজন হলে তিনি নিজে সাধ্যমত সাহায্য করতেন এবং তাঁর সাহায্য ছাড়াও অতিরিক্ত সাহায্য প্রয়োজন মনে করলে তার বিকল্প ব্যবস্থা করতেন।[৭২]

জীবনে তিনি সর্বতোভাবে সত্যব্রত। সত্যের সৌজন্যে কেউ তাঁর সমালোচনা করলে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন না: 'আপনার কোন কথাকে আমি personal attack মনে করিনা— I am for real truth। সত্যের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিলেই আমার গায়ে লাগে, তাই আমি লম্ফঝম্প করিয়া উঠি।'[৭৩]

'শাস্ত্রের মধ্যে অনেক সত্য আছে কিন্তু তাহার মধ্যে অসত্য যে নাহি তাহা নহে। শাস্ত্রোক্ত বচন, সত্য হইলে তাহা যে শাস্ত্রোক্ত বলিয়াই সত্য এমন নহে, যৌক্তিক বলিয়াই তাহা সত্য।'[৭৪] —এই কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর জীবনবেদ এই বিশ্বাস দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

শেষজীবনে নীচুবাংলায় তাঁর এককজীবন কেটেছে। কিন্তু তিনি নিজে একান্নবর্তী পরিবারের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি ভাবতেন, 'একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে যে প্রীতি ও সদ্ভাব ছিল আজকাল আর তা দেখা যায় না।' সামাজিক রীতিনীতি ঠিকমত মেনে চললে এইরকম পারিবারিক ব্যবস্থাই যে বিশেষ হিতকর সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারের একটি বিশেষ দোষ তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি :

কিন্তু যদি কেহ ধর্ম সম্বন্ধে নূতন মত অবলম্বন করিবার প্রয়াসী হন,

তাহা হইলে এই একান্নবর্তী পরিবার বাধা দেয়। সে কিছুতেই ব্যক্তি বিশেষের মত মানিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে চায় না, অথবা তাহার মত মানিয়া না লইয়াও, তাহাকে বৃহৎ পরিবারের মধ্যে থাকিতে দিয়া, স্বাধীন ভাবে তাহাকে তাহার নিজের স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে দেয় না। এইখানেই এই joint family system-এর সঙ্কীর্ণতা।[৭৫]

তবে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনচিন্তা সম্পূর্ণরূপে যে বাধা পেত তিনি তা মনে করেন নি। তিনি স্বীকার করেছেন সে সম্বন্ধে সমাজের একটা 'toleration' বরাবর ছিল।

তিনি তাঁর বাসস্থান বা আবেষ্টনী সম্বন্ধে মোটেই নির্লিপ্ত ছিলেন না। স্মৃতিচারণ কালে যে-সব কথা বলে গেছেন তা তাঁর গৃহ প্রীতিই ঘোষণা করে :

ইংরাজ যখন আমাদের বলে 'তোমাদের home বলিয়া কোনও জিনিষ নাই ; আমাদের home sweet home, আমাদের friends এর সমান তোমাদের কিছু নাই,' তখন আমার মনে হয় যে, এরা বলে কি। আমাদের home নাই তো কার আছে ? অন্ততঃ আমার কাছে আমার বাড়ি যে কি আনন্দের জিনিষ ছিল, সে আর তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব ? আমার বাড়ি আমার কাছে স্বর্গ ছিল।[৭৬]

নিজে শিশুর মতো সরল ছিলেন বলেই যেন শিশুর মনের কথাও তিনি সহজেই বুঝতে পারতেন।[৭৭]

রবীন্দ্রনাথ একসময় ক্ষিতিমোহন সেনকে বলেছিলেন : 'যদি আমার শিক্ষার ভার বড়দাদার হাতে থাকিত তবে আরো বেশি স্বাধীনতা পাইতাম, অনেক দুঃখ দুর্গতি এড়াইতে পারিতাম এবং আরো পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা পাইবার সুযোগ ঘটিত।'[৭৮]

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। যাঁরা সে সময় সমাজের উপরের দিকে, তাঁদের অনেকেরই উপ-পত্নী ছিল। তখন এ রীতি দূষণীয় বলে পরিগণিত হত না। দ্বিজেন্দ্রনাথও এ রীতিকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন।[৭৯] ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর মদ্যপানাদি দোষ তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে নি। ঐ দল যে বিদেশী শিক্ষাদর্শের আলোকে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলেন এবং তার ফলে দেশের যে উন্নতি করেছিলেন তাই তাঁর কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল।

তিনি নিজে প্রসন্ন কৌতুক বা হিউমারের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে নিজের নামের আগে লেখেন: 'আপনার তত নয় যত আপনার/হাস্যের একান্ত বশম্বদ/শ্রীঅমুকেন্দ্রনাথ অমুক D. N. Tagore।'[৮০]

চিঠিপত্র লেখার সময় অনেক ক্ষেত্রেই ছবির সাহায্যে মনোভাব প্রকাশ করতেন। একবার একটি চিঠি প্রসঙ্গে বিধুশেখর শাস্ত্রী লিখেছেন: 'চিঠিতে দেখিলাম সংখ্যার পরে সারি সারি কয়েকটি মুণ্ড আঁকা। তাহার পরে সালের সংখ্যা··· আমার বুঝিতে দেরী হইল না। ঐ ছয়টি মুণ্ডে দ্বিজেন্দ্রনাথ কার্তিক মাস বুঝাইয়াছেন। কার্তিকের আর এক নাম ষড়ানন।'[৮১]

'দীন দ্বিজের রাজদর্শন না ঘটিবার কারণ' হিসেবে পদ্যে যে পত্র লেখা হয়েছিল, সেই বহু পরিচিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তির মধ্য দিয়ে একাধারে তাঁর হাস্যরসবোধ এবং বাস্তব সত্যকে হাস্যরসের মাধ্যমে প্রকাশের প্রচেষ্টা পরিস্ফুট:

টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা
না রহে কোন জ্বালা
বিদ্যা বুদ্ধী কিছুই কিছু না
খালি ভস্মে ঘি ঢালা।
ইচ্ছা সম্যক্ তব দরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু
একি দৈবের শাস্তি।[৮২]

গভীর বক্তব্যও তাঁর পরিবেশনের গুণে সরস হয়ে উঠেছে:

আর্যামিও যেমন, সাহেবিআনাও তেমনি— দুইই সমান। দুইই নারিকেলের শাঁস ফেলিয়া ছোবড়া ভক্ষণ। আমাদের দেশের জ্ঞান ধর্ম ধৈর্য বীর্য দয়া দাক্ষিণ্য অহিংসা ক্ষমা ঋজুতা এইগুলিই শাঁস, আর টিকি রাখা, ফোঁটা কাটা, ভিতরে পদার্থ নাই, মুখে বামনাই, দলাদলির মোড়ল-গিরি, এইগুলি ছোবড়া; এই ছোবড়াগুলিই আর্যামির প্রধান সম্বল। তেমনি আবার, উন্নতবিজ্ঞান, উন্নত শিক্ষা, অটল কর্তব্যনিষ্ঠা, কর্মিষ্ঠতা, কার্য-নৈপুণ্য, তেজস্বিতা এইগুলি উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মূল

উপাদান— এইগুলি শাঁস, আর ইংরাজদিগের ন্যায় চটুল ধরণের চাল্, ইংরাজদিগের ন্যায় জড়ানে-জড়ানে বুলি, ইংরাজদিগের ন্যায় চলাচলের ব্যাঘাতজনক আঁটাসাঁটা অশোভন পরিচ্ছদ এইগুলিই ছোবড়া; এই ছোবড়াগুলিই সাহেবিআনার প্রধান সম্বল। তাই আমরা বলি যে আর্যামি এবং সাহেবিআনা দুইই এপিট্-ওপিট্— এ বলে আমার দ্যাখ্ ও বলে আমায় দ্যাখ্।[৮৩]

কিংবা যখন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখেন:

প্রিয় ত্রিবেদী মহাশয়,

Goldsmith লিখেছে 'England with all thy faults I love thee still' আমি তেম্নি বলতে পারি যে, Trivedi with all thy dou'tings and floutings I love thee still; তার সঙ্গে একটি কথা আমি বলতে চাই এই যে,— doubt গুলো উপড়ে ফেলে cultivate faith and hope— আমাদের পুরানো শাস্ত্রকথা will help you to do this with greatest facility.

রবীন্দ্রনাথ-উক্ত, 'ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস,'[৮৪] দ্বিজেন্দ্রনাথ-লিখিত প্রতিটি চিঠি সম্বন্ধে সত্য।

দ্বিজেন্দ্রনাথের বীক্ষণশক্তি প্রকৃতির আপাততুচ্ছ বিষয়বস্তুতেও অবকীর্ণ। গুণেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে তিনি জানান:

Malabar Hill চমৎকার scenery. Houses and gardens like fairy land, sea just near the threshold. We are in a princely palace such a one as is only to be dreamt of in dreams··· O Goonoo, O Jyotee. I wish both of you were here. Goonoo, you would have been in ecstacy, what fairy gardens below— what a placid sheet of water foaming only a little near the coast and making music, day and night···. This is a place fitting exactly with স্বপ্ন-প্রয়াণ···

আর-একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন:

রেলগাড়ীতে বসিয়া পাটনা প্রভৃতি স্থান সকল দেখিয়া বড়ই প্রীতি

লাভ করিলাম। বাংলা অপেক্ষা এই সকল অঞ্চলের পল্লীগ্রাম অধিক পরিষ্কার বোধ হইল। স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্র দিব্য সুদৃশ্য অথচ পরিপাটি, পুরুষেরা অধিকাংশ সবল ও সুস্থ শরীর। পাটনা অঞ্চলের ফলের গাছ সকল দিব্য ছায়া করিয়া রহিয়াছে। মন্দির, গোরস্থান প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে নিভৃত স্থান দখল করিয়া আছে। সেকেলে ভাব বড় রমণীয়, পরিষ্কার ভূমি, গাছের ছায়া, মাঠে বালক বালিকা ইত্যাদি দেখিলে পূর্বেকার স্বাধীন ভাবের কতক আভাস পাওয়া যায়।···

উল্লিখিত চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের যে ছবিটি ফুটে উঠেছে তাতে তাঁর সচেতন এবং সংবেদনশীল মনের প্রকাশ।

'প্রধানত শান্তিনিকেতনে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছিলেন তাঁর পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রী হেমলতা দেবী, আশ্রমের সকলের বড়োমা। এ ছাড়া ছিল মুনীশ্বর। মুনীশ্বর বড়োবাবুর একান্ত ভক্ত ভৃত্য; শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। মুনীশ্বরই ছিল তাঁর তত্ত্বাবধায়ক, পার্শ্বচর, সর্বক্ষণের সঙ্গী। এইজন্য মুনীশ্বর বড়োবাবুর কাজকর্মে অথবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে কিছুক্ষণ অনুপস্থিত থাকলে তাঁর পক্ষে সেটা বড়োই অসুবিধার কারণ হত। চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর কাছে থাকার দরুন মুনীশ্বর ও বড়োবাবুর ধাত, স্বভাব, মেজাজ এমন বুঝে নিয়েছিল যে বড়োবাবু ইঙ্গিতে যা বলতেন মুনীশ্বর ষোলো আনা তা বুঝে নিত। বড়োবাবুর অভাব-অভিযোগের ফাই-ফরমাশের তাল সামলাবার জীবন্ত যন্ত্রস্বরূপ ছিল মুনীশ্বর।'[৮৫] এ ছাড়া ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের সচিব অনিল মিত্র মহাশয়।

তাঁর দাম্পত্য জীবনের বিশেষ কোনো কথা জানা যায় না। তিনি সহধর্মিণী সম্পর্কে তেমন কোনো প্রকাশ্য উক্তি করেন নি। তবে আশ্রমিক লোকশ্রুতি অনুযায়ী শান্তি ও সন্তোষের আভাসই পাওয়া যায়। সম্ভবত এই শান্তি কবি-জীবনের গূঢ় ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের গ্রন্থে তাঁর বড়োমা অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথের স্ত্রীর একটি ছোটো অথচ ঘরোয়া ছবি আছে। সেই বর্ণনা থেকে তাঁর পারিবারিক জীবনের প্রসন্ন পরিবেশের একটি দিক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়: 'বউমা হচ্ছেন দীপুদার মা, আমরা বলতুম বড়োমা। সেই ঘরেই এক পাশে আমাদের জন্য ছোটো ছোটো আসন দিয়ে জায়গা হত। কর্তাদিদিমার বড়োবউ, লাল চওড়া পাড়ের শাড়ি-পরা— তখনকার দিনে চওড়া

লালপেড়ে শাড়িরই চলন ছিল বেশি, মাথায় আধহাত ঘোমটা টানা, পায় আলতা বেশ ছোটোখাটো রোগা মানুষটি।'[৮৬]

তাঁর পত্নীবিয়োগ হয় শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রাক্‌পর্বে। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু জানা না গেলেও তাঁর পত্নীর মৃত্যুর পরে লিখিত একটি গানে তাঁর শোকের ব্যাপকতা প্রকাশ পেয়েছে :

বসন্তের কাল গেছে কেন ফুল ফুটিবে আর
ভানু গেছে অস্তাচলে হবে নাকি অন্ধকার,
ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার বীণা কি বাজিবে আর
হাসিটুকু নিয়ে গেছে রেখে গেছে হাহাকার।
ছিল প্রাণ, সে গিয়াছে, দেহে কি আর কেহ আছে
কাহারে, কেমন আছ, শুধাইছ বারে বার।[৮৭]

তবে এ কথা মানতেই হবে এই গানে অক্ষয়কুমারের 'এষা'-র নিবিড় এলিজি-মূল্য অথবা রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যের সমাহিত আবেগপুঞ্জ কোনোটিই নেই।

জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের মৃত্যুও তাঁকে বিশেষ কাতর করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে সুধাকান্ত রায় চৌধুরী যখন দেখা করতে যান, দ্বিজেন্দ্রনাথ নিতান্ত অসহায় শিশুর মতো বলেছিলেন : 'দ্বিপু চলে গেলেন। আমার দেখাশোনা সব কর্তব্যই যে ছিল তাঁর। আমি যেন অভিভাবকহীন হয়েছি। অমন করে আমার খবরদারি আর কে করবে। আশেপাশে তো সকলেই আছেন কিন্তু দ্বিপুর অভাবটা খুবই অনুভব করছি।'[৮৮]

তাঁর স্বাস্থ্য ছিল অটুট। তিনি নিজে কৌতুকচ্ছলে বলেছিলেন যে, তিরিশ বছরে তাঁর কখনো মাথা ধরে নি। আধুনিক চিকিৎসা বিষয়ে বিতৃষ্ণা তাঁর একটি চিঠিতে উচ্চারিত :

ওঁ বিষ্ণু, বড্ড একটা ভুল করিয়াছি। বৈদ্য তিন শ্রেণীতে নহে পরন্তু চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। চতুর্থ শ্রেণী হচ্ছে গোবৈদ্য। ইহাদের মতে কুইনাইন হইতেছে সর্বরোগহরৌষধি।... ইহাদের রাক্ষসী চিকিৎসায় রোগ ভোগী বেচারাদের জীর্ণ শীর্ণ দেহে জ্বর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীত্যাগ হইয়া যাইতে একটুও বিলম্ব হয়না।[৮৯]

'একবার আগের রাত্রে একশ চার ডিগ্রি জ্বরের পরেও পরদিন অভ্যাসমত,

ভোরেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করলেন।··· মানুষের সাড়া পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে জল-ভরা প্রকাণ্ড বড় একটি টবের মধ্যে ঝুপ করে গিয়ে বসে পড়লেন··· পাছে লোকে এসে স্নানের বিঘ্ন ঘটায়। পুত্রবধূরা উদ্‌বেগ প্রকাশ করায় বললেন : 'রোগের জন্য ভাবো কেন, আমি নিজের চিকিৎসা নিজে খুব ভাল জানি। বদ্যি ডেকে নাড়ী টেপাবার দরকার নেই, ঔষধপত্র সব আমার নিজের মত চলবে। যাও, খিচুড়ি তৈরি কর গিয়ে'।'[২০]

দ্বিজেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি অশক্ত হয়ে পড়েন নি। তবে তাঁর দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত মস্তিষ্কশক্তি অব্যাহত ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রধানত তিনি অধ্যাত্ম বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসতেন। অন্যান্য প্রসঙ্গে যে আলোচনা একে-বারে করতেন না তা নয় তবে তার পরিমাণ খুব কম। মৃত্যুর একদিন পূর্বে তিনি 'দ্বিজের ত্রিজত্ব' নামক কবিতাটির প্রুফ সংশোধন করেন। এমন-কি সেদিন তিনি মুণ্ডক উপনিষদের দু-তিনটি শ্লোকও— 'সুন্দর দুটি পক্ষী···' ইত্যাদি যাদের অন্যতম— অনুবাদ করেন।

সোমবার ১৩৩২ সালের ৪ মাঘ, (১৯ জানুয়ারি ১৯২৬) শেষ রাত্রে তাঁর মৃত্যু। সেদিনও একটি কবিতাতে তিনি কিছু পরিবর্তন করেন। অন্তিম পঙ্‌ক্তি দুটি তাঁর অন্তিম উপলব্ধির কিছুটা আভাস দেয় :

> মাথায় করি লব যবে তুমি পাঠাইবে মরণ।
> মরণে সে ডরে না কভু রহে যে ধরি চরণ॥

তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-মন্দিরে যে ভাষণটি পাঠ করেন সেটি দ্বিজেন্দ্রনাথের চরিতমানসের উপর স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকপাত করেছে :

> চিরদিন বহির্বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন নিরাসক্ত, অন্তর্নিবিষ্ট ধ্যানপরায়ণ ছিল তাঁর চিত্ত, যারা ছিল তাঁর অনুগত অনুচর তাদের তিনি কখনো অবজ্ঞা করেন নি, তাদের সেবা গ্রহণ করে কৃতজ্ঞতার ঋণ অজস্র পরিমাণে শোধ করেছেন। পশুপক্ষীর প্রতি তাঁর সকরুণ আত্মীয়তা ছিল প্রসারিত, তরুলতার প্রতি কারো রূঢ় হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। শব্দ ও অর্থের রহস্যভেদের আশ্চর্য অধ্যবসায়ে তিনি ছিলেন প্রবীণ, অন্যদিকে তিনি ছিলেন ক্রীড়াপরায়ণ বালক— সামান্য উপকরণে অনাবশ্যক শিল্প-

নৈপুণ্য উদ্ভাবনায়। আপনার নিত্য প্রয়োজন ব্যাপারে তাঁর ছিল যদৃচ্ছাকৃত অসজ্জিত অবহেলা··· একদিকে আত্মতত্ত্বের সন্ধানে তাঁর মন ছিল গুহায়িত, অন্যদিকে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যলোকে তাঁর কবিহৃদয় সর্বত্র পেয়েছে আনন্দিত প্রবেশাধিকার, তাঁর নিভৃত অবকাশ ছিল গভীর গবেষণায় অভিনিবিষ্ট, তাঁর লোকসঙ্গ ছিল কলহাস্যোচ্ছ্বসিত সৌজন্যে মুখরিত।···

সাধকের আত্মাভিমানের দুর্গতি তাঁকে কোনোদিন স্পর্শ করে নি। জীবনের শেষভাগে এই মন্ত্রোচ্চারণের সত্য অধিকার লাভ করেছিলেন তিনি :

দিষ্টং নো অত্র জরসে নিনেষজ্
জরা মৃত্যবে পরি নো দদাত্যথ
পক্কেন সহ সং ভবেম।

আমার ভাগ্য আমাকে নিয়ে যাক জরায়, জরা নিয়ে যাক সেই মৃত্যুতে যে মৃত্যু আমাকে অসীম পরিণতির সঙ্গে যুক্ত করে দেবে।[৯১]

তাঁর মৃত্যুর পর এই মানুষটির সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত যে সংবাদকণা প্রকাশিত হয় তাতে নির্বহুল অথচ তদ্গত মূল্যায়ন আছে :

The Late Mr Dwijendranath Tagore

In the death of Dwijendranath Tagore at the ripe old age of 87, Bengal loses a 'recluse poet', a philosopher, scholar and musician steeped in deep meditation in the shady groves of the Santiniketan for thirty long years, fighting hard against the allurements of an inheritance, Dwijendra's life was one long tale of devotion to the Goddess of Learning. He has indeed, been overshadowed by his world-famous younger brother, but his name will yet find a niche in the pantheon of Indian scholarship and literary eminence...[৯২]

নিজের সম্বন্ধে কখনো তিনি কিছু বলতে চান নি। এ সম্বন্ধে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে বা আত্মজীবনী লিখতে অনুরোধ করা হলে তিনি বলতেন :

'আমার আবার আত্মজীবনী! আমার জীবনে কোন ঘটনা নাই। আর যা আছে সে সব কথা বলবার নয়। আসল কথা কি জান, আমি এখনও বড় কাঁচা। আমি নিজেকেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না, অপরকে আমার সম্বন্ধে কি বলিব। কেহ কি বুঝিবে? আমাকে যাহা দেখিতেছ তাহাই আমার জীবনী।'[৯৩]

দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্তরের সাধক পুরুষটি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যে সত্যের সাধনা করে গেছেন তা অনেকেরই অজানা। নিজের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না বলেই যেন নিজের সম্বন্ধে কোনো কিছু বলতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করতেন। তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কিছুই জানা যায় না। তাঁর নিজস্ব রচনা এবং বিভিন্ন মনীষীর বর্ণনাসমূহই তাঁকে জানার একমাত্র উপায়।

৩

স্বদেশব্রতী

ঠাকুর-পরিবারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে পরিবারের প্রত্যেকেরই স্বদেশ-প্রীতি লক্ষ করা যায়। বিদেশী ভাবধারার নিঃশর্ত অনুকৃতির পরিবর্তে তাঁরা সকলেই একটি অনন্য চিন্তাধারা এবং দেশজ মৌলিকতাকেই প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মৌল মানসিকতার গতিপ্রকৃতি তৎকালীন জাতীয় জীবনের চিন্তা-ধারাকে নতুন খাতে বইতে সাহায্য করেছে। এই প্রবর্তনায় তাৎক্ষণিক বুদ্ধিজীবী সমাজের বৃহদংশ নতুনভাবে ভাবতে শিখেছেন। তাঁদের চিন্তাজগতে স্বোপলব্ধি এসেছে। প্রথম দিকে এই আত্মজাগরণ ঘটল ধর্মের মাধ্যমে। সর্বপ্রথম তাঁদের এই উপলব্ধি জাগল যে, যে ধর্মের বিকাশ দেশের জল-মাটিতে হয় নি তার দ্বারা দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। এই বোধ জাগ্রত হওয়ার ফলে রামমোহন রায় প্রথম খৃস্টান মিশনারীদের অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন। তাঁকে দ্বিজেন্দ্রনাথের পিতামহ সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। এমন কি, তাঁর বিদেশ-যাত্রার পরেও দ্বারকানাথ ঠাকুর আর্থিক সাহায্য প্রদান করে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করেছেন।[১] প্রসঙ্গত এই নির্ধারণ যুক্তিসংগত: 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই অর্থসাহায্য এবং রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশের বেদান্ত-জ্ঞান ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগ— এই উভয়ের সমাবেশ না হইলে রাম-মোহন রায়ের মৃত্যুর পর হইতে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান পর্যন্ত নয় বৎসরকাল (১৮৩৩-৪২) ব্রাহ্মসমাজ জীবিত থাকিতে পারিত না।'[২]

উনিশ শতকের মাঝামাঝি এই স্বধর্মপ্রীতি আসলে তৎকালীন সমাজ-জীবীদের স্বদেশপ্রীতিই ঘোষিত করে। বিভিন্ন মনীষীর জীবনে বিভিন্নভাবে এই স্বদেশপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে। অনেকে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন, অনেকে আবার প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেন নি। তাঁরা লেখনীর সাহায্যে দেশবাসীকে জাগ্রত করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলা যায় তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দু ভাবেই রাজ-নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি হিন্দু মেলায় বা চৈত্র মেলায় সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন। আবার শেষজীবনে যখন শান্তিনিকেতনের

নীচুবাংলার কোণটিতে নিঃশব্দ, নির্লিপ্ত জীবনযাপন করেছেন তখন তিনি রাজনীতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়েছেন। তখনো কিন্তু তাঁর স্বাধীনতাকামী মনটি শুধু তাঁর রচিত গ্রন্থে নয়, তাঁর প্রাত্যহিক আলাপ-চর্যায় প্রকাশিত— বিধুশেখর শাস্ত্রী, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ প্রমুখ অনেকেই তার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

মধ্যযুগের স্বাদেশিকতার ধারণা ছিল ভৌগোলিক সীমান্ত রক্ষার প্রশ্ন। মানুষ তখন নিজের গণ্ডিটুকুর মধ্যেই স্থানিক স্বাধীনতার নিরাপত্তা চেয়েছে। আপন আপন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বা স্বাদেশিকতা তখন প্রাদেশিকতার পর্যায়ে এসে পড়েছিল। আধুনিককালে এই স্বাদেশিকতার ধারণায় আপেক্ষিক নবত্ব দেখা গেল। বিশ্বসাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জাতীয়তাবোধের মাধ্যমে ইতি-মধ্যে সাহিত্যস্রষ্টাদের আত্মপ্রকাশের পথ সহজ হয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি দেশই আপন বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারে আগ্রহী হতে থাকল। 'ঐতিহাসিক লক্ষ করলেন, দেশপ্রেমিক অথবা স্বদেশবিস্মৃত শিল্পীরা জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে, স্বদেশীয় পুরাণ এবং বিষয়বস্তু অবলম্বন করে এসেছেন··· নরওয়ের ইবসেন, সুইডিশ স্ট্রিণ্ডবার্গ, জর্মন গ্যেটে, রাশিয়ার টলস্টয় কি টুর্গেনিভ এরা প্রত্যেকেই তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখেও স্বাদেশিকতার গরীয়ান পোষাক পরেছেন।'[৩]

এই ধরনের দেশাত্মবোধক চিন্তাধারায় দেশের চিন্ময়ী সত্তা ও সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি একই সঙ্গে প্রকাশিত হতে লাগল। এই দেশাত্মবোধ আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতায় প্রাত্যহিক পরিবেষ্টন থেকেও উদ্‌ভাসিত। যে স্বাদেশিক-তায় চিন্ময়ী সত্তার বিকাশ সেই স্বাদেশিকতা ঈশ্বর গুপ্তের যে সংকীর্ণ স্বদেশ-চিন্তা তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। দেশজ মৃত্তিকা, দেশজ প্রাণচেতনাকে অবলম্বন করে দেশজ সৌগন্ধ্যের ভেতর এঁরা বিশ্বপ্রাণরস সঞ্চারিত করলেন। মর্ত্য প্রাণচেতনাই (বা আমর্ত্য অনুভূতি) এঁদের হাতে পড়ে প্রাণ পেল। ঠাকুর-পরিবারের সকলেই এই মর্ত্যের কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিলেন। কেবলমাত্র ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে তাঁরা তাঁদের স্বাদেশিক চিন্তাকে আবদ্ধ রাখেন নি। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে দ্বিজেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথ দেশের পরাধীনতা সম্পর্কে অনবহিত বা উদাসীন ছিলেন। পরাধীনতার বেদনা তাঁদেরও হৃদয়ে আঘাত করেছিল।[৪] তাঁরা লেখনী-মাধ্যমে সে মনোভাব প্রকাশ করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তিনটি দেশাত্মবোধক নাটক ('পুরুবিক্রম' ১৮৭৪; 'সরোজিনী' ১৮৭৫; 'স্বপ্নময়ী নাটক' ১৮৮২) লেখেন। তিনি মনে করেছিলেন বীর-রসাত্মক নাটকের ভিতর দিয়ে ভারতের অতীত গৌরব-কাহিনী কীর্তন করলে দেশবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগতে পারে। নাটকে বিভিন্ন চরিত্র দ্বারা গীত নানা গানে তৎকালীন জনসাধারণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট এবং উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। 'যায় যাক প্রাণ যাক / স্বাধীনতা বেঁচে থাক / বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব।'— এই-সব গান যেন তৎকালীন জনসাধারণের মনের কথা। রবীন্দ্রজীবন এবং তাঁর বিভিন্ন রচনা আলোচনা করলে তাঁর অসংখ্য দেশাত্মবোধক সংগীত এবং দেশজ ভাবধারায় লিখিত রচনার পরিচয় পাওয়া যাবে। এঁরা দুজন ছাড়াও ঠাকুরবাড়ির অনেকের লেখার মধ্যেই দেশাত্মবোধ প্রকাশ পেয়েছে।

স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথেরও এদিক থেকে একটা ভূমিকা আছে। তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করতে— নাটক লেখেন নি। কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর রচিত দেশাত্মবোধক গানের সংখ্যাও তত বেশি নয়। সংখ্যা হিসেবে বিচার করলে তাঁর এ জাতীয় রচনা বেশ কম।

দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনেই প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুমেলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।[৫] ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে জানা যায় 'মেলার হাঙ্গামা'র জন্যই সে সময় তাঁর 'কবিতার স্রোত' হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন জাতীয় ভাব অন্তরের সম্পদ এবং স্বজাতির প্রকৃত গৌরবের বিষয় জাগিয়ে তুলতে পারলেই সেই জাতীয় ভাবের বিকাশ ঘটবে।[৬] সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি কতিপয় আত্মীয় এবং বন্ধু -সহযোগে হিন্দুমেলা স্থাপনে অগ্রণী হন। কলকাতায় ডানকিন সাহেবের বাগানে ১২৭৩ বঙ্গাব্দে এই মেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন উদ্‌যাপিত বলে এই মেলা প্রথম তিন বৎসর 'চৈত্রমেলা' নামে অভিহিত। প্রথমেই দেখা গেছে জনচিত্তে দেশানুরাগ উজ্জীবিত করবার মানসে এই মেলা উদ্‌যাপিত হত। এই মেলায় জাতীয় সংগীত, কবিতা পাঠ, জাতীয় শিল্প প্রদর্শনী, দেশীয় ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যায়াম প্রভৃতির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকত। পরবর্তীকালে যে-সমস্ত জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেস সভা অনুষ্ঠিত হত এই চৈত্রমেলাকে তার পথিকৃৎ বা অগ্রদূত বলা যায়।

হিন্দুমেলা ও জাতীয়তা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্মৃতিচিত্রণে বলেছেন :

একরকম স্বদেশী আমাদের দেশের ফ্যাশন হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাতী গন্ধ ছিল। রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ণ বাবুই বল তাঁহাদের patriotismএর বার-আনা বিলাতি, চার-আনা দেশি। ইংরাজ যেমন patriot আমিও সেইরকম patriot হব— এই ভাবটা তাঁহাদের মনে খুব ছিল। বল দেখি, আমি তোমার মত patriot হইব কেন ? আমি আমার মত patriot হইতে না পারিলে কি হইল। নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল ; আমি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত ; কুস্তি জিমন্যাসটিক প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তার খুব ছিল ; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সে সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত।[৭]

এর পরেই দ্বিজেন্দ্রনাথ আলোচনা সূত্রে ঐ মেলার মাঠ থেকে একটি painting সরিয়ে রাখার গল্প বলেছেন। এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের মানসিক গঠনকৌশল এবং জাতীয়তাবোধের পরিচয় অংশত মেলে :

[নবগোপাল] একটি মেলা বসাইবার কথা বলিল, তাঁতি, কামার, কুমার ইত্যাদি লইয়া। আমি বলিলাম 'ও সব তো দেশের লোকের জানা আছে ; দেশি painting দেখাতে পার।' সে এক painter নিযুক্ত করিয়া ছবি আঁকাইল। মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানীয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। আমি বলিলাম—'উল্টে রাখ, উল্টে রাখ ; এই তুমি দেশি painting করাইয়াছ ? আর আমাদের ন্যাশনাল মেলায় এই ছবি রাখিয়াছ ?' ছবিখানা উল্টাইয়া রাখা হইল।[৮]

হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য কী তা গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত (মেলার দ্বিতীয় বর্ষে) সম্পাদকীয় ভাষণ থেকে জানা যায়। সেখানে সকলে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিত হন। তাঁর ভাষণ থেকে জানা যায় : 'এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য নহে, কেবলমাত্র আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য— ইহা ভারতভূমির জন্য।'[৯]

হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে মনোমোহন বসু সংক্ষেপে যে সুন্দর ভাষণ দেন তার কিয়দংশ :

হিন্দুমেলা আমাদের স্বাদেশিকতার প্রথম সূচনা—ইহাতে অধিক আহ্লাদের বিষয় এই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হওয়ানাবধি এদেশে যতকিছু উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে প্রায় রাজপুরুষগণ অথবা অপরাপর ইংরাজ মহাত্মারাই তাহার প্রথম উত্তেজক এবং প্রধান প্রবর্তক। কিন্তু এই চৈত্রমেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নামগন্ধ মাত্র নাই এবং যে সকল দ্রব্যসামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্তসম্ভূত। স্বজাতির উন্নতিসাধন, ঐক্যস্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।[১০]

'স্বজাতির উন্নতিসাধন, ঐক্যস্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা' মেলার প্রধানতম উদ্দেশ্য। কিন্তু এ ছাড়াও আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি কর্মীদের লক্ষ ছিল—তা হল আত্মনির্ভর হওয়া। 'স্বদেশের হিতসাধনের জন্য পরের সাহায্য না চাহিয়া যাহাতে আমরা আপনারা তাহা সাধন করিতে পারি' এটিই এই মেলার দ্বিতীয় প্রধান উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে।

হিন্দুমেলার চতুর্থ বর্ষের সমাবেশ উপলক্ষে সম্পাদকরূপে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রদত্ত ভাষণটি তেমন প্রচলিত নয়। এই ভাষণে মেলার উদ্দেশ্য এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধের ধারণা বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা প্রকাশে সহায়তা করবে। সেই কারণে এবং দুষ্প্রাপ্যবোধে এই দীর্ঘ বিবৃতিটি এখানে সম্পূর্ণ উৎকলিত হল :

অদ্যকার এই যে অপূর্ব সমারোহ ইহা এতদিন পরে ইহার প্রকৃত নাম ধারণ করিয়াছে, ইহা হিন্দুমেলা নামে আপনাকে লোক সমক্ষে পরিচয় দিতেছে। বিহঙ্গশাবক যেমন অল্পে অল্পে আপনার বল পূর্বক ক্রমে উচ্চতর নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইতে সাহসী হয়, সেইরূপ প্রথমে জাতীয় মেলা চৈত্রমেলা এইরূপ অস্ফুট শব্দ আমারদের শ্রবণে আনন্দ বর্ষণ করিয়াছিল, এক্ষণে 'হিন্দুমেলা' এই সুস্পষ্ট নাম দ্বারা মেলার প্রকৃত মূর্তি প্রকাশ পাইতেছে, এমনকি ইহার উদ্দেশ্য ইহার নামেতে[ই] প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং তাহা কাহারো নিকটে আর গোপন থাকিতে পারে না। জগদীশ্বর ধন্য, তিনিই কেবল আমারদের হৃদয়ের আশাকে ব্যর্থ হইতে দিতেছেন না, তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি আমারদের এই মুমূর্ষু অবস্থাতে প্রাণ দান করিয়া

দিক্ দিগন্ত উজ্জ্বল করেন তিনিই বঙ্গদেশের মুখশ্রীকে অদ্যকার এই প্রীতিপূর্ণ নবোৎসাহে উজ্জ্বলিত করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে শত শত নমস্কার।

মেলার কি উদ্দেশ্য এবং তাহা কতদূর ফলদায়ক এবং বাঞ্ছিতফল লাভে তাহা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছে, এ সকল প্রশ্নের উত্তর মুখে ব্যক্ত করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা দেখিতেছি না। এক্ষণে এরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, [এই] বিস্তীর্ণ মেলারূপ সাগরে ; নানা নদী নানা রত্ন লইয়া তাহার সেবার্থ সমাগত হইতেছে ; কেহ তাহাদিগকে আহ্বান করে নাই, তাহারা আপনাদের হৃদয়ের স্বাধীন প্রীতি দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া স্বহস্তে বিরচিত অলঙ্কার দ্বারা মেলাকে সুসজ্জিত করিতেছে। বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি, হস্তের কারিকরি, বাহুর বল, মনের উৎসাহ, ধনবানের বিত্ত, দরিদ্রের কায়িক পরিশ্রম; বন্ধুগণের সাহায্য, পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক, গায়কগণের কণ্ঠ-নিঃসৃত অমৃতধারা, সকলই এই মেলার বিশাল বক্ষে স্থান পাইয়া, পরস্পর পরস্পরের শোভাজনন হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। দেশীয়গণের ঐক্যবন্ধন এতদিন কেবল মুখে মুখে বিচরণ করিয়া কাতর হইতেছিল, এক্ষণে তাহা কার্যে স্ফূর্তি পাইতেছে। কত লোকের যে কত যত্ন কত চেষ্টা ও কত পরিশ্রম ইহাতে প্রয়োজন হইয়াছে, আমার বলা বৃথা। সভ্য মহাশয়েরা যাঁহারা অদ্য এখানে উপস্থিত আছেন, সকলেই তাহা আপনা আপনাতেই অনুভব করিয়া অবগত হইতে পারিতেছেন, বিশেষতঃ যাঁহার প্রাণপণ যত্ন ও উৎসাহে গুরুতর কার্য সকল বাল্যক্রীড়ার ন্যায় অনায়াস-সাধ্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, দেশের উন্নতি মেলার লীলাতে হাস্য করিতেছে ; (ইহা এক প্রকার অসাধ্য সাধন বলিতে হইবে)— অদ্ভুত ব্যাপার স্বচ্ছন্দে অকাতরে নির্বাহ হইতেছে, তিনি কি তাহা অবগত নহেন ? কিন্তু কেবল কার্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকাতে এবং উৎসাহে ও আনন্দে তাঁহার মন মগ্ন থাকাতে সে বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য হইতেছে না। ইঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ দিবার আমার সাধ্য নাই : নিশীথের তারকাসকল ধ্বনি উচ্চারণ না করিয়াও যেমন সংগীত করে, সেইরূপ আমাদের দেশীয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় একতান হইয়া যে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে এবং চিরকাল করিতে থাকিবে, তাহা মুখে ব্যক্ত করিলে তাহার গৌরবের লাঘব করা হয় মাত্র

আর কিছুই হয় না। সর্বশেষে আর এক ভাব সহসা মনে আসিয়া উদিত হইতেছে, কিন্তু তাহা উল্লেখ করা মেলার এই উৎসবের সময় কতদূর সঙ্গত তাহা জানি না, কিন্তু সেই প্রশান্ত মূর্তি মনে হইলে— সেই অমায়িক বিক্ষুব্ধ ধীর প্রকৃতি মনে হইলে কোন্ পাষাণ হৃদয়ে অশ্রুর সঞ্চার না হইবে। বিশেষত সেই এই স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া এই হৃদয়ের অধীরতাকে কে নিবারণ করিতে পারে? যদি আক্ষেপ মূর্তিমান হয়, তবে এ স্থান তাহাকেই সাজে; এই পর্যন্ত ক্ষান্ত হইলাম।'[১১]

হিন্দুমেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসুর বই[১২] থেকে জানতে পারা যায় যে তাঁরই লেখা *Prospectus of a society for the promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal*. এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ হয়— 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব'। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে প্রচারিত *National Paper* নামক ইংরেজি সংবাদপত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র এই প্রস্তাব দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা স্থাপনে আগ্রহী হন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের রচনায় স্বদেশী মেলা সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তার উল্লেখ বিষয়টির সম্যক ধারণার পক্ষে অনেকাংশে সহায়ক। সত্যেন্দ্রনাথ বলেন: 'আমি বোম্বাইয়ে কার্যারম্ভ করিবার কিছু পরে কালকাতায় এক "স্বদেশী মেলা" প্রবর্তিত হয়। বড়দাদা [দ্বিজেন্দ্রনাথ] নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন।'[১৩] 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায়: 'এই সময়েই [ইং ১৮৬৭] শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্‌যোগে ও শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আনুকূল্য ও উৎসাহে "হিন্দুমেলা" প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়েরা হইলেন মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক।'[১৪] রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে এ মেলার উল্লেখ করেছেন: 'আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল।… ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।… এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত।'[১৫]

এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে এই মেলার বিবরণ পাওয়া যায় এইভাবে : 'দেশানুরাগ প্রচারের উদ্দেশ্যে আমাদের বাড়ি হইতে "হিন্দুমেলা" নামে একটি মেলার সৃষ্টি হইয়াছিল··· বড়দাদা এবং আমার খুড়তত ভাই গণেন্দ্রদাদা ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন— তাঁহারা নবগোপাল মিত্রকে এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিযুক্ত করিয়া ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেন।'

এই হিন্দুমেলাই বাংলাদেশে, হয়তো বা সমগ্র ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর National Industrial Exhibition পত্তন করে। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রবর্তিত এই স্বদেশী মেলার জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ অবদান হল যে, এই মেলাকে কেন্দ্র করে অনেকেই বিভিন্ন জাতীয়-সংগীত সৃষ্টি করেন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রথম সঠিক দেশানুরাগের গান রচিত হতে থাকল। জাতীয় জীবনে এই সংগীতগুলির একটি বিশিষ্ট অবদান আছে। গণেন্দ্রনাথ এই মেলা-প্রাঙ্গণে গাইবার জন্য অনেকগুলি গান লেখেন। 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি করে' গানটি তাদের অন্যতম। সত্যেন্দ্রনাথের বিখ্যাত ভারত-সংগীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান/একতান মনপ্রাণ/গাও ভারতের যশোগান' এই মেলা উপলক্ষ্যেই প্রথম রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথও এখানেই প্রথম তাঁর 'হিন্দুমেলায় উপহার' শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করেন। হিন্দুমেলার একাদশ অধিবেশনে (১৮৭৭) রবীন্দ্রনাথ 'দিল্লিদরবার' নামক একটি কবিতাও পাঠ করেন। এঁরা ছাড়াও শিবনাথ শাস্ত্রী, 'উদাসিনী'-র কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-৯৮) প্রমুখ অনেকেই এই মেলার জন্য জাতীয় ভাবোদ্দীপক বহু কবিতা রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেও নিম্নলিখিত জাতীয়-সংগীতটি এই মেলার জন্যই রচনা করেন :

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
দিবারাত্র ঝরিছে লোচন-বারি ॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায়রে সহিতে না পারি ॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবেই এই মেলায় অংশ গ্রহণ করেন। অল্পবয়সী যে-সব তরুণ দূরে থেকে এই জাতীয় কাজ করতেন, তিনি তাঁদেরও উৎসাহ

দিতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রসঙ্গত অমৃতলাল বসুর (১৮৫৩-১৯২৯) স্মৃতিচিত্রণের নিম্নলিখিত অংশটুকু প্রণিধানযোগ্য: 'আমরা যখন জিমন্যাসটিক করি, তখন আমাদের ভলন্টিয়র হইবার খুব সখ হইয়াছিল।... আমরা পঞ্চাশ ষাটজন বাঙ্গালী যুবক সেনাপতিকে আবেদন করিতে অগ্রসর হইলাম।... রাজেন্দ্রলাল মল্লিক, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের মুরুব্বী হইলেন।'[১৬]

নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে মিলিতভাবে স্বদেশী মেলা পরিচালনাই দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনে সক্রিয় রাজনীতি। এর পরে তিনি প্রকাশ্যে বা হাতে-কলমে কাজ করতে আর এগিয়ে আসেন নি। কিন্তু তাঁর রচনার বিক্ষিপ্ত অংশ, তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং চিঠিপত্রে তাঁর রাজনীতি-সচেতন মনের প্রকাশ ঘটেছে।

'যে স্বদেশভক্তির অর্থ বিদেশের প্রতি বিষদৃষ্টি তাঁহার স্বদেশভক্তি সে শ্রেণীর ছিল না; আবার যে বিদেশভক্তির অর্থ স্বদেশের প্রতি বিষদৃষ্টি তাঁহার বিদেশভক্তিও সে শ্রেণীর ছিল না।'[১৭]

রামমোহন রায়ের মানস বিশ্লেষণে দ্বিজেন্দ্রনাথ এই যে লক্ষ্যে উপনীত হয়েছেন তা বক্তা সম্বন্ধেও সঠিকভাবে প্রযোজ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বদেশী ছিলেন। অতিরিক্ত রকমের খাঁটি দেশী ক্রিয়াকর্মাদির ভক্ত ছিলেন— তবুও বিদেশের যেটুকু ভালো দেশের সর্বায়ত উন্নতিকল্পে সেই শ্রেষ্ঠত্বটুকু গ্রহণ করতে তিনি সকলকে স্ব-নির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন।

একবার 'সাধনা'য় কোনো প্রশ্নের উত্তরে[১৮] দ্বিজেন্দ্রনাথ যে উত্তর দেন তা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে কোনো রোগই কেবলমাত্র মুখের কথায় সারে না, সেজন্য চিকিৎসা প্রয়োজন। কিন্তু অসুখে আক্রান্ত হবার আগেই যদি সচেতন হওয়া যায়, সেই 'সংক্রামতা নিবারণ'-এর জন্য বা যাঁরা এখনো সামাজিক রোগাক্রান্ত হন নি তাঁদের 'চক্ষু ফুটাইয়া' দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

তিনি সেখানে লিখেছেন:

আমার চিকিৎসা প্রণালী আর কিছু না— অনুভয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া জ্ঞানচর্চা করিবে এবং উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে অবতীর্ণ হইয়া দুয়ের ভাল যাহা তাহা গ্রহণ করিবে এবং মন্দ যাহা তাহা পরিত্যাগ করিবে।... ইহার অর্থ এই নয় যে, এর ভাল গুণ জোড়াতাড়া দিয়া একটা অদ্ভুত সঙ গড়িয়া তুলিবে। কোন পক্ষেরই আমি কৃত্রিম অনুকরণ করিতে বলি না।...

আমরাই যে কেবল এইরূপ করিয়া (অর্থাৎ নানা দিকের ভাল আত্মসাৎ এবং মন্দ পরিবর্জন করিয়া) উন্নতি লাভ করিতেছি তাহা নহে— সকল জাতিই এইরূপ করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে··· জনসমাজের উন্নতি শুধু দেশের উপরেও নির্ভর করে না— কিন্তু দেশ এবং কাল দুয়ের সমবেত কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে।[১৯]

দর্শন চর্চায় নিমগ্ন থাকাকালীনও দ্বিজেন্দ্রনাথ দেশবাসীর কথা ভেবেছেন। তাঁর 'প্রবন্ধমালা'-র দ্বিতীয় প্রবন্ধ "কাল্পনিক ও বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোক"-এ তিনি স্বদেশবাসীর সমস্যা তুলে ধরে, তার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। 'মুখ্য রূপে স্বজাতীয় ভাব এবং গৌণরূপে বিজাতীয় ভাব অনুশীলন করিলেই বাঙ্গালীদের মঙ্গল' হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।[২০] দেশকাল পাত্র নির্বিচারে অনুকরণ; এবং কাজ অপেক্ষা নামের প্রতি তীব্র আকর্ষণ আমাদের চরিত্রের অত্যন্ত দূষণীয় দিক বলে তিনি মনে করতেন। অনুকরণ-প্রিয়তা জীবনের সমস্ত কোণ থেকেই তিনি সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য বলে মনে করতেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন পৃথিবীর অন্য সকল জাতিই আপন আপন স্বাতন্ত্র্য, আপন স্বজাতিত্ব বজায় রেখে অন্যের সঙ্গে মেশে। কিন্তু ভারতবাসীগণ আপাত সুবিধার অনুরোধে অনেক সময়েই স্বজাতিত্বের অবমাননা করে; এটি তাদের চরিত্রের প্রধানতম দোষ। তিনি দেশকে ভালোবেসেছিলেন বলেই 'হিন্দু সমাজের বিকারের পূর্বলক্ষণ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে ক্রন্দন করেন।' বাঙালিরা হিন্দুত্ব পরিত্যাগ করছে; তাদের সেই শূন্যস্থান (Nature abhores a vacuum) ইংরেজিয়ানায় ভরে যায়। আমরা কিছুতেই আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে অন্য জাতির সঙ্গে মিশতে পারছি না। বাঙালীর অনুকরণ-প্রিয়তা দেখেই তিনি লিখতে বাধ্য হলেন "ইঙ্গবঙ্গের বিলাতযাত্রা।" এই ব্যঙ্গ কবিতার ছদ্ম আবরণের মধ্য দিয়ে তাঁর গভীর মনোবেদনা প্রকাশ পেয়েছে:

ইঙ্গবঙ্গের বিলাতযাত্রা

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে,
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন বশে কিচ্ছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি পিরহনে মান রয় না।

পিতা মাতা ভ্রাতা নবশিশু অনাথা ছট করি,
বিরাজে জাহাজে বসি মলিন কুর্তা বুট পরি,
সিগারে উদ্গারে মুহুর মুহু ধূমলহরী
সুখ স্বপ্নে আপ্নে মুলুকপতি মনে হরি হরি ···
বিহারে নিহারে বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি,
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।
ফিমেলে ফিমেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে,
কি তাহে, উৎসাহ মগন তিনি সাহেব গিরিতে।
ফিরে এসে দেশে গল কলর বেশে হটহটে,
গৃহে ঢোকে রোখে উলগতনু দেখে বড় চটে,
মহা আরী সাড়ী নিরখি চুলদাঁড়ী সব ছিঁড়ে
দুটি লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে।[২১]

তিনি কিন্তু জানতেন: 'জাতীয় ভাব অলীক বাক্যাড়ম্বরের সামগ্রী নহে— কঠোর সাধনার সামগ্রীও নহে··· স্বজাতির যাহা প্রকৃত গৌরবের বিষয় তাহা জাগাইয়া তুলিলেই জাতীয় ভাব আপনা আপনি জাগিয়া উঠিবে।'[২২] জাতীয় ভাব কোনোরকম সাধনার অপেক্ষা রাখে না। সভ্যজাতি মাত্রেই সভ্যতা, জ্ঞান এবং ধর্মের সাধনা করেন। স্বজাতিত্ব তাঁদের জন্মসূত্রে, মানবত্বের অধিকারে প্রাপ্য অযত্নসুলভ ঘরোয়া সামগ্রী। জাতীয়ভাব মানুষ কষ্ট ক'রে অর্জন করে না ঠিকই কিন্তু এই ভাব তাকে অত্যন্ত যত্নসহকারে রক্ষা করতে হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ আত্মবিশ্লেষণ করে বলেছেন: 'আমি চিরকাল স্বদেশী। বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ ভাব-ভাষা আমার দুচক্ষের বালাই। স্ত্রী স্বাধীনতা আমি অপছন্দ করি না কিন্তু আমার বরাবর ভয় হয়, পাছে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া যায়। আমি গোড়া থেকেই সেই স্বদেশী culture ধরিয়া বসিয়া আছি··· '[২৩] কিন্তু এরকম প্রগাঢ় স্বদেশী হলেও দ্বিজেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান নি। তিনি অনুকরণপ্রিয়তা অপছন্দ করলেও অন্যের কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য নয় এমন বিশ্বাস করতেন না। তিনি কেবলমাত্র বলতেন যে স্বাধীনচিন্তা দ্বারা নিজে বুঝে নিতে হবে কতটুকু আমাদের গ্রহণযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য চিন্তাবিদদের মতো তিনিও

অনুকরণপ্রিয়তার নিন্দে করেছেন ঠিকই কিন্তু তিনি তাঁদের মতো রক্ষণশীল নন। জ্ঞান, কর্তব্যনিষ্ঠা, কর্মনৈপুণ্য, তেজস্বিতা— এই-সকল মানবোচিত গুণ কোনো জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের একচেটিয়া নয়। ঢঙ বা সঙের জন্য নয়; জ্ঞানোপার্জনের জন্য ইংরেজি শিখতে হবে। 'কিন্তু জ্ঞান উপার্জনের জন্য ইংরাজী শিক্ষা করা স্বতন্ত্র, আর বাবাকে পাপা বলিবার জন্য অথবা দারাকে ডিয়ার বলিবার জন্য ইংরাজী শিক্ষা স্বতন্ত্র।'[২৪]

তিনি বারবার অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন, বাইরে থেকে ভাবের ঘরে পুঁজি সংগ্রহ করতে হলে তার কিছু অংশ আগে থেকেই ভিতরে থাকা প্রয়োজন। বিদেশী ভাব, রীতিনীতি উপার্জন করতে হলে দেশজ আচার বা রীতিনীতিই তার বনিয়াদ। তিনি অন্ধ দেশ-ভক্ত নন। আধুনিক তাঁর মন। তাই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নির্যাসটুকু নিয়ে প্রয়োজনমত বর্জন এবং গ্রহণ করে নতুন আদর্শ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছেন।

তাঁর স্বদেশী রীতিনীতির প্রতি অত্যধিক আসক্তির জন্য অনেকে অনেক সময় তাঁকে ভুল বুঝেছেন। এমন-কি, তাঁর সহোদরাও তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন :

> বড়দা ছিলেন রক্ষণ নীতিশীল, মেজদা ছিলেন পরিবর্তনশীল অর্থাৎ উন্নতি-পন্থী। এই দুই বিষয় লইয়া দুইজনের মধ্যে রীতিমত তর্কাতর্কি চলিত। আর আমরা শ্রোতৃবর্গ সকৌতুকে তাহা শুনিয়া নিজ নিজ মত রচনা করিতাম। তবে অবশেষে সত্যের নিকট দ্বিজকে পরাস্ত মানিতে হইয়াছিল। কালচক্রের সহায়তায় ক্রমশ বড়দাদাকে অনেকটাই আপনার দিকে টানিয়া লইয়াছিলেন।[২৫]

দেশীয় ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে থাকা, প্রাচীন রীতিনীতি, সংস্কারাদি— একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত এবং বিচার না করে তাকে পরিত্যাগ করতে অনীহা— ইত্যাদি কারণে অনেক সময়েই তাঁকে অনুদার রক্ষণশীল বলে মনে হয়েছে। কিন্তু যে মন প্রয়োজনমত, 'স্বাধীন চিন্তা প্রসূত ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে ইংরাজী বিদ্যার বিবাহ' দিতে ইচ্ছুক এবং যে মন বিদেশের সমস্ত ভালো-র সার পদার্থ বিচারের মাধ্যমে জীবন, ধর্ম এবং শিক্ষার সর্বস্তরে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, সেই মনের অধিকারীকে আর যাই হোক নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ রক্ষণশীল বলা ঠিক হবে না।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে অনুজ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নিজের যে পার্থক্যটি ধরা পড়েছে তা নিম্নোদ্ধৃত চিঠিটি থেকে জানা যায় :

ভাই সতু,

তুমি একজন হাড়পাকা co-operator ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত। আমি একজন হাড়পাকা non-co-operator dittoদিগের সহিত। এ বলে আমায় ভাখ্, ও বলে আমায় ভাখ্। এ অবস্থায় তকরা তকরি নিষ্ফল। অ্যাক্ কাজ করা যাক্— জ্যোতিভায়া অনুভয় পক্ষ, তাঁহাকে মধ্যস্থ মানা যাক্। জ্যোতি বলিবে, সন্দেহ নাই, যে বড়দাদা non-co-operator নিয়ে দিব্য আনন্দে আছেন; সে আনন্দে cold water throw করা উচিত হয় না, মেজদাদা co-operation নিয়ে দিব্য আনন্দে আছেন সে আনন্দে cold water throw করাও উচিত হয় না। তাছাড়া— দুই দাদার দুই আনন্দের এক খানা ছবি তুলিতে আমার বড় সাধ গিয়াছে— আমার সেই সাধের মনোরথটির অচরিতার্থ অবস্থায় তাহার কবি মস্তকে বাদ বিতণ্ডা গদাঘাত করা দুই দাদারই অনুচিত কার্য। আমার মূলমন্ত্র তাই Silence is gold.

তোমার স্নেহে বাঁধা

বড়দাদা।[২৬]

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত একটি চিঠিতে পুনরায় উপরোক্ত স্বীকৃতির উপর তাঁকে জোর দিতে দেখা যাচ্ছে : 'আমি সতুকে যাহা লিখিয়াছি তাহা real truth। বাড়িশুদ্ধ সবাই জানে যে, আমি বাল্যাবধি হাড়পাকা non-cooperator।'[২৭] তিনি কোনো কোন চিঠিতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সমালোচনা করেছেন : 'British governmentকে এখনো তুমি চেন নাই। তৎ সম্বন্ধে যদি আমার মতামত জিজ্ঞেস কর তবে All that glitters is not gold।'

বিদেশী শাসনের অবসান ঘটুক, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করুক— ভারত-প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রনাথের এটি সারা জীবনের কামনা হলেও, ইংরেজ চলে গেলে আমাদের দেশের যে কী অবস্থা হবে সে সম্বন্ধে তিনি কতদূর সজাগ ছিলেন এবং 'জনসাধারণের সরকার' বলতে তাঁর কী ধারণা ছিল তা সত্যেন্দ্র-নাথকে লিখিত একটি চিঠি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। চিঠির কিয়দংশ উৎকলিত হল :

…Politicsএ তোমার আমি বড়দাদা আর সেইজন্য তোমার নীচে পড়া দূরে থাকুক—তোমার চেয়ে আমি আরো এককাটি সরেস। আমার বিশ্বাস এই যে, British Governmentএর pressure বর্তমান অবস্থায় আমাদের মাথার উপর থেকে [যদি] অপনীত হয়, তবে আমাদের কী যে শোচনীয় দশা হইবে তাহা এক মুখে বলা যায় না। এখন এই ঘোরতর দুরবস্থার মধ্যেও যখন আমাদের চক্ষু ফুটিতেছে না— তখন British Government এর pressure অন্তর্ধান করিলে—আমাদের দিশী Governorএরা, অত্যাচারী জমিদারেরা, Priest-ridden উচ্চবংশীয়েরা—এবং মারোয়ারি প্রভৃতি স্বার্থপর ধনাঢ্যেরা— যে হাতে মাথা কাটিবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নাই। British Government আমাদের পল্লীগ্রামস্থ জমিদারদের Government অপেক্ষা শতসহস্রগুণে ভাল। এ কথা খুব ঠিক যে, তুমি যেমন লিখেছ, Governor & the governedএর মধ্যে gap বাড়ানো অনর্থের মূল— gap কমানো শ্রেয়ের মূল। শেষোক্ত missionএ রবি কতকটা কৃতকার্য্য হয়েছেন— এবং আশানুরূপ কৃতকার্য্য হোন্ ইহা আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

কিন্তু উক্ত চিঠিতেই আবার তাঁকে British Governmentএর সমালোচনা করতেও দেখা যায় :

British Government কাজ একটি করেন অতিশয় গর্হিত— সেটা এই যে, আমাদের দেশের যে কোনো লোক দেশের হিতসাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন (যেমন তিলক প্রভৃতি)— অমি Government তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হন— তাই আমি বর্তমান British Governmentএর মর্ম্মান্তিক বিরোধী পক্ষ।[২৮]

অবশ্য 'British Government' এর উক্ত নীতির তিনি 'মর্ম্মান্তিক বিরোধী' হলেও তাঁর দেশপ্রীতি হিংসাপ্রসূত নয়। অহিংসা-অসহযোগের মাধুর্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, রাজনীতিতে তার সার্থকতা তিনি কখনোই অস্বীকার করেন নি।

তিনি গান্ধীজির অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। গান্ধীজিও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। ১৯১৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে যান, তখন তিনি যানবাহন প্রত্যাখ্যান করে পায়ে হেঁটে বোলপুর স্টেশন

থেকে শান্তিনিকেতন-আশ্রমে আসেন এবং প্রবেশপথে সর্বপ্রথম দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ কথা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায়।[২৯] এই আগমনের ফলে দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন প্রভৃতির সহযোগিতায় আশ্রমের সঙ্গে গান্ধীজির যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় তা চিরদিন অম্লান ছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ গান্ধীজির ভিতরেই তাঁর কল্পনার রাজনীতিবিদের প্রকাশ দেখেছিলেন এবং গান্ধিজীকেই দেখবার বা জানবার পরেই তাঁর মনে পুনরায় আশার সঞ্চার হয়। 'এখন একটু আশা হইয়াছে' কারণ, 'আমাদের দেশের মধ্যে খাঁটি patriot-এর আবির্ভাব হইয়াছে— মহাত্মা গান্ধী। ইনি আমাকে আমার মত patriot হইতে বলেন, তোমার মত, বিদেশীর মত নয়...[৩০]

১৯২৫ খৃস্টাব্দে গান্ধীজি তৃতীয়বার শান্তিনিকেতনে আসেন। এই সময় তিনি, যে তিনদিন সেখানে ছিলেন প্রতিদিনই প্রাতে ও সন্ধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথের পদপ্রান্তে বসে 'বড়দাদার ভাবব্যাকুল আশীর্বাণী' অন্তরে গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের এই শেষ সাক্ষাৎ। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ যে জয়যুক্ত হবেই, দ্বিজেন্দ্রনাথ বারবার এ কথা বলতেন : 'ঈশ্বরের প্রতি আমার যে বিশ্বাস তারপরেই তোমার পরে আমার আস্থা— তোমার বাণী ও কর্মে আমার নিরানন্দের অবসান হয়েছে, শেষযাত্রার জন্য আমি এখন সানন্দে প্রস্তুত।'[৩১] গান্ধীজির প্রতি, তাঁর চরিত্রমাহাত্ম্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।[৩২]

দ্বিজেন্দ্রনাথ গান্ধী-প্রবর্তিত পথে প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন, বয়সবৃদ্ধি সত্ত্বেও শেষসময় পর্যন্ত মহাত্মাজির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। সেই যোগাযোগের মধ্যকার সেতু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী-অনুরাগী দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ। দ্বিজেন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। তিনি সর্বান্তঃকরণে চরকায় বিশ্বাস করতেন। বৃদ্ধ বয়সে খদ্দর ধারণ করেছিলেন। প্রয়োজন মনে করলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি গান্ধীজিকে সমর্থন করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি চিঠি :

এ কথা দেশশুদ্ধ লোকে সবাই জানে যে, মহাত্মা গান্ধী কামক্রোধ ভয়-লোভ মদমাৎসর্যের কর্দম হইতে অনেক উচ্চভূমিতে অবস্থান করেন।

বিশেষত গান্ধী রণোন্মত্ততার প্রতি নিতান্তই বীতরাগ এবং non-violenceএর একান্তই সেবক ; তিনি নেশার ঝোঁকে কোন কাজে প্রবৃত্ত হন না। সর্বানুমোদিত কাজেও না। তাই আমার মনে হয় যে, গান্ধিজীর ন্যায় অমন একজন মহাত্মার মোহমুক্ত বিশুদ্ধবুদ্ধির অনুমোদিত শুভানুষ্ঠানের পদে পদে ছল ধরা অপেক্ষা তাঁহার সাধুজনোচিত সৎকার্যে সর্বান্তঃকরণের সহিত যোগ দেওয়াই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। আমার এটা ধ্রুববিশ্বাস যে, গান্ধীর ন্যায় সাঁচা সোনা (Sterling Gold)— এ ঘোর কলিতে মেলা ভার।

তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা যে আমার পক্ষে কিরূপ অপ্রীতিকর তোমাকে তাহা বলা বাহুল্য। অতএব উপরিউক্ত গোটা দুই স্মর্তব্য কথা তোমার সুবিবেচনায় সমর্পণ করিয়াই এ যাত্রা ক্ষান্ত হইলাম। তোমার উপরে আমাদের দেশের মঙ্গলামঙ্গল পুরামাত্রা নির্ভর করিতেছে। এইজন্যে বলি যে, তোমার উচিত আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার আগাগোড়া ভালমতে বিবেচনা করিয়া দেখিয়া দেশের জনসাধারণকে প্রকৃত হিত পরামর্শ প্রদান করা, আর, সে কার্যে তুমি যেমন পারদর্শী এমন আর কেহই না। আমি সর্বান্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাদের দেশের গাত্র হইতে মোহনিদ্রা ঝাড়িয়া ফেলিবার এই মুখ্য সময়টিতে ঈশ্বর তোমাকে এবং আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।[৩৩]

দ্বিজেন্দ্র-গান্ধী সম্পর্কিত বিবরণ পৌত্র সৌম্যেন্দ্রনাথের রচনায় পাওয়া যায়: 'দাদামশায় ছিলেন গান্ধিজীর পরমভক্ত। প্রায়ই বলতেন, এতদিন বাদে একজন লোক এলেন যিনি আমাদের দেশকে বাঁচাবেন। বৃদ্ধ বয়সে চরকা কাটতে সুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীবাদের সব কিছু মেনে নিতে পারেন নি। কোনো কোনো বিষয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন জেনে দাদামহাশয় ভারী ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। বলতেন— রবি ঠিক বুঝতে পারছেন না, তিনি ধরতে পারছেন না— গান্ধীর উদ্দেশ্য।'[৩৪]

দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর এমন একটি ব্যাকুলতা ছিল যে দেশের স্বাধীনতার কথা উপস্থিত হলে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি পরিত্যাগ করে হৃদয়ের উন্মাদনার দ্বারাই চালিত হতেন।

তাঁর প্রথম বয়সের অনেক রচনাতেই তখনকার ইঙ্গবঙ্গদের প্রতি তীব্র

শ্লেষাত্মক আক্রমণ আছে। কিন্তু শেষ বয়সে তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য এতই বেড়ে গিয়েছিল যে বিলাতী কিছুই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে একদিন কি কারণে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'শাসক প্রভু জাতির উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। সেই অসন্তোষের কালে এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁকে প্রণাম করে ইংরেজীতে নিত্যকার প্রশ্ন করলেন, 'বড়দাদা কেমন আছেন?' বড়দাদা এ প্রশ্নের উত্তরে যে কথা বললেন তাতে 'বৃদ্ধ স্বদেশ-ভক্তের' এই মতই প্রকাশিত হল যে, প্রভুজাতির সব লোক ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত না হলে কোনো সুখ শান্তি নাই।[৩৫]

ঠিক অনুরূপ আর-একটি ঘটনায় তাঁর এইজাতীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। বিধুশেখর শাস্ত্রী নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ করেছেন :

> কয়েকবৎসর পূর্বে যখন বাংলার তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে আমাদের যুবকদের পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষা কিংবা পাশ্চাত্য দর্শনের পূর্বে ভারতীয় দর্শন অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন, অথচ আমরা তাঁহার প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাহা পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মনে হইয়াছিল যে আমাদের লেখায় ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ হয় নি। এই কারণে তিনি হঠাৎ একদিন প্রাতে তাঁহার রিকশাটি আরোহণ করিয়া আমাদের তখনকার শান্তিনিকেতনের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ উত্তেজনার সহিত যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝিলাম তাঁহার দেশাভিমানে ও ভারতীয় দর্শনের প্রতি ভক্তিতে আঘাত লাগিয়াছে। ভারতীয় দর্শনের প্রতি যে আমাদের অশ্রদ্ধা নাই তাহা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য যাহা করা দরকার তাহা করিয়াছিলাম এবং তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।[৩৬]

দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর এমন একটি ব্যাকুলতা ছিল যে যখন তিনি শুনলেন যে মহাত্মা গান্ধি এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আনবেন তখন তিনি সর্বান্তঃকরণে সেই আন্দোলনের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। শেষ বয়সে তিনি রাজনীতিতে কোনোরকম অংশ গ্রহণ করেন নি। তখন তাঁর ভাব-জগতে বাস। 'এক বৎসরের মধ্যেই ভারতের স্বাধীনতা' 'তাঁকে এমনি পেয়ে বসেছিল' যে এই কথায় পূর্ণ সায় না দেওয়াতে শেষ জীবনে তিনি ক্ষিতিমোহন সেন, অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায় প্রভৃতি ব্যক্তিদের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তাঁরা

মহাত্মাজীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করলেও ডিসেম্বরের মধ্যেই স্বরাজ মেনে না নেওয়াটাই তাঁদের অপরাধ। এই প্রসঙ্গেই ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন: 'কেহ কেহ চরকা না কাটিয়াও চরকার প্রচণ্ড সমর্থন করিতেন আমরা তাহা পারিতাম না, তাহাও ছিল আমাদের অপরাধ।'[৩৭]

জীবনের প্রত্যুষপর্বে তাঁর ভিতর যে স্বদেশপ্রীতির বীজ উপ্ত হয়েছিল সেই স্বদেশপ্রীতি পরবর্তী কালে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। এই ব্যাকুল স্বদেশভক্তি তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বহন করেন।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ যা বলেন তার ভিতর দিয়ে আমরা তাঁর patriot সম্বন্ধে ধারণা জানতে পারব: 'patriot শব্দের যাঁহারা অনুবাদ করেন দেশহিতৈষী, তাঁহারা নিতান্তই দায়ে পড়িয়া তাহা করেন। patriot শব্দের ঠিক প্রতিশব্দ আমাদের দেশীয় ভাষাতে নেই, কস্মিনকালেও ছিল না।··· দেশের হিতসাধনকারী philanthropist স্বতন্ত্র, আর কায়মনো-বাক্যে দেশের স্বকীয় মাহাত্ম্যের সমর্থনকারী patriot স্বতন্ত্র। যিনি স্বদেশের স্বাধীনতা, গৌরব, তেজোবীর্য এবং মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করেন তিনিই patriot।'[৩৮]

দ্বিজেন্দ্রনাথের দেশভক্তি স্বোপলব্ধি বা বিশ্বোপলব্ধিকে বর্জন করে নি; তাকে অঙ্গীকার করেই একটি রূপ নিয়েছে। স্বদেশ-আত্মার সন্ধান করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ কোথাও ঈশ্বর গুপ্তের সংকীর্ণ দেশপ্রীতির আশ্রয় নেন নি। পক্ষান্তরে জাতীয় জীবনের প্রেক্ষণীপটে একটি আত্মস্থ ও আধুনিক দেশৈষণা তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এই এষণার প্রবর্তনায় তিনি দেশের ইতিহাস-পুরাণের মূল অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর কবিস্বভাবের মধ্যবর্তিতায় এই অন্বেষণ একদিকে যেমন সৌন্দর্যময় অন্য দিকে তেমন নব্য দেশজ সাংস্কৃতিক মানচিত্র ও মানসচিত্রণে পরিণত হয়েছে।

৪

সম্পাদক

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন সাময়িক পত্রের সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধসমূহ তৎকালীন পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। রচনাকার ছাড়াও এর কয়েকটির সঙ্গে তিনি সম্পাদকরূপেও জড়িত ছিলেন।

কালানুক্রমিক বিচারে এদের মধ্যে সবপ্রথম 'ভারতী'-র উল্লেখ করতে হয়। ১২৮৪ সালের শ্রাবণমাসে (ইং ১৮৭৭) 'ভারতী' পত্রিকার জন্ম। দ্বিজেন্দ্রনাথই তার প্রথম সম্পাদক। এ প্রসঙ্গে তিনি স্মৃতিচিত্রণে বলেছেন: 'জ্যোতির ঝোঁক হইল, একখানা নূতন মাসিক পত্র বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্তু ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"-কে ভাল করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায় "ভারতী" প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শন"-এর মত একখানি কাগজ করিতে হইবে এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না।'[১]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন: 'বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা 'ভারতী' পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন।'[২] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতেও এই সূত্রে নিম্নে প্রদত্ত বিবৃতি পাওয়া যায়:

> একদিন জ্যোতিবাবু তাঁহার তেতলার ঘরে বসিয়া, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, সাহিত্য বিষয়ক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে হইবে। যেমন কথা অমনি কাজ। তৎক্ষণাৎ জ্যোতিবাবু দ্বিজেন্দ্রবাবুকে এই সংকল্প জানাইলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবুও এ প্রস্তাবের অনুকূল মত দিলেন।[৩]

তখন ঐ নবাগত পত্রিকাটির নামকরণে সমস্যা দেখা দিল। সমস্যা সমাধানে সকলেই সচেষ্ট হলেন; এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ এর নাম দিতে চাইলেন 'সুপ্রভাত'। কিন্তু ঐ সুপ্রভাত নামের ভিতর একটা স্পর্ধার ভাব আছে এ কথা মনে হওয়ায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য কারোরই নামটি পছন্দ হল না।

কেননা তাঁদের প্রচেষ্টাতেই, এই প্রথম, বাংলা সাহিত্যের সুদিন এসেছে এ কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করা ঠিক হবে না। 'সুপ্রভাত' নামটি গৃহীত না হওয়ায় দ্বিজেন্দ্রনাথই পত্রিকার নতুন নামকরণ করলেন— 'ভারতী'। এ নাম সকলের পছন্দ হল।

'ভারতী'র প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর নিজের মতে তিনি কেবলমাত্র 'কাগজের নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার'[৪] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে পড়ল। সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম না থাকলেও '"ভারতী" যে প্রকৃতপক্ষে জ্যোতিবাবুরই মানসকন্যা' এই মর্মে শরৎকুমারী চৌধুরানীও সাক্ষ্য দিয়েছেন।[৫]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উদ্যোক্তা এবং উৎসাহী এবং তাঁর আগ্রহ এত বেশি যে তিনি প্রতি রবিবার 'ভারতীর ভাণ্ডার' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কাছে যেতেন এবং পরে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে নিয়ে 'বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটীতে যাইতেন, এবং সেখান হইতে জোড়াসাঁকো ফিরিয়া যাইতেন।'[৬] প্রকৃতপক্ষে 'ভারতী' পরিবারস্থ সকলেরই উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। 'ভারতীর ভিটা' প্রবন্ধ থেকে আরো জানতে পারি:

> কোনো কোনো দিন বৈকালে আমরা [শরৎকুমারী চৌধুরানীরা] ৺জানকী বাবুর [স্বর্ণকুমারীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল] রামবাগানস্থ বাড়িতে যাইতাম সেখানে ন বৌঠাকুরাণী, নতুন বৌ, জ্যোতিবাবু, রবিবাবু প্রভৃতিও আসিতেন··· সকলে মিলিত হইলে 'ভারতী'-র জন্য রচিত নূতন প্রবন্ধাদি পাঠ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের গান হইত, পরে আহারাদি সমাপনান্তে বাড়ি ফিরিতে রাত্রি ১০/১১টা বাজিয়া যাইত।[৭]

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন অত্যন্ত কম[৮] হলেও তিনি 'ভারতী'-র সম্পাদক চক্রের বাইরে ছিলেন না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এঁরা সকলেই সম্পাদকচক্রের ভিতরে ছিলেন। পরিবারের বালক, যুবা এবং মহিলা— সকলেরই সমান আগ্রহ 'ভারতী'-র প্রকাশনে। এঁদের সকলের আগ্রহ এবং রচনার সাহায্যেই দ্বিজেন্দ্রনাথ এর পুষ্টি সাধন করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখের মতো উচ্ছ্বাস প্রাবল্য না থাকলেও গোড়া থেকেই দ্বিজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটির সঙ্গে জড়িত। 'কি রকম পরিবেষ্টনের মধ্যে' 'ভারতী'-র জন্ম হয় সে সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন:

আমি তেতালায় যে ঘরটিতে বসতুম, সেখানে একটি গোল টেবিল, তার চারিধারে খানকতক চৌকি। আর দেয়ালের গায়ে একটা পিয়ানো ছিল। রবি আমার নিত্যসঙ্গী (বালক কবি তখন জগৎ কবি হন নি), আর এক কবি, আমার বাল্যবন্ধু অক্ষয়, মধ্যে মধ্যে এসে জুটতেন। আমরা তিনজনে যখন একত্র এই টেবিলের চারিধারে বসতুম, কত গান গল্প হত, কত কবিতা পাঠ হত, কত গান বাজনা হত, গান রচনা হত, তার ঠিকানা নেই। পাখীর গানে যেমন ছাদটা মুখরিত হত, এই দুই কবি বিহঙ্গের গানে ও কবিতা পাঠে বৈঠকখানাটাও তেমনি প্রতিধ্বনিত হত।

একদিন প্রাতে এই টেবিলে বসে আমরা সাহিত্যালোচনা করচি— কি শুভক্ষণে আমার হঠাৎ মনে হল, এই দুই কবি বিহঙ্গ কেবল আকাশে আকাশেই উড়ে বেড়াচ্ছে, ওদের মধুর গান কেবল আকাশেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। লোকালয়ের কোন কুঞ্জকুটীরে ওরা যদি আশ্রয় পায় কিংবা একটী নীড় বাঁধতে পারে তাহলে কতলোকে ওদের স্বর-সুধা পানে কৃতার্থ হয়! এই কথা মনে হবামাত্র, দোতলায় নেমে এলুম।

দোতলার দক্ষিণ বারান্দায় আর একটি প্রবীণ বিহঙ্গরাজের (দ্বিজেন্দ্রনাথের) আসন ছিল।··· আমার প্রস্তাব শোনবামাত্রই তিনি রাজি হলেন, আর তখনি দেবী ভারতীকে আবাহন করে তাঁরই পুণ্যকুঞ্জেও নবীন কবি বিহঙ্গদের জন্য একটি নীড় বেঁধে দিলেন।[৯]

অতএব দেখা যাচ্ছে 'ভারতী'-র জন্ম-লগ্ন থেকেই দ্বিজেন্দ্রনাথ এই পত্রিকাটির সঙ্গে জড়িত। পত্রিকার নামকরণ ছাড়াও পত্রিকার উপরে কী মলাট হবে প্রথমে তাও তিনিই ঠিক করেন। 'মলাটের উপর একটি ছবির design আমি দিয়াছিলাম। কিন্তু সে ছবি ওরা দিতে পারিল না।'[১০] পরে অনেক গবেষণার পর আর্ট স্টুডিয়োর দেবী সরস্বতীর ছবির অনুকরণে 'ভারতী'-র মলাট প্রস্তুত হয়।

'ভারতী'-র ভূমিকার শেষাংশে সম্পাদক লিখলেন: 'আমরা ভাই বন্ধু একত্র হইয়া ভারতীকে আবাহন পূর্বক এই ত প্রতিষ্ঠা করিলাম। এক্ষণে ভারতীর বরপুত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার যাহাতে রীতিমত সেবা চলে, তাহার ব্যবস্থা করুন; ভারতীর আশীর্বাদে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।'[১১]

'ভারতী'-র প্রথম সংখ্যাতে সম্পাদক যে ভূমিকাটি লেখেন তা পাঠে

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যায়। সেই উদ্দেশ্যেই ভূমিকাটির অংশবিশেষ এখানে তুলে দেওয়া হল :

'ভারতী'র উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাঁহার নামেই সপ্রকাশ। ভারতীর অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণী স্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জন এবং বিদ্যাস্ফূর্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া সেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাই নতমস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহদৃষ্টিতে দেখিব। পক্ষপাত-মানসে যে আমরা এরূপ করিব, তাহা নহে। যে সকল বস্তু উপার্জন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, বিজ্ঞান তাহার মধ্যে একটি ; কিন্তু ভাব তাহার পণ্য হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভাবের উদয় সম্ভবে, ভাবের উদ্রেক সম্ভবে, কিন্তু উপার্জন সম্ভবে না।··· স্বদেশ হইতে যে ভাব আপনি উদয় হয়, অযাচিতভাবে উদয় হয়, তাহাই ঠিক ; যে ভাব অন্যত্র হইতে যাচিয়া আনা হয় তাহা কৃত্রিম, তাহা কোন কাজেরই নহে।

···এই সকল কারণে ভাবের আলোচনা আমরা স্বদেশীয়ভাবেই করিতে ইচ্ছুক।[১২]

এরপর এই আলোচনায় তিনি ভারতী নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে আলোচনা শেষ করেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ দীর্ঘ সাত বৎসর (১২৮৪-১২৯০) পত্রিকাটি যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন। মলাটে এটি "মাসিক সমালোচনী পত্রিকা" বলে আখ্যায়িত হলেও কার্যত এতে প্রথম থেকেই বিভিন্নমুখী আলোচনা স্থান পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যার সূচীপত্র তুলে দেওয়া হল : ১. তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক ২. শারদ জ্যোৎস্নায় ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস ৩. বঙ্গ সাহিত্য ৪. মেঘনাদ বধ কাব্য ৫. গুজরাটে নামকরণ ৬. করুণা ৭. স্বাস্থ্য ৮. প্রাচীন ভারতে শিল্প ৯. সম্পাদকের বৈঠক।

প্রথম বর্ষেই দ্বিজেন্দ্রনাথ "তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক" এই নামে কালীবর

বেদান্তবাগীশের রচনার সমালোচনা ধারাবাহিক প্রকাশ করতে থাকেন। দ্বিতীয় বৎসরেও এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধের এক স্থানে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'যে বিষয় যত গভীর যত উৎকৃষ্ট তাহার আবির্ভাব ততই কাল সাপেক্ষ। জগৎ যেরূপ অতলস্পর্শ 'গভীর রচনা' এবং তাহার প্রকাশও সেইরূপ অনন্তকাল ব্যাপী, কবি যদি অন্তঃকরণের সকল ভাব এককালেই প্রকাশ করিতে যান তাহা হইলে সেই ভাব ভাবমাত্রই রহিয়া যায়, আবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে না। কবি আপনার মনের ভাব আপাতত অপ্রকাশ রাখিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিলে তবেই তাহা কাব্যরূপে আবির্ভূত হয়।'[১৩] —এই ছোট্ট অনুচ্ছেদ প্রমাণ করে অতবছর আগে, দার্শনিক প্রবন্ধ সমালোচনাকালীনও তাঁর সাহিত্যিক মনটি জাগর থাকত; এবং তিনি সাধারণের নিকট তাঁর লেখা সহজবোধ্য করে তুলবার জন্য সহজ সরল ভাষায় তাঁর বক্তব্য পেশ করতেন।

"তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক" প্রবন্ধের শেষাংশে একই সঙ্গে লেখকের উদার দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিকসুলভ মনোভাব, সম্পাদক এবং সমালোচক রূপে বক্তব্য পরিস্ফুটনের ক্ষমতা, ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন :

> শাস্ত্রের মধ্যে অনেক সত্য আছে কিন্তু তাহার মধ্যে অসত্য যে নাহি তাহা নহে। শাস্ত্রোক্ত বচন, সত্য হইলেও তাহা যে শাস্ত্রোক্ত বলিয়াই সত্য এমন নহে, যৌক্তিক বলিয়াই তাহা সত্য।··· (চন্দ্রশেখর বসু) শাস্ত্রের বচন মাত্রকেই প্রমাণের যথাসর্বস্ব গণ্য করিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র আয়াস পান নাই, এ প্রণালীতে চলিলে শাস্ত্রের মতই নির্ণীত হইতে পারে, সত্য নির্ণীত হওয়া দুষ্কর। যদি শাস্ত্রের মত নির্ণীত করা গ্রন্থকারের কেবলমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ যিনি সাংখ্যের গ্রন্থকার তিনি তাঁহার গ্রন্থটি অতি সুপ্রণালী অনুসারে রচনা করিয়াছেন। নামে এবং কার্যে বয়সে কেবল তিনি প্রাচীন কালের ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার লেখার ধরণ দিব্য এ কালোচিত— তাহাতে সত্যান্বেষণেরই প্রাধান্য।[১৪]

পর পর 'ভারতী'র কয়েকটি সংখ্যা লক্ষ করলেই জানা যায় দার্শনিক প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে তাতে অন্যান্য স্বাদের রচনাও থাকত। "সেরামালী"[১৫],

"সালগম সংবাদ"[১৬] "দাদা মহাশয় ও নাতনির পত্রালাপ", "সাধনের সত্য"[১৭] "কাল্পনিক এবং বাস্তবিক ভাবের দুই প্রকার লোক"[১৮], "অন্তিম বাসনা"[১৯], "পজিটিবিজম এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম"[২০], কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য -লিখিত Positivism কাহাকে বলে নিবন্ধের প্রতিপাদ্য, ১২৮৫, "জ্যামিতির নূতন সংস্করণ"[২১], "য়ুরোপ যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র"[২২] ও তাহার প্রতিবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন রচনা সমূহ 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হতে থাকে। কাণ্টের উপর লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধও এই পত্রিকাটিতেই প্রথম বের হয়।

১২৯১-এর পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-য় ঘোষণা করেন: '"ভারতী" বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।' এই বিশেষ কারণ তাঁদের একটি পারিবারিক দুর্ঘটনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, সাহিত্যানুরাগিণী কাদম্বরী দেবীর অপমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে '"ভারতী"-র সেবকেরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন এবং এর প্রচার বন্ধ করা ঠিক করলেন।'[২৩]

সেই বৎসরেই দ্বিজেন্দ্রনাথ-পরবর্তী সম্পাদিকার ভূমিকা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য:

> এই পত্রিকায় এবার ভূমিকা শীর্ষক রচনাটি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন— ভারতীতে আবার ভূমিকার প্রয়োজন কি।...
>
> আমরা দুঃখের সহিত প্রচার করিতেছি পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা মহাশয় বর্তমান বৎসর হইতে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিবর্তে আমরা উক্ত ভার গ্রহণ করিলাম।
>
> ...আরম্ভ হইতে এ পর্যন্ত যিনি এই পত্রিকা এমন সুন্দর রূপে চালাইয়া আসিয়াছেন, অন্যকার্যবশত এখন তাঁহার সময় অভাব হইয়াছে, সে নিমিত্ত তিনি যখন সম্পাদকীয় ভার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন তখন ভারতী উঠাইয়া দেওয়াই স্থির হইল, আমাদের দেশের এবং বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থায় ভারতীর ন্যায় কোন একখানি পত্রিকার অকালমৃত্যু বড়ই কষ্টকর। এইরূপ অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাতেই আমরা ভারতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছি। পূজনীয় ভারতীর পূর্বতন সম্পাদক মহাশয় তাঁহার প্রতিভাকে স্বদেশের উপকার সাধনে ব্রতী করিয়া ১২৮৪ সালে ভারতী পত্রিকা সংস্থাপন করেন, এবং গত সাত বৎসর যাবৎ

ধরিয়া ভারতীকে বহু যত্নে, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, অঙ্ক, প্রভৃতি বিবিধ অলংকারে ভূষিত করিয়া পিতার ন্যায় সস্নেহে লালন পালন করিয়া, এখন তিনি ভারতীকে হস্তান্তরে সমর্পণ করিলেন।[২৪]

'ভারতী'র নবম বর্ষেই ঠাকুরবাড়ি থেকে 'বালক' নামে আরো একটি পত্রিকা বের হয়। 'ভারতী' বন্ধ হয়ে যাবার পরে কিছুদিন এই পত্রিকা 'ভারতী ও বালক' নামে বের হতে থাকে। তার সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, যিনি কিছুদিন 'ভারতী'ও পরিচালনা করেন।

'ভারতী'-র সম্পাদকীয় আসন থেকে অবসর নেওয়ার কিছুদিন পরেই দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র ভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকাটির সঙ্গে, সম্পাদক রূপে, তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসর জড়িত ছিলেন। প্রথমে ১৮০৬ থেকে ১৮২৩ পর্যন্ত। এর পর এক বছর হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এর সম্পাদক হন। পুনরায় ১৮২৫ থেকে ১৮২৭ দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন এবং হেমচন্দ্রের সহযোগিতা পান। ১৮২৮ শকে দ্বিজেন্দ্রনাথ একা এবং পরবর্তী দুই বৎসর ১৮২৯ থেকে ১৮৩০ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পাদনা করেন। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এঁরা দুজনেই পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে উল্লিখিত হয়েছেন।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-য় দ্বিজেন্দ্রনাথের অনেকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধ এবং বেশ কিছু ব্রাহ্ম-ধর্ম-বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। "কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন" নামক আলোচনাটি তিনি প্রথম 'ভারতী'তেই আরম্ভ করেন। শেষে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র ১৮৯০ শকের অগ্রহায়ণ মাস থেকে একই নামে পুনরায় রচনাটি প্রকাশিত হতে থাকে। আচার্য রূপে তিনি যে-সব ভাষণ দেন তারও অনেকগুলি আলোচ্য পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[২৫]

'ভারতী'-র মতো 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-য় বিভিন্ন বিষয়ে খুব বেশি রচনা বের হয় নি। তবে মধ্যে মধ্যে তার ব্যতিক্রমও দেখা যেত। প্রসঙ্গত পরবর্তী ১৮৯৩ শকের শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সূচীপত্র লক্ষ করলে দেখা যাবে "ঈশ্বরের উপাসনা" বা "গীতা মাহাত্ম্য"-র পাশাপাশি সেখানে "চুটকী গল্প" বা "স্ত্রী স্বাধীনতা ও মনু"-ও প্রকাশিত হচ্ছে। শ্রাবণ, ১৮৯৩র সূচী : "৺ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ", "ঈশ্বরের উপাসনা", "স্ত্রী স্বাধীনতা ও মনু" ইত্যাদি। ভাদ্র, ১৮৯৩-এ পাই : "প্রার্থনা", "চুটকী গল্প", "শ্রীচৈতন্য

ও তাঁহার শিষ্যগণ", "বৈদান্তিক প্রমাণ তত্ত্ব", "গীতা মাহাত্ম্য", "প্রভাত চিন্তা", "তাঁহার পরিণয়", "সংবাদ", "কুষ্ঠনিবাস", এবং "প্রচার"। এর পাশাপাশি আর-এক বছরের প্রকাশিত রচনার তালিকা লক্ষ করলে সেখানে ধর্মবিষয়ক, শাস্ত্রীয় রচনার প্রাধান্য। যথা: বৈশাখ, ১৮২৭-এর সূচীপত্রে: "করুণা", "সার সত্যের আলোচনা", "ছান্দোগ্যোপনিষৎ", "সত্য, সুন্দর, মঙ্গল" এবং "Sermons of MaharshiDevendranath Tagore"। অথবা ১৮২৭-এর জ্যৈষ্ঠ মাসের সূচী: "বর্ষশেষ", "নববর্ষ", "সত্য, সুন্দর, মঙ্গল", "এপিসটেটসের উপদেশ", "সারসত্যের আলোচনা", এবং "মহম্মদ"।' দ্বিজেন্দ্রনাথের "অদ্বৈতমতের আলোচনা", "আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম পরস্পর ঘাত, প্রতিঘাত এবং সংঘাত", "পারিবারিক উপাসনায় আচার্যের উপদেশ", "গার্হস্থ্য উপাসন মণ্ডপে আচার্যের উপদেশ" প্রভৃতি রচনার পাশাপাশি এখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত "তত্ত্বজ্ঞানের পথ" নামক দীর্ঘ আলোচনাও প্রকাশিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের মূল কথা তাঁর স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং অনুকরণ-বিমুখতা। সম্পাদকরূপে তিনি যখন তাঁর পত্রিকায় কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন তখনো সেখানে তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে:

> গ্রন্থের প্রণেতা যিনি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন—রহিয়া রহিয়া তাঁহার হৃদয়ের দক্ষিণ দিক দিয়া উল্লাস ধ্বনির প্রদীপ্ত হুতাশন এবং বামদিক দিয়া খেদোক্তির কৃষ্ণবর্ণ ধূম··· প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া একদিক হাসাইতেছে আর একদিক কাঁদাইতেছে।··· সেই সময় আমরা তাহার তোড় সামলাইতে না পারিয়া সভয়ে কতক হাত অন্তরে পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতেছি— সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার উল্লাসধ্বনিতে উল্লাসধ্বনি এবং বিলাপধ্বনিতে দীর্ঘনিশ্বাস হা হুতাশ এবং অশ্রুজল না মিশাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। [সমালোচক এখানে লেখকের সঙ্গে একাত্ম]
>
> ···আসল কথা হচ্ছে জ্ঞান, প্রেম এবং ধর্ম। বাঙালি জাতিকে কাহারও কোন পরিচ্ছদ এবং চাল চলনের কেতার অনুসরণ করিতে হইবে না। কিন্তু জ্ঞান বিলাতিও নহে, দেশীয়ও নহে। জ্ঞানের আদান প্রদানে সকলের সমান অধিকার। অতএব বিজ্ঞান এবং সেই সঙ্গে টাকা করিবার উপায় বিদেশীদের নিকট শিক্ষা করা যাক।[২৬]

সাধারণভাবে মনে হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসেবে উদার ছিলেন। যদিও 'ভারতী' প্রধানত ঠাকুর-পরিবারেরই কাগজ এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ঠিক এঁদের পারিবারিক পত্রিকা না হলেও পত্রিকাটি প্রকাশে দ্বিজেন্দ্রনাথের পিতার যথেষ্ট হাত ছিল এবং এটিকে একটি ব্রাহ্মসমাজ-পরিচালিত পত্রিকাই বলা যেতে পারে তবুও এই উভয় সাময়িকীতেই দ্বিজেন্দ্রনাথ সব রকমের এবং সকল গোষ্ঠীর লেখা প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনাসূত্রে গ্রহণ-বর্জনের যে নীতি বিশেষভাবে মেনে চলতেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ তা মানেন নি বলেই যে সম্পাদক রূপেও তাঁর কোনো মতামত ছিল না এমন মনে করা ঠিক নয়। পরবর্তী অনুচ্ছেদটি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করছি: 'এমন একজন সাধু পুরুষের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিলে লোকের তাহাতে সবিশেষ উপকার দর্শিবে এই বিবেচনায় তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পত্রিকায় কিয়দংশ কিয়ৎমাস ধরিয়া প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল। ক্রমে দেখিতে পাওয়া গেল যে তাঁহার মত আমাদের মতের সহিত মিলিতেছে না এই কারণে আমরা অতীব দুঃখের সহিত তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রকাশ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলাম।'[২৭]

'ভারতী'র সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথকে সমসাময়িক সমালোচকেরা কী দৃষ্টিতে দেখেছিলেন নিম্নোদ্ধৃত অংশতে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে: 'আর একখানি সাময়িক পত্র "ভারতী" এখনি জোড়াসাঁকোস্থ ঠাকুর পরিবার কর্তৃক প্রকাশিত। ইহার রুচি মার্জিত, ভাষা ললিত। ইহার কার্যপ্রণালী সুন্দর, ইহা কখন বাকি পড়ে না, সকল কাগজ এক বৎসর দুই বৎসর যাবৎ বাকি পড়িয়াছে, কিন্তু "ভারতী"র বাকি নাই। এই পত্রের সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর...'[২৮]

শেষের দিকে 'ভারতী'র প্রতি সংখ্যাতেই নিয়মিত গ্রন্থ-সমালোচনা বের হত। সম্পাদক নিজেই অনেকগুলি সমালোচনা করে থাকবেন এবং যেগুলি নিজে না করতেন তাও নিশ্চয় তাঁরই মতানুসারে প্রকাশিত হত। 'ভারতী'র পৃষ্ঠা থেকে কয়েকটি সমালোচনার নিদর্শন:

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১.

বনবালা, ঐতিহাসিক উপন্যাস, মূল্য ৵০ আনা। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে না আছে ইতিহাস, না আছে উপন্যাস। নভেলের সমস্ত কাঠখড় আনা হইয়াছে কেবল মূর্তি গড়া হয় নাই।...

২.

কল্পনা-কুসুম, শ্রীমতী কামিনী সুন্দরী দেবী কর্তৃক বিরচিত, মূল্য ।।০ আনা— এই গ্রন্থখানি পড়িয়া স্পষ্টই মনে হয় লেখিকার কবিত্বশক্তি আছে। "অভাগিনীর বিলাপ", "নারদ" প্রভৃতি কতকগুলি যথার্থ কবিতা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩.

কবিতাবলী, ১ম ভাগ, শ্রীরামনারায়ণ অগস্তি প্রণীত। মূল্য ৸৶০ আনা। কবিতার এই প্রথম ভাগ দেখিয়া দ্বিতীয় ভাগ দেখিবার আর বাসনা রহিল না। যে বন্ধু গ্রন্থকারকে এই কবিতাগুলি ছাপাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন তিনি বাস্তবিকই বন্ধুর মত কাজ করেন নাই।[২৯]

উক্ত উদ্ধৃতি কয়েকটি পাঠে জানা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদক রূপে কোমল ছিলেন না। সমালোচক হিসেবে তিনি রচনার প্রকৃত রসবিচার করতে চাইতেন। তাঁর বিবেচনানুযায়ী সাহিত্যিক দোষগুণ বিচার এবং তাঁর নিজস্ব মতামত প্রকাশে কুণ্ঠিত ছিলেন না। অবশ্য অকারণ কঠোর অথবা নঙর্থক সমালোচনাই যে সমালোচকের একমাত্র কর্তব্য এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না। তাই তিনি লিখলেন: '...আমাদের মতে অনর্থক গালিমন্দ দেওয়া বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করা সমালোচকের কর্তব্য কাজ নহে, কিন্তু যে সমালোচক কোনপ্রকার অভদ্রতাচরণ না করিয়া শুদ্ধমাত্র নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহার সহিত লেখকের ঝগড়া করা ভাল দেখায় না। সমালোচকের কাজটা দেখিতেছি, ঘরের কড়ি খরচ করিয়া বনের মহিষ তাড়ান, মাঝে মাঝে গুঁতাটাও খাইতে হয়।'[৩০]

দ্বিজেন্দ্রনাথ আলোচ্য পত্রিকা দুটিই কেবল মাত্র সম্পাদনা করেন। তবে 'হিতবাদী' নামক আর-একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গেও তিনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। এক হিসেবে তাঁকেই এই পত্রিকার জন্মদাতা বলা যায়। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিকথায় এ সম্বন্ধে বলেছেন: 'সাপ্তাহিক পত্রিকা "হিতবাদী" নামটি দ্বিজেন্দ্রবাবুরই সৃষ্টি এবং "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ" এই Mottoটি তিনিই বলিয়া দেন। হিতবাদীর জন্মকালে পাঁচজন একত্র মিলিয়া এক বৈঠক বসিয়াছিল; তথায় আমিও ছিলাম, দ্বিজেন্দ্রবাবুও ছিলেন। সেই সময়েই এই নাম ও Motto পরিগৃহীত হয়। সুতরাং এক হিসেবে দ্বিজেন্দ্রবাবুই ঐ কাগজের জন্মদাতা বলিতে হইবে।'[৩১]

এ ছাড়া 'শ্রেয়সী' পত্রিকার নামকরণও দ্বিজেন্দ্রনাথই করেন। পত্রিকাটির সূচনাতেই আছে: 'এই পত্রিকাখানির নাম অনেকেরই ভাল জানা আছে। এই নামটি পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দিয়াছিলেন।' এই নামকরণের ইতিহাস আর একটি স্মৃতিচিত্রণের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে: 'মীরা দেবীর আকর্ষণে প্রতি সন্ধ্যায় গৃহকাজ সেরে গৃহিণীরা লেবুকুঞ্জে একত্র হতেন। বড়মা হেমলতা দেবী, প্রতিমা দেবী এঁদেরই উৎসাহ প্রবল। পরে ক্রমশ মেয়েদের দল খুব বেড়ে গেল। আশ্রমের সেই মেয়েদের নিয়ে একটি দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিমা দেবীর অনুরোধে গুরুদেব এই সমিতির নাম দিলেন আলাপিনী। বড়মার উদ্যোগে সমিতিতে সাহিত্যালোচনার ব্যবস্থা হল। মেয়েদের রচনা, ছবি নিয়ে হাতের লেখা "শ্রেয়সী" পত্রিকা দেখা দিল। নাম দিয়েছিলেন বড়বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ।'[৩২]

সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ যে মনুষ্যত্বের একটি আদর্শে আস্থাবান ছিলেন, এই নামকরণে সেই পরিচয়টি নিহিত আছে। তিনি শ্রেয়োভাবনাতেই চিরদিনই উদ্‌বুদ্ধ ছিলেন। বঙ্কিমপ্রসঙ্গেও হয়তো সে কথাটি বলা যায় কিন্তু সম্পাদক বঙ্কিম সামাজিক নীতিচিন্তা ও বিবেক চেতনার দ্বারা যে অনুপাতে অধিকৃত ছিলেন, ঊর্ধ্বগ আধ্যাত্মিক প্রমূল্যের দ্বারা সে অনুপাতে প্রাণিত ছিলেন না। দ্বিজেন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্ম এষণার সঙ্গে সহিষ্ণু একটি সাহিত্যভাবনার কোনো বিসংগতি ছিল না। সেজন্য এমন কথা বললে অন্যায় হয় না সাময়িকী সম্পাদনার ইতিহাসে সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্কিমযুগ এবং রবীন্দ্রযুগের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সেতুময়তার উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে আছেন।

সম্পাদনা ছাড়াও নিয়মিত লেখক হিসেবে তিনি তৎকালীন অনেকগুলি পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচনা এবং পত্রাবলী পুরাতন মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্তভাবে আছে। তাদের অনেকগুলিই পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত। ঐ-সব পত্রিকাগুলির মধ্যে 'প্রবাসী', 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব', 'সাধনা', নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'মানসী', 'শান্তিনিকেতন', 'বুধবার', 'শ্রেয়সী' এবং 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সাময়িকীর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের এই যোগসূত্র তাঁর বিচিত্রপথগামী জীবনবোধের পরিচায়ক।

৫

দ্বিজেন্দ্রব্যক্তিত্ব ও রবীন্দ্রনাথ

মহর্ষির সর্বজ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠতম দুই পুত্রের বয়সের ব্যবধান দুই দশক। বয়সের যথেষ্ট ব্যবধান সত্ত্বেও মনের দিক থেকে এঁরা খুব বেশি দূরে ছিলেন না। মহর্ষির অন্যান্য গুণী ও প্রতিভাবান সন্তানদের মতোই এঁদের দুজনের মধ্যে বিচিত্র প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষিত হয়।

পারিবারিক উত্তরাধিকার-সমৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথের ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ—সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩), হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-১৮৮৪), বীরেন্দ্রনাথ (১৮৪৫-১৯১৫), সৌদামিনী (১৮৪৭-১৯২০), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫), সুকুমারী (? ১৮৫০-১৮৬৪), শরৎকুমারী (১৮৫৪-১৯২০) স্বর্ণকুমারী (? ১৮৫৬-১৯৩২), সোমেন্দ্রনাথ (১৮৫৯-১৯২২) ও রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)— প্রায় সকলেই স্বনামধন্য। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর কবি গর্বভরে তাঁদের আত্মপরিচয় দিয়েছেন।[১]

এঁরা সকলেই প্রতিভান্বিত। প্রত্যেকেরই প্রতিভার বিকাশ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। প্রতিভার ব্যাপকতা বিচার করলে এঁরা প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষেত্রে একাকী। তাঁদের মানসিকতা এবং চরিত্র সংসার ও সমাজের পরিবেশে বিভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে। যে সংসারে দ্বিজেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন সে সংসারের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্মকালে তাঁর পিতামহ জীবিত। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই দ্বারকানাথের বিদেশ যাত্রা এবং সেখানে তাঁর পরলোকগমন ঘটলে দ্বিজেন্দ্রনাথের উপর স্বাভাবিক কারণেই তাঁর পিতার প্রভাব এসে পড়ে।

তবে পিতার প্রভাব যেন রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ কার্যকরী। সংসার-কর্মে উদাসীন বা নির্লিপ্ত হলেও মহর্ষি বিষয়কর্মকে অবহেলা করেন নি। রবীন্দ্রনাথও তাঁর আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁর জমিদারি পরিচালনায় না ছিল শৈথিল্য, না ছিল কাঠিন্য। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনে এই ধারার ব্যতিক্রম দেখা যায়।[২] অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে তিনি কর্মজীবনে বৈষয়িক বোধ থেকে বিবিক্ত ছিলেন। তিনিও কোনোসময় পঞ্চায়েৎ পরিচালনা করেছেন এবং তাদের ট্রাস্টি নির্বাচিত হয়েছেন।[৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার কাছেই নানাবিষয়ের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। কিন্তু পিতা ছাড়াও অন্যান্য ভাইদের প্রভাবও তাঁর উপর বেশ পড়েছে। এঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এঁর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের ঘনিষ্ঠতা সব থেকে বেশি। এই দুই ভাই একত্রে বহু কাব্যচর্চা, সাহিত্য ও সংগীতচর্চা এবং শেষের দিকে নাট্যচর্চা করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনে ছড়িয়ে আছে। এঁকেই তাঁর প্রথম সাহিত্যগুরু বলে ধরা যেতে পারে। আনন্দ ও জীবন-রসিক, প্রাণশক্তিতে ভরপুর, সরলহৃদয় ঋষিসুলভ এই বড়দাদার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন। বড়দাদার কাব্যরসের আহ্বানে কিশোর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর ভাষায়: 'তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল-আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও পাইতাম। বড়দাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের ভাষার কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার— বান ডাকিয়া আসিত, নব নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কূল উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত।'[৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বড়দাদার মধ্যবর্তিতাতেই 'মেঘদূত'-এর মতো ধ্রুপদী কাব্যের অন্তর্লীন পরিচয় পান।[৫] বড়দাদার কবিত্বশক্তির প্রতি বা তাঁর রসগ্রহণ ক্ষমতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের শৈশবকাল থেকেই একটা সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ছিল। তাই শৈশবে দেখা যায় মা যখন কনিষ্ঠ পুত্রের রামায়ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনে জ্যেষ্ঠকে শোনাবার ইচ্ছে পোষণ করেন তখন কবি মনে মনে এক ধরনের বিপদ বোধ করেন।[৬]

পিতৃপ্রতিম বড়দাদার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভক্তি ছিল গভীর। সত্যেন্দ্রনাথ এঁর থেকে মাত্র দু বছরের ছোটো হলেও রবীন্দ্রনাথ মেজদাদার অনেক কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন। তাঁদের অন্তরঙ্গতা অনেকটা বন্ধুর মতো। যৌবনে রবীন্দ্রনাথ 'ভাই মেজদাদা' সম্বোধনে চিঠিপত্র লিখেছেন। তাঁর নিকট প্রবাসে এবং বিদেশে রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন থেকেছেন। সেই সময় তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যার সান্নিধ্যের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ কার্যকরী হয়। কিন্তু সেদিক থেকে দেখলে দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা সমীহসঞ্চারী দূরত্ব ছিল। তাঁদের ঘনিষ্ঠতা তাঁদের বন্ধুর

মতো কাছে আনে নি।

অপরপক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথও সত্যেন্দ্রনাথ বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে 'ভাই সতু', 'ভাই জ্যোতি' সম্বোধন করে চিঠি লিখেছেন; সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা কোনো কোনো পত্রের শেষাংশে 'সমদুঃখসুখ' বা 'তোমার সম সুখ সম দুখ বড়দাদা' পাঠ দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে লেখা কোনো চিঠিতে এ জাতীয় পাঠ দেখা যায় নি। পরিণত বয়সেও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে "শ্রীচরণেষু" বলে সম্বোধন এবং প্রণাম জানিয়ে চিঠি শেষ করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সম্পর্ক দু-একজনের স্মৃতিচারণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

> ১৯২১ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর দুজনাতে একসঙ্গে বসে দীর্ঘ আলোচনা করতে কখনো দেখিনি। অথচ এ সত্য আমরা খুব ভালো করেই জানি, দ্বিজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য, চরিত্রবল তথা বহুমুখী প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অতি অবিচল শ্রদ্ধা ছিল এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাকে অতিশয় সম্মানের চোখে দেখতেন।··· রবীন্দ্রনাথ প্রতি উৎসব দিনে কিংবা বিদেশ থেকে আশ্রমে ফিরলে সেখানে প্রবেশ করা মাত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রণাম করতে আসতেন। সামান্য যে দু একটি কথাবার্তা হত তা অতিশয় আন্তরিকতার সঙ্গে। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ছোট একটি কবিতা কিংবা অন্য ঐ ধরনের কোনো কিছু একটা লিখে কবিকে পাঠিয়ে মতামত জানতে চাইতেন। উচ্ছ্বাস ও প্রশংসা ভিন্ন অন্য কিছু রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করতে শুনি নি।[৭]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমজাতীয় ঘটনার উল্লেখ করেছেন :

> উৎসবোপলক্ষ্যে কবি বড়দাদাকে প্রণাম করিতে যাইতেন। প্রণাম করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথের পায়ের নিকটেই রবীন্দ্রনাথ বসিতেন। জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের ভ্রাতৃভক্তি এবং কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃবৎসলতার এই পবিত্র দৃশ্য— একের ভক্তি, অন্যের বাৎসল্য বস্তুতই যেমন হৃদয়গ্রাহী ও সমাজের স্থিতিমূলক, তেমনি স্বজনের আচার ব্যবহারও সমাজে বিশেষ হিতকর ও শিক্ষণীয়।[৮]

ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ বড়দাদার সঙ্গে বয়সোচিত কারণে

কিছুটা দূরত্ব রেখে চললেও সাহিত্য-জীবনে তিনি বড়দাদার কাছে ঋণী। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' রচনাকালে একটি সাহিত্যের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সাহিত্যের হাওয়াতেই রবীন্দ্রনাথ বড়ো হয়েছেন :

বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি ছোটো ডেস্ক লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছিলেন। গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাঁহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ববিকাশের পক্ষে বসন্তবাতাসের মতো কাজ করিত। বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই।... স্বপ্নপ্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, লাভ করিবার জন্য পুরোপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কিনা জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না, কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম; তাহারই আনন্দ আঘাতে শিরা উপশিরায় জীবন স্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।[৯]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-মনটি গড়ে উঠতে এই পরিবেশ বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। এ কথা সত্য জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সাহিত্যচর্চা জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের আমলেই জাঁকিয়ে চলেছিল এবং সেই আসরেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম হাতে-খড়ি। তবে দ্বিজেন্দ্রনাথের এবং তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ-রচনাকালীন যে পারিবারিক আবহাওয়া তারও একটা ছাপ নিশ্চয় কবির ওপর পড়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'-র একটি পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন : 'আমি ঘরের একটি কোণে বসিয়া বা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা ['স্বপ্ন-প্রয়াণ'] শুনিবার চেষ্টা করিতাম।... স্বপ্নপ্রয়াণ বহুবার শুনিয়া তাহার বহুতর স্থান আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।'[১০]

এ ছাড়া, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় 'এই যে হেরি গো দেবি আমারি' গানে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'-এর (অক্টোবর ১৮৭৫) কাব্যের 'জয় জয় পর-ব্রহ্ম' গানটির কিছু প্রভাব লক্ষ করা যায়।

স্বপ্ন-প্রয়াণ :

মহাকবি। আদি কবি।
ছন্দে উঠে শশি-রবি
ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়॥
তারকা কনক-কুচি
জলদ্ অসার-রুচি
গীতা লেখা নীলাম্বর-পাতে।

বাল্মীকিপ্রতিভা :

ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে,
ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে,
জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে।[১১]

বাল্যকালে বড়দাদার সাহায্যেই 'অবোধবন্ধু' পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ঘটে। তাঁর আলমারি থেকে এই পত্রিকাগুলি বের করে নিয়ে কতদিন দক্ষিণ দিকের ঘরে খোলা জানলার কাছে বসে পড়েছেন। পরিণত বয়সে তাঁর দান্তে চর্চাও বড়দাদার নিকট থেকেই এসেছে।[১২]

দ্বিজেন্দ্রনাথের যৌবনে তাঁর সঙ্গী হিসেবে গুণেন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাড়িটিকে পূর্ণ করে রেখেছিলেন। 'নাট্য কৌতুক আমোদ উৎসবের নানা সঙ্কল্প তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নব নব বিকাশ লাভের চেষ্টা করিত।' রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি অনুযায়ী সেই সময়েই দ্বিজেন্দ্রনাথ একবার কী একটা কিম্ভুত কৌতুকনাট্য রচনা করেন। রোজ দুপুরে তার মহড়া চলত। রবীন্দ্রনাথ 'এ বাড়ির বারান্দায়'[১৩] দাঁড়িয়ে খোলা জানলার ভিতর দিয়ে অট্টহাস্যের সঙ্গে মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু কিছু পদ শুনতে পেতেন। তাতে ছোটোদের প্রবেশাধিকার না থাকলেও তার একটা চাঞ্চল্য কবি-চিত্তে নাড়া দিত।

'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হবার সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ আবার কাছাকাছি এলেন। 'এ সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। আমার বয়স তখন ঠিক

ষোলো। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদক চক্রের বাহিরে ছিলাম না।'[১৪] এই পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে পরিবারের আরো অনেকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও প্রচুর রচনা প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ আঠেরো বছর বয়সে, 'ভারতী' প্রকাশের মাত্র দু বছর পরে, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে যান। ইয়োরোপ যাত্রা ও ইংল্যাণ্ড প্রবাসের অভিজ্ঞতার বর্ণনামূলক 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' প্রকাশিত হয়। তার কিছু কিছু চিঠি 'ভারতী'-র উদ্দেশ্যে লিখিত। সেগুলি ১২৮৬ বঙ্গাব্দে 'য়ুয়োপ যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' নামে প্রকাশিত হয়। সেই সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ কোনো-কোনোটিতে প্রকাশিত মন্তব্যের বিশেষ সমালোচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় ইঙ্গবঙ্গ সমাজের কঠিন সমালোচনা এবং ব্যঙ্গ করেন। বিদেশের তুলনায় দেশের সামাজিক রীতি ও প্রথার, বিশেষত স্ত্রী-স্বাধীনতার অভাব ও গুরুজনের সঙ্গে ব্যবহার-রীতি সম্বন্ধেও তিনি মন্তব্য করেন। 'ভারতী' সম্পাদক অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ দেশীয় প্রথা ও রীতির সমর্থন এবং রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের প্রতিবাদ করে 'টিপ্পনী' প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ পরের সংখ্যায় তার উত্তর দেন। এইভাবে বাদ-প্রতিবাদ পরপর কয়েক সংখ্যা ধরেই চলতে থাকে।[১৫]

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: 'সম্পর্কে বড় কিংবা বয়সে বড়র চেয়ে গুণে বড়র কাছে আত্মবিসর্জন করা ঢের বেশি যুক্তিসিদ্ধ।' দ্বিজেন্দ্রনাথ: 'এ কথাটি হৃদয় শূন্য মস্তিষ্কের কথা। সম্পর্কে বড়র সঙ্গে হৃদয়ের যেমন যোগ জ্ঞানে ও গুণে বড়র সঙ্গে সেরূপ হওয়া দুর্ঘট।'

বিদেশের সভ্যতা— অত্যধিক 'thanks', 'please' প্রভৃতি শিষ্টাচার-সূচক ব্যবহার প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন: 'এ সকল কৃত্রিম সভ্যতার না আছে অর্থ না আছে কিছু ;··· ছেলের জ্বর হইয়াছে আর যেই তার বাপ একটি হাতপাখা তুলে নিয়ে তার গায়ে বাতাস দিতে লাগল অমনি ছেলে বলে উঠলেন, "Thank you বাবা" এরূপ কাষ্ঠ সভ্যতা কাষ্ঠ হৃদয়ের উপরেই গুণ করিতে পারে, সহজ হৃদয়কে আগুন করিয়া তোলে।'

সম্পাদক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: 'তিনি [অর্থাৎ সম্পাদক মশাই] কতকগুলো কথা নিয়ে অনর্গল বকাবকি করে গেছেন।··· কোন আবশ্যক ছিল না।'

তার উত্তরে সম্পাদক লিখলেন : 'কেন যে আবশ্যক ছিল না তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। লেখক আমাদের নিরীহ দেশটির প্রতি স্বচ্ছন্দে ধিক্কারের খরশান কৃপাণ এবং উপহাসের তীক্ষ্ণবাণ অনর্গল চালাইতে পারেন আর এক ব্যক্তি চাল দিয়া তাহা আটকাইতে গেলে তাহা পারিবেন না কেননা লেখকের মতে তাহা অনাবশ্যক।'

পিতৃপ্রতিম দ্বিজেন্দ্রনাথের মতকে অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক রবীন্দ্রনাথ 'অবিচারে শিরোধার্য' করে নেন নি। লেখকরূপেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'সমান আসনে' বসে আলোচনা করেছেন। এই যে মতবিরোধ তা কোনো গভীর মতবিরোধ থেকে সৃষ্টি হয় নি। এই বাদানুবাদে অগ্রজ যেন অনুজের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি, তাঁর কল্পনাশক্তির বিকাশে সাহায্য করেছেন। বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার ক্ষমতা হয়েছে।

পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলন এবং গান্ধীজিকে কেন্দ্র করে দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে বিতর্ক হয় আলোচ্য প্রসঙ্গে সেই বিতর্ক স্মর্তব্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের বিশেষ সমর্থক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেন নি। এই নিয়েই দুজনের তর্ক।[১৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথের "উপসর্গের অর্থবিচার"[১৭] নামক প্রবন্ধের সমালোচনার[১৮] উত্তরে তিনি 'ভারতী'তে[১৯] একটি প্রবন্ধ লেখেন। 'শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, উপসর্গের অর্থবিচার সম্বন্ধে তিনি একটি পথ নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। এবং সে পথ তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত কোন গোপন পথ নহে, তাহা বিজ্ঞানসম্মত রাজপথ। তিনি দৃষ্টান্ত পরম্পরা হইতে সিদ্ধান্তে নীত হইয়া উপসর্গগুলির অর্থ উদ্ভবের চেষ্টা করিয়াছেন। সেই চেষ্টার ফল সর্বত্র কার্যকরী নাও যদি হয়, তথাপি সেই প্রণালী একমাত্র সমীচীন প্রণালী।'

এ ছাড়া 'প্রভাত সংগীত'-এর "সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়" কবিতাটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়। তারা আগের সংখ্যায় উক্ত নামেই একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মনে হয় সেটি দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা। 'ভারতী'র কিছু কিছু প্রবন্ধ এতই এক ধরনের যে সন্দেহ জাগে কোন্‌টি কার রচনা।

১৩২৫ মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে (পৃ ৩৭৪) বিভিন্ন জাতের ভিতর বিবাহ

আইনসিদ্ধ করার বিষয়ে একটি খবর বের হয়। ঐ সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথও ঐ বিলের সমর্থনে লেখেন, 'Mr. Patel's Bill has my heartiest support.' ১৩২৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'প্রবাসী'তে অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথের চারটি চিঠি প্রকাশিত হয়।

'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্যে একজন কবির সঙ্গে সঙ্গে এক শিল্পীমনেরও প্রকাশ। 'মানসী'র যুগে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই জাতীয় মিলন লক্ষিত হয়। বালক রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে 'সারদা মঙ্গল'-এর কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর অত কারুকার্যখচিত গঠন-কৌশল বা রচনা-সৌরভ তাঁর তখন অনুকরণ আয়ত্তের বাইরে ছিল। যদিও এর রসে রবীন্দ্রনাথরা সকলেই মেতে উঠেছিলেন: 'বড়দাদা··· এক সময়ে ধরলেন "স্বপ্নপ্রয়াণ" লিখতে। তার গোড়ায় শুরু হল ছন্দ বানানো, সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিকে বাংলা ভাষার ধ্বনির বাটখারায় ওজন করে সাজিয়ে তুলতেন।'[২০]

এত যত্ন করে অনুশীলন শব্দচয়ন এবং সযত্ন ছন্দনির্বাচনের মাধ্যমে 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' সত্য সত্যই ছন্দোবৈচিত্র্য ও বাণীমাধুর্যে অনন্য। 'কড়ি ও কোমল' যুগ শেষ হবার পরে রবীন্দ্রনাথ যে-সব নতুন ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তার অনেকগুলির আভাস পাওয়া যায় 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'।

প্রসঙ্গত ধরা যেতে পারে 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি দুটি:

যথায় মহাবট, শিরে জট, অতি নিবিড়।
পালিছে চুপে চাপে, খোপে থাপে, অযুত নীড়॥

—(২।১১৯)[২১]

এই ধরনের পর্ববিন্যাসের সঙ্গে 'মানসী'-র "বিরহানন্দ" কিংবা "ক্ষণিক মিলন" কবিতার অনেক মিল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কবিতার শেষ পর্বে দুটি মাত্রা কমিয়ে দিয়ে— অপূর্ণপদী অবকাশ এনেছেন:

তবু সে ছিনু ভালো আধো-আলো আঁধারে
গহন শত-ফের বিষাদের মাঝারে।

পরবর্তীকালে এই ছন্দ মসৃণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। অপূর্ণপদী হয়েছে বিস্তারিত, এমন-কি, তাঁর গানেও সেই মসৃণতার ছাপ এসেছে:

একদা তুমি, প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে সে কথা যে গেছ ভুলে॥

বাণী সংগীতের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গম্ভীর সুরের আভাস দ্বিজেন্দ্রনাথের কণ্ঠে অনেক আগেই শোনা গেছে— রসাতল বর্ণনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন :

গম্ভীর পাতাল ! যথা কাল রাত্রি করাল-বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য ! শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবা-নিশি ফাটি রোষে ; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখা-সজ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময় ॥
তমো হস্ত এড়াইতে— প্রাণ যেথা কালের কবল !
কোথা জল, কোথা স্থল কোথা তল কোথা দিগ্বিদিক ॥

তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের "নরকবাস" কবিতার প্রেতলোকের বর্ণনা—

নিখিলের অশ্রু যেন করেছে সৃজন
বাষ্প হয়ে এই মহা অন্ধকারলোক—
সূর্যচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক
নিঃশব্দে রয়েছে চাপি দুঃস্বপ্ন-মতন
নভস্তল—

দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছেন : কোথা জল কোথা স্থল কোথা দিগ্বিদিক।

রবীন্দ্রনাথ :

কোথা রাত্রি, কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা
কোথা পথ, কোথা গৃহ, কোথা পান্থ, কোথা পথহারা···
কোথা কে বা কোথা সিন্ধু, কোথা ঊর্মি কোথা তার বেলা।

এ ছাড়াও আধুনিক সমালোচক[২২] আরো কতকগুলি মিল দেখিয়েছেন : 'বিশিষ্ট বাণীভঙ্গি বা অন্ত্যানুপ্রাসের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের রচনার পূর্বাভাস স্বপ্নপ্রয়াণের কোনো কোনো স্থানে বহু আগেই ধরা পড়েছে :

তোলো তোলো হে মলয় ইহার আঙুল দুটি ধরি
আর উঠিবে না !
কেন আর খুঁজিছে গো মধুকর গুন গুন করি—
আর ফুটিবে না !
মরণেরে ধরিয়াছে পরাণের প্রিয়
ভুলালে কথায় আর কান দিবে কি ও !—

এই-সব পঙ্‌ক্তিগুলিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সুর স্পষ্ট শোনা যায়। পঙ্‌ক্তি-সজ্জা বা স্তবক-গঠনের কৌশলটিও লক্ষ করবার মতো। তা ছাড়া শেষ দুটি ছত্রে প্রিয়-র সঙ্গে কি ও-র বিশেষ ধরনের অন্ত্যমিল পাঠকমাত্রেরই চোখে পড়বে।...

রবীন্দ্রনাথের আছে—

শূন্যে তোমার ওগো প্রিয়,
উত্তরীয় উড়ল কি ও.'

দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর রচনার যে ধারা তাতে আত্মজীবনীর ছাপ পড়েছে; রবীন্দ্রনাথের 'কবি-কাহিনী'র ভিতরও আমরা এরকম একটি জগতের পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা চারিত্র এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ-অঙ্কিত কল্পনা (muse) এই উভয় রচনাতেই সৃষ্টির আড়ালে স্রষ্টার ছবি ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের 'কবি-কাহিনী'-র যে রূপকল্প তাও তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথের নিকট পেয়েছেন। এ ধারা ঠিক এপিকের ধারা নয় আবার একে লিরিকও বলা যায় না। এ একটা বিমিশ্র কাব্যবস্তু।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ অঙ্গুলিমেয়: রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য। কিন্তু তা হলেও এদের ভিতর একটি সামীপ্য এবং সাদৃশ্য দেখা যায়। 'ক্ষণিকা'-য় 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর কৌতুকী দৃগ্‌ভঙ্গি ও বাগরীতির ছাপ দেখা যায়। আবার রসাতলপ্রয়াণের সঙ্গে 'প্রান্তিক'-এর ভাষারও একটা মিল লক্ষিত হয়। মৃত্যুর জগতে দ্বিজেন্দ্রনাথ দেখেছেন: 'গম্ভীর পাতাল! যথা কাল রাত্রি করাল-বদনা/ বিস্তারে একাধিপত্য।'[২৩] সেখানে রবীন্দ্রনাথ: 'মৃত্যুদূত এসেছিল হে প্রলয়ংকর, অকস্মাৎ / তব সভা হতে। নিয়ে গেল বিরাট প্রাঙ্গণে তব; / চক্ষে দেখিলাম অন্ধকার।'[২৪]

কবিতার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথে যে পরিমাণ মিল পাওয়া যায় গদ্যের ক্ষেত্রে তেমনটি নয়। তা হলেও রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার স্থানে স্থানে দু-একটি জায়গায় চরিত্রে বড়দাদার ছাপ পড়েছে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র চরিত্রায়ণে, 'কাহিনী'র "গানভঙ্গ" কবিতাটিতে কিংবা বুড়োরাজা প্রতাপরায়ের চরিত্রে সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রনাথেরই ছাপ পড়েছে। অতদিন আগে দ্বিজেন্দ্রনাথই প্রথম কথ্যভাবে রচনা আরম্ভ করেন। 'বড়দাদা যেমন কথ্যভাষায় সহজ সরল করে প্রবন্ধ লিখতে পারেন, আমরা সেরূপ পারি না। এটা তাঁর স্বাভাবিক শক্তি।'

"সোনার কাটি রূপার কাটি" প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন :

"আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে অদ্য এখানে আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও উপস্থিত নাই, যিনি তাঁহার মুখ-মণ্ডলের আদিম নিষ্কলঙ্ক অবস্থায়, শীত কালের রাত্রে হি হি করিয়া লেপ মুড়ি-শুড়ি দিয়া বা বর্ষা রাত্রের সুধীর ধারায় যখন ভেকের কোলাহল মুহুর্মুহু জাগিয়া উঠে তখন ঘরের এক নিভৃত কোণে জড়সড় হইয়া, অথবা বৈশাখের ফুরফুরে সন্ধ্যা-সমীরণের সহিত ফিন্‌ফিনে উড়ানীর সখ্য-বেগ সম্বরণ পূর্বক ছাতে মাদুরের উপরে অর্ধ-উপবিষ্ট বা অর্ধ-শয়ান হইয়া, দিদিমা মা কাকীমা জেঠাইমা পিসিমা বা মানুষ-কারিণী ধাত্রীর মুখের পানে নয়ন-মন ঘণ্টা দুয়ের মত গচ্ছিত রাখিয়া··· গল্পের মাঝে হুঁ না দিয়াছেন।"[২৫]

আটপৌরে শব্দচয়ন এই বর্ণনাকে লৌকিক করে তুলেছে। ক্রিয়াপদের সাধুরূপ লৌকিক আটপৌরে বাক্যাংশের স্পর্শে নিতান্তই ঘরোয়া হয়ে উঠেছে : 'হি হি করিয়া', 'লেপ মুড়ি-শুড়ি দিয়া', 'জড়সড় হইয়া', 'ফুরফুরে', 'ফিনফিনে উড়ানী' প্রভৃতি সে-রকম বাক্যাংশ। দ্বিজেন্দ্রনাথের পণ্ডিত মনটির সঙ্গে সঙ্গে যে একটি লৌকিক মন মিশে ছিল— সেই মনেরই প্রকাশ এই-সব রচনার মধ্যে। তাঁর এই লৌকিক মনটির বিশেষ ভঙ্গিটির ছায়া পড়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ছড়া', 'ছড়ার ছবি', 'খাপছাড়া', 'সে', 'গল্পসল্প' প্রভৃতি রচনায়।

প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যধারায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। পরে ক্রমশ তাঁর নিজস্ব একটি সত্তা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এঁদের মধ্যে একটা দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও দুজনের রচনাতেই মধ্যে মধ্যে এমন মিল পাওয়া যায় যাতে মনে হবে সেই সময় বা সেই-সব জায়গায় দুজনের চিন্তাধারা এক।

'বলাকা'-র যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ থেকে মূলত ছিন্ন হয়ে গেছেন। ১৮৯৫-এর পর থেকেই তাঁদের সম্পর্ক বিভাজিত— মননের মধ্যে, মেজাজের মধ্যে। অবশ্য এর কয়েক বৎসর আগেই (১৮৮৯) রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী' নাট্যকাব্যটি বড়দাদাকে উৎসর্গ করেন : 'পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর / বড়দাদা মহাশয়ের / শ্রীচরণকমলে / এই গ্রন্থ উৎসৃষ্ট হইল।'

এই গ্রন্থ পাঠের পর দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন, রবীন্দ্রনাথ সেই চিঠি 'পারিবারিক স্মৃতি-লিপি পুস্তকে' লিখে রেখেছিলেন :

রাজা ও রাণী

রাজা ও রাণী সম্বন্ধে বড়দাদা আমাকে একখানি ছোট চিঠি লিখিয়াছেন। সেই চিঠি আমি এইখানে কাপি করিয়া রাখিলাম। আমার নানা সমালোচনা সম্বন্ধে নানা লোক নানা কথা বলিয়াছে কিন্তু কোন সমালোচনায় আমি এত গর্ব অনুভব করি নাই। বড়দাদার কাছ হইতে আসিতেছে বলিয়াই আমার এত বিশেষ গব ও বিশেষ আনন্দ।

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

রবি,

আজ আমি 'রাজা রাণী' খানা শেষ কল্লুম— Most pathetic— concentrated essence of Poetry— আমি এরূপ কবিতা ইংরাজিতেও দেখি নাই— যদি কোথাও দেখিয়া থাকি এখন তা দূরীভূত —বইখানি a really worthy of immortality.

রাজাটা is of a peculiar character— one sided— out of joint— unreasonable— inconsiderate— স্ত্রীলোকের এইরূপ স্বভাব naturally suit করে কিন্তু পুরুষের— তা শুধু নয়। রাজার— এরূপ character something very awkward— Lyrical versus Dramatic এই যা একটু খোঁচ— নইলে বইটি Firstclass Poetry.

[দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর][২৬]

2. 10. 89

মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ উপলক্ষে 'ভারতী'-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'যৌতুক না কৌতুক' কাব্যখানি উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-অংশখানি এইরকম :

ছদ্মবেশধারী উৎসর্গ
বা
উপসর্গ

শবরী গিয়াছে চলি। দ্বিজরাজ শূন্য একা পড়ি
প্রতীক্ষিছে রবির পূর্ণ উদয়।

গন্ধহীন দু চারি রজনীগন্ধা লয়ে তড়িঘড়ি
মালা এক গাঁথি ফেলি অসময়
সঁপিয়া রবির শিরে ব'ল এই 'আশিষি তোমারে
অনিন্দিতা স্বর্ণ মৃণালিনী হোক্
সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার। কুরূপার কারে
যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক।'[২৭]

ছিন্নপত্রাবলীর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের এবং বড়দাদার সৌন্দর্যবোধ এবং ধারণা বা তা উপভোগ করার মধ্যে যে পার্থক্য তা সুন্দর-ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রসঙ্গত তুলনামূলকভাবে সেখানে দ্বিজেন্দ্রনাথের আবাল্যবন্ধু বিহারীলাল চক্রবর্তীর কথাও এসেছে। নিম্নোক্ত অংশটুকু পাঠ করলে বোঝা যায় তাঁদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি মুলত এক না হলেও একটি নিটোল যোগসূত্র আছে।

আমি যদিচ নিজের চারি দিককে সুন্দর করে রাখতে ইচ্ছে করি, কিন্তু অনেক সময়েই নানাকারণে তাতে অবহেলা প্রকাশ করে থাকি— অনেক সময় সব অগোছালো হয়ে যায় এবং সর্বদা নিজেকেও যে পরিপাটি করে রাখি তা নয়। কিন্তু সৌন্দর্য যে আমাকে পাগল করে দেয় সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই— সৌন্দর্য এবং ভালোবাসার মধ্যে আমি যতটা অনন্ত গভীরতা হৃদয়ের সঙ্গে অনুভব করি এমন আর কিছুতে না, এবং যখন যথার্থ সেই ভাবাবেশে নিমগ্ন থাকা যায় তখন নিজের ব্যক্তিগত সাজসজ্জা এবং পরিপাট্যকে তেমন বেশি কিছু মনে হয় না— যখন মনটা সৌন্দর্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেইটেই যথেষ্ট হয়। আমার বি[হারীলাল]কে মনে পড়ে; লোকটি নেহাত অসজ্জিত ঢিলেঢালা অপরিপাটি— কিন্তু তার লেখা পড়লে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে, সে একটি সৌন্দর্যের মাতাল ছিল। ব[ড়দাদা] যে একসময়ে যথার্থ কবির মতো সমুদয় সৌন্দর্য উপভোগ করতেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি যে কোনোকালে তাঁর চারি দিক সুন্দর করে রাখতেন না এবং সুন্দর হয়ে থাকতেন না সেও নিশ্চয়।[২৮]

বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্তর্মুখী ভাবণ-ভঙ্গির উপর রবীন্দ্রনাথের গভীর আস্থা। বক্তা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উচ্চ আসনে বসিয়েছেন। ইন্দিরা

দেবীকে লিখিত একটি পত্রে পরবর্তী উল্লেখ দেখি : 'বড়দাদা যখন একটা কিছু বলেন তখন আমার সমস্ত চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং উপকার হয়। অক্ষম লোকে যখন বলতে আরম্ভ করে তখন মনের মধ্যে যে একটা অসহ্য অধৈর্য এবং বিরক্তি উপস্থিত হয় তাতে কেবল অপকার হয়।'[২৯]

কোন্ জায়গায় কতটুকু বলা প্রয়োজন তা দ্বিজেন্দ্রনাথ ভালোভাবেই জানতেন। তিনি তাঁর এক বক্তৃতা এইভাবে শেষ করেছেন : 'a word to the wise is sufficient। আমার এবার চুপ করা উচিত।' (অদ্বৈত-মতের সমালোচনা শীর্ষক এই বক্তৃতাটি তিনি চৈতন্য লাইব্রেরিতে পাঠ করেন ১৮৯৮ সালে এবং পরে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।) সুন্দরভাবে বিষয়ের উত্থাপন এবং তাকে ব্যাখ্যা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই মিতভাষণের প্রতি সজাগদৃষ্টি নিশ্চয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আকৃষ্ট করেছিল।

অগ্রজের বহু চিঠিপত্র বা আলোচনায় কনিষ্ঠের উল্লেখ তাঁর প্রতি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচায়ক। কখনো কখনো দ্বিজেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠের মতাদর্শকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েছেন ; সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখিত নিম্নলিখিত চিঠি তাঁর সে মনোভাবের পরিচায়ক :

> রবি দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন Andrews সাহেবকে। তাহার keynote হচ্ছে world-wide co-operation। এবার এই যে দুটি পত্র লিখিয়াছেন রবি— ইহার উপরে কাহারো দ্বিরুক্তি হইতে পারে না। তা শুধু নয়— আমি তাহার প্রতি কথায় সর্বান্তঃকরণের সহিত সায় দিতেছি। তাহা দেখলে তুমি খুব খুশি হবে যে রবির কথা আমার গভীর অন্তরাত্মার কথা... ইত্যাদি
>
> তোমার স্নেহে বাঁধা বড়দাদা[৩০]

রবীন্দ্রনাথের মতো দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে দুঃখের ভিতর দিয়েই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ : 'মানুষের জীবনের জন্য যেরূপ বায়ু আবশ্যক, মানুষের মনুষ্যত্বের জন্য সেইরূপ দুঃখ প্রয়োজনীয়। দুঃখই মানুষের মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের বন্ধন— দুঃখই পৃথিবী ও স্বর্গের সেতু।... দুঃখ এবং কষ্ট এক নয়... প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানের চক্ষে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যাহাকে আমরা দুঃখ বলি অনেক সময় তাহা হইতে আমাদের সুখেরও উৎপত্তি হয়।'[৩১]

রবীন্দ্রনাথও লেখেন : 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে— অর্থাৎ

আনন্দ হইতেই এই সমস্ত-কিছু জন্মিতেছে এ কথা যেমন সত্য, 'স তপোঽ-তপ্যত' অর্থাৎ তপস্যা হইতে, দুঃখ হইতেই সমস্ত-কিছু সৃষ্ট হইতেছে, এ কথা তেমনি সত্য।'[৩২]

দ্বিজেন্দ্রনাথ "সামাজিক রোগের পারিবারিক চিকিৎসা"য় প্রথমেই বীণার পাঁচটি তারের প্রসঙ্গে যে গুণ, দোষ, বৃত্তি, ভূত বা সমাজের দলত্রয়ের উল্লেখ করেছেন তা 'পঞ্চভূত'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্য একটি রচনা থেকেও উদ্‌ধৃতি বা বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে যার সুর পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথেও পাই :

> প্রকৃত বৈরাগ্য সংসারের কোন কর্তব্য সাধনেরই প্রতিবন্ধকতা করে না —তাহা দূরে থাকুক, সেইরূপ বৈরাগ্য কর্তব্যসাধনের পথ আরও পরিষ্কার করে দেয়। বৈরাগ্য অভ্যাস আর কিছুই নয় মনের সুর বাঁধা ; সেতারের সুর বাঁধা থাকিলে তাহাতে যে রাগিণীর ইচ্ছা, সেই রাগিণী বাজানো যাইতে পারে তেমনি অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সুর বাঁধা থাকিলে— যখন যাহা কর্তব্য তাহাই সুচারুরূপে নির্বাহ করা যাইতে পারে।···
>
> প্রকৃত বৈরাগ্য নিষ্কামকর্মের মূল প্রবর্তক ; আর যে বৈরাগ্য কর্তব্য-সাধনের প্রতিবন্ধকতা করে সে বৈরাগ্য বৈরাগ্যই নহে— তাহা বৈরাগ্যের ভানমাত্র।[৩৩]

অনুজের প্রতি দ্বিজেন্দ্রনাথের তদ্গত স্নেহ লক্ষ করা যায়। পরিবারের কথা বলতে গিয়ে তিনি একবার বলেন : 'আমাদের family motto কি জান ; work will win, রবি সেটা literally পালন করেছেন। আমাদের ভাইদের মধ্যে রবিই সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সতু নিরীহ ছেলেমানুষ, রবি active আর আমি কিছু না।'— এই বর্ণনায় কবির আত্মমূল্যায়ন যথার্থ নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই প্রতিবেদনের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর অনুজের বহুমুখী মনোযোগের দিকে সস্নেহ ঔৎসুক্য নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন। এই ঔৎসুক্য কেবলমাত্র স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের প্রতি নয়, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রতিও নিবদ্ধ।'[৩৪]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই বিখ্যাত সেই দক্ষিণ বারান্দার অধিবাসী। জ্যেষ্ঠের সঙ্গে কনিষ্ঠের ব্যবধান দুই দশকের। সময়ের এই দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও এঁদের দুজনের সাধনপথের পৌনঃপুনিক পারম্পরিকতায়

কোনো বাধা ঘটে নি। দ্বিজেন্দ্রনাথের ঔদার্য এবং ক্ষমাগুণ গল্পকথার মতোই। তাঁর প্রীতির রসে সিঞ্চিত হন নি এমন আশ্রমিক শান্তিনিকেতনে একজনও ছিলেন না। আশ্রমের এই পুণ্যচ্ছায়াতলে এবং আপন আদর্শে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা। এ কথাও ঠিক আশ্রমিক বড়োদাদার সঙ্গে আশ্রমের গুরুদেবের যোগাযোগ কোনো প্রাত্যহিক আনন্দযোগের ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় নি।

প্রদত্ত তথ্য ও সমীক্ষণ-চেষ্টা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা অসংগত নয় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজের কাছ থেকে কখনো অগোচরে, কখনো বা অব্যবহিত প্রত্যক্ষতায়, কখনো বা সহজ প্রতিযোগীর ভূমিকায় তাঁর আত্মপ্রস্তুতি ও শিল্প-সিদ্ধির দীক্ষা নিচ্ছিলেন। সন্দেহ নেই, উনিশ শতকের শেষ মুহূর্তে ও বিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকেই কবিধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক হয়ে পড়েন। সেই পথ আরো জটিল 'আত্মপ্রতিবাদের ঐক্য' তথা স্বভাব ও বিশ্বের দুরান্বয় সাধনায় বিচিত্রিত হয়ে উঠেছে। তবু ভিত্তিনির্মিতির পর্বে দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রমানসে যে নানামুখী অভিঘাত রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী-কালেও তার রেশ রয়ে গেছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ উনিশ শতকে যাত্রা শুরু করে বিশ শতকে এসেছেন। তার ফলে আমাদের শতাব্দীতেই দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রকৃত এবং সর্বাঙ্গীণ মূল্যায়ন সম্ভব। তাঁর প্রভাব কেবলমাত্র রবীন্দ্রমানসেই অনুভূত হয়ে নিঃশেষিত হয়ে যায় নি; আধুনিক কালের স্নায়ুমণ্ডলীতে এবং ভবিষ্যৎ কালের ভাবুকতায় তাঁর আবেদন ক্রমশই আরো স্বীকৃত হতে থাকবে বলে মনে হয়।

৬

কবি

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় পরবর্তী কালে দর্শনচিন্তা প্রাধান্য পেলেও কম বয়সে কবিতা রচনা বা কাব্যসাহিত্যই তাঁর মনকে বিশেষভাবে টেনেছিল। স্মৃতিকথায় এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন : 'আগে বরাবর আমি বাংলায় কবিতা লিখিতাম। কবিতা রচনার দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল।'[১] এবং বাল্যকালেই যে তাঁর 'যথার্থ কবিতার mood' ছিল তাও তিনি মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ পরে তিনি দর্শন নিয়েই বেশি ভেবেছেন। তাঁর প্রধানতম কাব্য 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' এই সময়ে লিখিত। দার্শনিক রচনাগুলিতে তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা প্রকাশিত। সেখানে দর্শনের আড়ালে তাঁর কবিসত্তা প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে। কিন্তু যিনি তাঁর কাব্যের সঙ্গে পরিচিত তিনিই জানেন কবি হিসেবেই তাঁর মৌল সার্থকতা। তিনি যদি একটিও প্রবন্ধ না লিখতেন তবুও বাংলা সাহিত্যের আসরে—সাধারণ পাঠকের বিশেষ পরিচিত না হয়েও—উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো বিরাজ করতেন।

'মেঘদূত'-এর বাংলা অনুবাদই যতদূর জানা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা। এই কাব্যগ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ। কাজেই এর রচনাকাল আরো আগে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' বহু পরের রচনা। এ গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৮৭৫। সৃষ্টি হয়েছে সম্ভবত ১৮৭৩-এর আগেই। কেননা এই গ্রন্থের রচনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন : 'আমি যখন প্রথম "স্বপ্নপ্রয়াণ" রচনা করিতে আরম্ভ করি তখন কোনও কোনও অংশ বঙ্কিমবাবুকে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহার বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিবার জন্য।... আমার পুস্তকে কতকগুলি কাল্পনিক ছবির সমাবেশ ছিল। বঙ্কিমবাবু বোধহয় সেগুলি ছাপান নাই... কিন্তু তাঁহার বিষবৃক্ষের মধ্যে ঠিক সেই রকম ছবির অবতারণা করিয়া বসিলেন।'[২] এর থেকে স্বভাবতই এই অনুমান করা অন্যায় হবে না যে 'বঙ্গদর্শনে' 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত হবার পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রনাথ 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' রচনা করেছিলেন।[৩]

'স্বপ্ন-প্রয়াণ' আজ পর্যন্ত সাধারণ পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয় নি এ কথা সত্য কিন্তু এটি একটি বহু-সমালোচিত কাব্য। বেশ কয়েকজন সমালোচক তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে এর বিচার করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথম পথিকৃতের দাবি করতে পারেন প্রিয়নাথ সেন। তাঁর সমালোচনা কবির নিজের কাছেই —'পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় ছিল'। কবি তাঁর কাছে মতামত জানতে উৎসুক :

> আমার সাধের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'টিকে তোমার ক্রোড়ে সঁপিয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত। সমালোচনার কিরূপে গোড়া ফাঁদিয়াছ— আমার বড্ড দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ধীরে সুস্থে যেমন চলছে— চলুক ; তুমি যখন আমার মানস পুত্রটিকে সভারঞ্জন বেশে সাজাইয়া গুজাইয়া আসরে নামাইবে তখন দর্শক-মণ্ডলীর আনন্দ করতালি আমার শ্রবণে সুধাবর্ষণ করিবে— এই আশায় আমি কৌতূহলের বেগ সম্বরণ করিয়া দিন গুণিতেছি— Green roomএ উঁকি দিয়া তোমাকে অপ্রস্তুত করিব না।
>
> তোমার চিরানুরক্ত চাতক দ্বিজ।

এখানে 'চাতক' শব্দটি লক্ষণীয়। এই শব্দের ব্যবহার তাঁর গভীর কৌতূহলের পরিচায়ক।

দ্বিজেন্দ্রনাথ অনুবাদকে মৌল সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই তাই বোধহয় অনুবাদ-কাব্য। 'মেঘদূত'-অনুবাদের ফলশ্রুতি আছে 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'। মেঘদূতের অনুবাদ তাঁর কাব্যচর্চার সহায়ক ঘটনা। এবং আমাদের মনে হয় তিনি যেন ঠিক স্বভাব-কবি নন। তাঁর কবিতায় যা আমাদের কাছে সাবলীল বলে মনে হয় তা যেন একটি অনুশীলিত ব্যাপার। তাঁর কবিতার স্বতঃস্ফূর্তি অনেক আঙ্গিক ও চিন্তার স্তর পার হয়ে এসেছে। এই অনুশীলিত কাব্যস্ফূর্তি কবিমানসের প্রযত্নের দ্বারা পরিমার্জিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতা দ্বিজেন্দ্রব্যক্তিত্ব থেকে মুক্তি নিয়েছে। মানুষ হিসেবে তিনি যে-সমস্ত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন— কবি হিসেবে সেই-সব সিদ্ধান্ত থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ব্যক্তি হিসেবে তিনি খুবই প্রত্যয়ী হলেও তাঁর কবিতার বিশ্বাস আলো-আঁধারী বিশ্বাস। তাঁর কাব্যে অজস্র রূপক আছে। এবং তাঁর কবিতার এই রূপক একটি প্রশ্নময় রূপক। সেগুলি তত্ত্বের দ্বারা আবৃত নয়। প্রচলিত রূপক তত্ত্বকে বহন করে কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের

কাব্যের রূপক রহস্যনির্ভর। রূপকগুলি প্রতীকধর্মসম্পন্ন, যার ফলে রূপকগুলি কাব্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয় নি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ রূপকের নবজন্ম ঘটিয়েছেন। তাকে গদ্যের এলাকা থেকে সরিয়ে এনে কবিতায় আধারিত করেছেন। তাকে কেবলমাত্র গদ্যের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। রূপক হচ্ছে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ— কিন্তু তিনি তাঁর রূপকগুলিকে ছবির সাহায্যে ঘিরে দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতা তাই ব্যঞ্জনানির্ভর, ব্যাখ্যানির্ভর নয়। বক্তব্যকে তিনি প্রকটিত না করে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতায় sophistication বা পরিশীলন ধর্ম আছে। (ব্যক্তিজীবনের প্রাত্যহিক প্যাটার্নে তিনি আদৌ তথাকথিত অর্থে sophisticated ছিলেন না) তাই দেখা যায় তিনি সব কথা খুলে বলেন নি। বিশদ বিবৃতির পরিবর্তে তির্যক সংবৃতিই কবির বক্তব্য বা বেদনাকে পরিস্ফুট করেছে। metaphysics তাঁর কবিতায় যে সমস্যা তুলে ধরেছে তা যেন শিল্পেরই সমস্যা।

'স্বপ্ন-প্রয়াণ' সর্বতোভাবে একটি রূপক কাব্য। ইংরেজি সাহিত্যে দুখানি রূপক বহুখ্যাত— একটি পদ্যে স্পেনসারের (১৫২২-৯৯) *The Fairie Queen*, অন্যটি গদ্যে বানিয়নের (১৬২৮-৮৮) *The Pilgrim's Progress*, from this world to that which is to come। প্রিয়নাথ সেন, কানাই সামন্ত, প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতি অনেক সমালোচকই এই তিনটির ভিতর সাদৃশ্য দেখেছেন এবং এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

'স্বপ্ন-প্রয়াণে'র অল্প পরবর্তী সময়েই বহু রূপক কাব্য রচনার প্রয়াস লক্ষিত হয়। তাই 'বাংলা ভাষায় 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'ই একমাত্র রূপক কাব্য'[৪] সমলোচকের এই উক্তি ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। তবে এই রূপক কাব্যটি অন্যান্য কাব্যের তত্ত্বসর্বস্বতাকে ছাপিয়ে গিয়েছে একটি রসরহস্যমূল্যে, এ কথা সত্য।

একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে রচিত শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের নাটক 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়'-এর সঙ্গে এর সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। সুতরাং এ কথা মনে করা অন্যায় হবে না এ নাটকটি[৫] তাঁর পড়া ছিল। এ ছাড়া ঈশ্বর গুপ্তও 'বোধেন্দুবিকাশ' নামে এর যে অনুবাদটি করেন সেটিরও কিছু প্রভাব তাঁর কবিতার রূপক চর্যায় উপস্থিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যে রূপকগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতীকনির্ভর হয়ে উঠেছে। কখনো কখনো দুটি রূপক নিয়ে তিনি একটি প্রতীক গড়ে তুলেছেন। ‘পুষ্প সে যে হৃদয়ের দর্পণ’— পুষ্প ও দর্পণ এখানে এই দুই রূপকের মধ্যে দিয়ে, তাদের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, তিনি একটি প্রতীককে তুলে ধরেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের রূপক সম্বন্ধে মনোভঙ্গি ব্লেককে (১৭৫৭-১৮২৭) মনে পড়িয়ে দেয় :

> Allegory addressed to intellectual powers, while it is altogether hidden from corporal understanding, is my definition of the most sublime poetry.'

দ্বিজেন্দ্রনাথ রূপকগুলিকে জীবনরহস্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁর কবিতাতে প্রতীক প্রাধান্য লাভ করেছে। রূপক হয়ে উঠেছে আপেক্ষিক। তিনি যেন বিশ্বচরাচরকেই প্রতীক হিসেবে দেখেন। স্বপ্ন ও প্রতীককে এক করে দিয়ে তাদের মধ্যে বাস্তবতার প্রতিভাস খুঁজেছিলেন।

অবশ্য তিনি মালার্মের (১৮৪২-৯৮) মতো নামকরণে বা চূড়ান্ত প্রতীকে বিশ্বাস করতেন না। মালার্মে মনে করতেন : “To suggest is to create, to name is to destroy।” দ্বিজেন্দ্রনাথ কিন্তু নামকরণ ব্যাপারে একটু প্রাচীনপন্থী। তিনি প্রতীকের ব্যাপারে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ঘরানাকে আধুনিক সাহিত্যে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন।

‘স্বপ্ন-প্রয়াণ’ রচিত হবার প্রায় দুশো বছর আগে রচিত হয় জন বানিয়নের *The Pilgrim's Progress* (যার উপনাম under the similitude of a dream)। বানিয়ন স্বপ্নের ভিতর পরিচিত জগতের প্রতিবিম্ব দেখতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁকে ঠিক প্রতীকপন্থী বলা যায় না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রতীকের সাহায্যে আমাদের ধারণাগুলিকে প্রতিবিম্বিত করতে চেয়েছেন। প্রতীকের খাতিরে অনেক সময়েই তাঁকে ব্যক্তিজীবনের কিছু কিছু সংবাদ বর্জন করতে হয়েছে। শিল্পী হিসেবে দ্বিজেন্দ্রনাথ বিচিত্রপথসঞ্চারী। তাই প্রতি সর্গেই তিনি নতুন নতুন প্রতীক ব্যবহার করেছেন। সাত্ত্বিকী, তামসী, রাজসী প্রভৃতি রূপকাশ্রিত চরিত্রগুলি ত্রিমূর্তী সংখ্যাধর্মী প্রতীক (numerical symbolism)-এর সহায়তায় প্রকাশিত। তিনি তাদের ব্যাখ্যা-ধর্ম লুপ্ত ক'রে তাতে রহস্যময়তা আরোপিত করে তাকে আশ্চর্য মানবিক করে

তুলেছেন। কোনো abstract বৃত্তি সেখানে বড়ো হয়ে ওঠে নি। কবি মানবিক মনের বৃত্তিগুলিকেই চরিত্রায়িত করেছেন। সব চরিত্রই কবি-নায়কের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। প্রস্তাবনায় যা স্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে— পরে তা দিব্য-দৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

আধুনিক প্রতীকবাদীরা প্রতীকের উপর বিচ্ছিন্নভাবে জোর দিয়েছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ তা করেন নি। নারী, ফুল, অন্ধকার প্রভৃতি প্রতীক জীবন থেকেই গৃহীত। এ সবই তাঁর কাব্যে সুষমামণ্ডিত। তিনি প্রতীককে কখনো জীবন থেকে আলাদা করে নেন নি।

আত্মজীবনীর মধ্যে নাটকীয়তার যে বিশেষ ভূমিকা আছে এখানে তার পরিচয় পাওয়া গেল। এই কাব্যে দ্বিজেন্দ্রনাথই নায়ক :

ভাতে যথা সত্য-হেম, মাতে যথা বীর,
গুণ জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির!
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি
সেই দেবনিকেতন আলো করে কবি ॥[৬]

বানিয়নের মানুষ পাপের বোঝা নিয়ে একটা জায়গায় পড়ে গেছে— slough of despond বা কর্দমাক্ত বিবরে। দ্বিজেন্দ্রনাথ তৃতীয় সর্গে এভাবে ব্যক্ত করেছেন : 'পঙ্কে পাছে পড়ে পদ শঙ্কে বারে বারে।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ পাপবোধকে বানিয়নের মতো তীব্রভাবে আঁকেন নি ; কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধতর করে তুলেছেন। তাঁর abstract ব্যাপারগুলিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ concrete করে তুলেছেন। বানিয়নের অঙ্কিত একাধিক চরিত্র মিলিয়ে সেখানে দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি চরিত্র এঁকেছেন। এবং সেখানে তখন চারিত্রিকতা অপেক্ষা চরিত্রই বড়ো হয়ে উঠেছে। *Pilgrim's Progress*-এর Peril ও Dragon মিলিয়ে 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর 'অত্যাচার-পিশাচ' Hunger এবং Darkness 'মারী-নিশাচরী', আবার nakedness-এর সুন্দর রূপান্তর ঘটেছে 'লালসা'তে। বানিয়নের রচনায় যে সর্বনাশের চিত্র তাকে আরো গাঢ় করে তুলেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। তাঁর city of destructionকে গ্রহণ করে তিনি তার মধ্যে নিবিড়তার শিল্পরূপ আরোপ করেছেন। বানিয়ন পাপের প্রতিবিধানে ব্যস্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথ অমঙ্গলের মধ্যেই সৌন্দর্যকে দেখেছেন।

এর উদাহরণ হিসেবে 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্যের চতুর্থ সর্গের ১৮-২৮ স্তবক-

পরম্পরা স্মরণযোগ্য। এই অংশে কবি অনিকেত মানুষের নিঃসঙ্গতার নিহিত সৌন্দর্য দেখাবার জন্য একটি গার্হস্থ্য স্থাপত্যের ধ্বংসময় রূপ দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' গদ্যকাব্যের 'পুরনো বাড়ি' কথিকাটিতে যেমন অমঙ্গল-আশ্রিত অথচ সৌন্দর্যময় চিত্রকল্পের উদাহরণ উপস্থাপিত করেছেন, সে-রকমই রবীন্দ্রনাথের আগেই দ্বিজেন্দ্রনাথ কাব্যের এই অংশে ভঙ্গুর স্থাপত্যের সম্ভ্রান্ত সৌন্দর্য দেখিয়েছেন :

দেখা দিল অট্টালিকা মহাশয়,
পার্শ্ব পড়িতেছে ভাঙ্গি, উচ্চশিরে মহত্ব শিখায়!
ভাঙ্গা জানলায়
বায়ু ফুসলায়
আছেন কালপেচক আমের মাথায়॥

এখানে ক্ষয়িষ্ণু স্থাপত্যের প্রতীক ব্যবহার করে মানুষের অসহায় নিঃসঙ্গতার মধ্যেও এক বিশেষ ধরনের সৌন্দর্য দেখিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। *Pilgrim's Progress*-এর দ্বিতীয় সর্গে বানিয়ন-কৃত মৃত্যু-উপত্যকার বর্ণনা :

When they had passed by this place, they came upon the borders of the shadow of Death, and this valley was longer than the other ; a place also most strangely haunted with evil things... they thought that they heard a groaning as of dead men ; a very great groaning···

So they went on a little further, and they thought that they felt the ground begin to shake under them, as if some hollow place was there.

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর পঞ্চমসর্গের রসাতল-প্রয়াণ অংশে এই মৃত্যু-উপত্যকার বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর থেকে প্রেরণা নিয়েছেন ঠিকই তবে বানিয়ন-অঙ্কিত চরিত্রগুলিকে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তাতে মানবিকতা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছেন। এখানে মানব-জীবনে অমঙ্গলের আবির্ভাবের একটা ছবি আছে। কিন্তু সেই অমঙ্গলের মধ্যে থেকেও সৌন্দর্য জন্মলাভ করতে পারে। রসাতল-প্রয়াণের প্রথম তিন স্তবক উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিতার নিদর্শন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ এখানে অন্ধকারের আশ্চর্য রূপ বর্ণনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'শিখাসজ্ঞ' অন্ধকারকে গাঢ়তর করে যেভাবে তার রূপের সম্পূর্ণতা এনে দিয়েছে; বানিয়নের fire চরিত্রে সে বর্ণিমা নেই।

কোনো ধার্মিকতার আড়ম্বর দ্বিজেন্দ্রনাথ সহ্য করেন নি। ধর্মতত্ত্বের বক্তৃতায় সাত্ত্বিক ও তামসিক বৃত্তিকে জড়িত করে দিয়েছেন— এ জিনিস রবীন্দ্রনাথ পরে তাঁর 'যাত্রিক' প্রবন্ধে করেছেন। অকল্যাণকে একটা বিশেষ সৌন্দর্য দেবার জন্য তাঁর যাত্রাপথের যন্ত্রণা অনেক লঘু হয়ে গেছে। কোনো বিশেষ theoryকে বড়ো করে তোলার জন্য তিনি জীবন-রসকে ক্ষুণ্ণ করেন নি।

বানিয়নের চিত্রকল্প রূপকাশ্রিত; অভিজ্ঞতাকে তিনি রূপকের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। তাঁর রূপক ব্যাখ্যা-নির্ভর। আর দ্বিজেন্দ্রনাথ কেবল আলেখ্য রচনা করেন নি; আলেখ্যের ভিতরে জীবনের অভিজ্ঞতাকে আনতে পেরেছেন।

মধ্যযুগীয় ইংরেজি সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি স্পেন্সর (১৫২২-৯৯)-এর অসমাপ্ত কাব্য Fairy Queen [Fairie Queene] দ্বারাও দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

এই কাব্যে স্পেন্সর জীবনের একটি রূপ ধরে দিয়ে গেছেন। কবি তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বকে আশ্চর্যভাবে প্রচ্ছন্ন রাখার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। বানিয়নের উদ্দেশ্যপন্থী মনোভাব তার বক্তব্যকে প্রচ্ছন্ন রাখে নি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের লক্ষ্য স্পেন্সরের রহস্যময়তা। জয়দেবের মতোই লোকসভা থেকে উপকরণ নিয়ে তাকে দরবারী করে তুলেছেন স্পেন্সর। কবি নিজের কথা বললেও অনেক সময়েই কবির 'আমিত্ব' ব্যাপারে পাঠকের সন্দেহ জাগে। কবি আত্মকথা বললেও নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। শেক্সপীয়রের সনেটও এই একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। মধ্যযুগীয় ধারণানুযায়ী হৃদয়ের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লেই কবির যেন সম্মানহানি ঘটত।

স্পেন্সরের ব্যক্তিত্ব আলোচনা করতে গিয়ে কোলরিজ এক জায়গায় তাঁর 'কমনীয়তা গুণে'র উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যের অনেক জায়গাতেই আমরা এর সন্ধান পাই।

এক ব্যক্তি-চরিত্রের মধ্যে নানামুখী ভঙ্গি সঞ্চার করেছেন স্পেন্সর। তাঁর রচনাতেই প্রথম একজন মানুষ অনেক মানুষ রূপে চিত্রিত। Fairy Queen-এ

আর্থার আর এলিজাবেথের প্রেমের কাহিনী। এলিজাবেথ রানী এবং নারী। একাধারে লৌকিক ও রূপকথার নায়িকা। তাঁর একটি সত্তা মহিমা বা Magnificence ; অন্য একটি সত্তা Divine grace বা দিব্য করুণা। নায়ক আর্থার জীবন্ত।

যা ঐতিহাসিক সত্য তাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন স্পেন্সর। জীবনের বাস্তবতা তাঁর কাছে স্বপ্নরূপ পেয়েছে। 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'র মনোরাজ্য-প্রয়াণে তিন, চার, পাঁচ স্তবকের মাধ্যমেই বাস্তবকে স্বপ্নের আচ্ছাদন দেওয়া হয়েছে। এটা স্পেন্সরীয় পদ্ধতি। স্পেন্সরের কাব্যে স্বপ্নের আবরণ সরিয়ে ফেললেই মানব-মানবীর দেখা পাওয়া যাবে। মধ্যযুগীয় রহস্যময় স্থাপত্য তাঁর কাব্যশরীর জুড়ে রয়েছে। স্পেন্সর বিশ্বাস করতেন রূপকথার সাহায্যে আমরা আমাদের জীবনের realityকেই প্রকাশ করি। আমাদেরই জীবনের দুঃখ আনন্দ রূপকথাতে রয়েছে। তাঁর কাব্যে অলৌকিক বাস্তবতাকে অপরূপ রূপকথার আচ্ছাদন দেওয়া হয়েছে। 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'র ষষ্ঠ সর্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্পেন্সরের life ও death এবং health ও sickness-এর সংগ্রামকে গ্রহণ করেছেন। জীবনের সংগ্রামকে প্রকাশিত করতে হবে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। Realityকে illusion হিসেবে নেবার পদ্ধতিই তিনি গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাব্যের knight ও lady দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রমদ প্রমদা। স্পেন্সর-কাব্যের নিসর্গচিত্রের প্রভাবও আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যে দেখি :

নদী যবে একটানে
বহে সাগরপানে—
...

এ ছবি যেন স্পেন্সর থেকে নেওয়া।

আরো একজনের কাব্যের প্রভাবও তাঁর কাব্যে দেখা যায়। তিনি দান্তে (১২৬৫-১৩২১)। বিখ্যাত দার্শনিক শেলিংয়ের মতে দান্তে পৃথিবীর প্রথম আধুনিক কবি যিনি নিজের জীবন ও সময়ের মধ্যে থেকে তাঁর কবিতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথও তাঁর কাব্যে নিজের জীবনের একটি কাব্যরূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ একসঙ্গে দান্তে অধ্যয়ন করতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন 'ভারতী' সম্পাদন করেন তখন সতেরো বছরের রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকায়

যে প্রবন্ধ[৭] লেখেন তা দ্বিজেন্দ্রনাথ -কর্তৃক পরীক্ষিত হয়। প্রবন্ধের নাম 'বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য'। বিয়াত্রিচে দান্তের কাব্যের ও জীবনের নায়িকা। রবীন্দ্রনাথ দান্তের জীবনের সুরটি ধরার চেষ্টা করেন। দান্তে-রচিত *Divina Kommedia* শুধু মধ্যযুগের নয়, সারা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য। বিয়াত্রিচের সঙ্গে বিচ্ছেদ এখানে আশ্চর্য দিব্যরূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'বিয়াত্রিচেই তাঁহার সমুদয় কাব্যের নায়িকা বিয়াত্রিচেই তাঁহার জীবন-কাব্যের নায়িকা। বিয়াত্রিচেকে বাদ দিয়া তাঁহার কাব্য পাঠ করা বৃথা। বিয়াত্রিচেকে বাদ দিলে তাঁহার জীবন-কাহিনী শূন্য হইয়া পড়ে। তাঁহার জীবনের দেবতা বিয়াত্রিচে, তাঁহার সমুদয় কাব্য বিয়াত্রিচের স্তোত্র। রূপক প্রভৃতির দ্বারা বিয়াত্রিচেকে দান্তে এমন একটি মেঘময় অস্ফুট আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন যে পাঠকের চক্ষে সেই অস্ফুট মূর্তি অতি পবিত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়।'[৮]

এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন দ্বিজেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে। দান্তের নরকের (inferno) বর্ণনা মধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অষ্টম সর্গে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নরকের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন মধুসূদনের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ শুধু বিহারীলাল থেকে নয় মধুসূদন থেকেও সূত্র খুঁজেছিলেন। নরকের নিসর্গ দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়কেই আকৃষ্ট করেছে। নরক বর্ণনা প্রসঙ্গে দান্তে 'কেরন' 'আকেরন' (রক্তভরা নদী) এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। মধুসূদন এ দুটি নামের বাংলা করেছেন কৃতান্তচর ও বৈতরণী। দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে তা শমন ও রুধিরের হ্রদ। আর বিয়াত্রিচেকে করেছেন 'দ্যুলোকরমণী'।

দান্তের কাব্যে আলো-অন্ধকারের পারম্পরিকতার ছন্দ। তিনটি শক্তির কথা দান্তে বলেছেন vision, love এবং light। এই তিনটির আক্ষরিক অনুবাদ 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'র সপ্তম সর্গ ১০৯ সংখ্যক স্তবকে পাওয়া যায়— তত্ত্ব, প্রেম ও আলো। নরকের অরণ্য থেকে মহা দিগন্তের দিকে যাত্রা করেছেন দান্তে— তার প্রভাব পড়েছে সপ্তম সর্গ, ১২৪-সংখ্যক স্তবকে:

> খুলি-গেল দিগন্ত সকল-দিকে,
> পর্বত— পাথার— ব্যোম দেখা দিল এটে নিমিখে!

কবি কুতূহলী
অচল পুত্তলি,
বলিল 'কি স্বর্গভোগ আঁখির আজিকে।

দান্তের ভাবানুবাদ করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। দান্তে বলেছেন: 'The love that moves the sun and the other stars'. সে জায়গায় দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন: 'আনন্দে সবে আনন্দে / তোমার চরণ বন্দে / কোটি সূর্য কোটি চন্দ্র তারা।' প্রেমের হাতেই সূর্য, চন্দ্র তারা আবর্তিত বিশ্বদেবতাকে ঘিরে। এভাবেই ইয়োরোপীয় বোধ রূপান্তরিত হয়েছে ভারতীয় মঙ্গলভাবনায়। দান্তে প্রেমের মধ্যে আকাঙ্ক্ষার মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন, স্বর্গের মধ্যে নিজেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে একটি মাঙ্গলিকতা ও আনন্দে লীন করে দিয়েছেন। দান্তে আত্ম-লীনতার স্তোত্র গড়ে তুলেছেন, দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যে আত্মলীনতা শেষ হয়েছে আত্মনিবেদনে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের এই আনন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আনন্দের একটি সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে আনন্দ অভিজ্ঞতার আস্বাদন। দান্তের কাব্যে ব্যক্তিগত প্রেমের ব্যাপ্তি। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রেমকে আনন্দে পরিণত করতে গিয়ে ভারতীয় মনোধর্ম আরোপ করেছেন। তাঁর কাব্যে শেষে এক রহস্যময় ভগবৎ বিশ্বাসের ছবি পাওয়া যায়।

দান্তে কিন্তু বিয়াত্রিচেকেই ঈশ্বরী করে তুলেছেন। এজরা পাউণ্ড লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'তে দান্তের Paradise-এর ছবি আছে। 'গীতাঞ্জলি' পূর্ব পর্বে একটা বঙ্কিম পথের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'তে আনন্দকে আবিষ্কার করেছেন। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এ যেন 'গীতাঞ্জলি'-র এই পূর্বসূত্র আছে। আনন্দ, প্রাপ্ত অমৃত নয়— অর্জিত অভিজ্ঞান— এই অর্জনের ইতিহাস 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এ। দুই কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ও দান্তে জীবনকে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে কাব্যের আশ্রয় নিয়েছেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে দান্তে, বানিয়ন ও স্পেন্সর এই তিন কবিরই প্রভাব পড়েছে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এ। তিন বিভিন্ন ধারা এখানে সামঞ্জস্য লাভ করেছে। তিনজনের প্রভাবকে তিনি সমীকৃত করেছেন। ব্যক্তির

জীবন-নাট্যের ধারা দান্তের কাব্যে, বানিয়নের কাব্যে জীবনের উত্তরণের ধারা, আর স্পেন্সরের কাব্যে মানব মনের জটিলতার ধারা। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই তিনটি ভিন্ন ধারাকে তাঁর কাব্যে মিলিয়ে দিয়েছেন। এই তিনজনের কাছেই তিনি ঋণী।

তবে দান্তের প্যাটার্নকে গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত প্রেমকেই একমাত্র সত্য বলে তিনি মনে করেন নি। তিনি অ-প্রেমের ওপরও জোর দিয়েছেন। জটিল মনোভঙ্গি বা স্বপ্নের আধারে জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে পরিবেশন করতে পারে এই প্রকাশ-রীতি স্পেন্সরের। তা দ্বিজেন্দ্রনাথও নিয়েছেন। তাঁর মনোরাজ্য-প্রয়াণ, প্রথম সর্গ আপাতদৃষ্টিতে মায়ালোক। বানিয়ন মনে করতেন প্রেম-অপ্রেমের মধ্যে দিয়ে জীবনের যাত্রাপথ চলে গেছে। বানিয়নের মতোই দ্বিজেন্দ্রনাথও তীর্থযাত্রীদের তীর্থে পৌঁছে দিয়েছেন কিন্তু তীর্থ বা পরিণামাপেক্ষা যাত্রাপথই তাঁর কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে।

তিন বি-সম মধ্যযুগীয় কবিকে মিলিয়ে জীবন সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথের একটা নাট্যময় উপলব্ধি গড়ে উঠেছিল। তাঁর কাব্যে তাই একটি নিহিত নাট্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়। নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং নাটকীয় প্রকরণ কবিতার আড়ালে থেকে গেছে। তিনি 'স্বপ্ন-প্রয়াণে' যে নাট্যগতি এনেছেন, সেটি যেন এভাবে বিন্যস্ত করে দেখানো যায় :

১ম সর্গ	মনোরাজ্য-প্রয়াণ	exposition	বা	উন্মোচন
২য় সর্গ	নন্দনপুর-প্রয়াণ	rising action	বা	বর্ধিষ্ণু ঘটনাবেগ
৩য় সর্গ	বিলাসপুর-প্রয়াণ	climax	বা	উত্তুঙ্গ মুহূর্ত
৪র্থ সর্গ	বিষাদপুর-প্রয়াণ	falling action	বা	ক্ষীয়মান ঘটনাবেগ
৫ম সর্গ	রসাতল-প্রয়াণ	catastrophe	বা	অন্তিম বিপর্যয়
৬ষ্ঠ সর্গ	সমর-প্রয়াণ	catharsis	বা	পরমা নিষ্কৃতি
৭ম সর্গ	শান্তি-প্রয়াণ	epilogue	বা	উপসংহার

দ্বিজেন্দ্রনাথের গল্পের শুরু মনোরাজ্য-প্রয়াণে। জীবনের যাত্রাপথ, আলো-আঁধারি, অনির্দিষ্ট। জীবনের কোনো-একটি সন্ধিক্ষণে এসে জীবনের মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলতে হয়।

দ্বিতীয় সর্গে কবি তাঁর মানসীর কথা উল্লেখ করেছেন। কবি-মানসীর সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ— কাব্যনাট্যের ঘটনাবেগ যেখানে বেড়ে গেছে সেখানেই

বিচ্ছেদ। এখানে বাস্তবতার ছায়া পড়েছে। নন্দনপুর যেন এই মর্তের কোনো স্থান— utopia নয়।

তৃতীয় সর্গের গোড়াতে তিনি এনেছেন comic relief বা কৌতুকময় নিষ্কৃতি। এখানেও তিনি বড়ে বড়ো ট্রাজিডি-লেখকগণের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেছেন। ট্রাজিডিতে কোনো হাঁফ ছাড়বার মতো স্থান না থাকলে তা শ্বাস-রোধকারী হয়ে ওঠে। তৃতীয় সর্গে শৈশব-স্মৃতির উন্মোচন। অতীতের আমির সঙ্গে বর্তমান আমি যেন একটা যোগসূত্র খুঁজছে। এর আগে পর্যন্ত কবি নিজের দিকে ফিরে তাকান নি।

চতুর্থ সর্গে অর্থাৎ বিষাদপুর-প্রয়াণে নাটকের গতি মন্দীভূত হয়েছে। কবি লক্ষ করেছেন অতীত ও বর্তমানের আমি একসূত্রে বিধৃত নেই— এই বোধ থেকে বিষাদ এসেছে। এই romantic anguish বা রোমান্টিক সন্তাপ তাকে কিন্তু নৈরাশ্যের মধ্যে ঘুরিয়ে মারে না। তাঁর এই বিষাদকে দ্বিজেন্দ্রনাথ শিল্পে পরিণত করেছেন। তাঁর এই বিষাদ যেন রোম্যান্টিক নয় শিল্পে পরিবর্তিত হয়ে সে বলিষ্ঠতা লাভ করেছে। কেবলমাত্র সুখে তিনি তৃপ্তি পান নি। তাঁর মনে হয়েছে বিষাদের মধ্যেই মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে। এখানে সখ্যরস যন্ত্রণাকে ভাগ করে নিয়েছে। এবং এই বিভক্ত যন্ত্রণা যেন আনন্দ হয়ে উঠছে।

পঞ্চম সর্গ রসাতল-প্রয়াণে tragedy 'তীব্র নিখাদে' ঝংকার দিয়েছে। জীবনের ভয়ের দিককে তিনি দেখিয়েছেন এখানে। কিন্তু সখ্যরসের সঙ্গ ও সামীপ্যের ফলে কবি জীবনের ভয়াবহতার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস অর্জন করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ এখানে দেখিয়েছেন যে পরিপূর্ণ জীবন সত্যের মধ্যে ভয়েরও একটা স্থান আছে কিন্তু যখন তার মুখোমুখি দাঁড়ানো যায় তখন তা মানুষকে গ্রাস করতে পারে না। ট্রাজিডিতে করুণা ও ভয়ের মধ্য দিয়ে মনের ক্লেদ ধুয়ে যায়।

ষষ্ঠ সর্গ সমর-প্রয়াণে pity ও fear-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই কবি শান্তি-প্রয়াণে পৌঁছোতে পেরেছেন। এখন তিনি জীবনকে দেখবার একটি বিশেষ ভঙ্গি অর্জন করেছেন। চরিত্র জীবনকে নিজস্ব আলোয় দেখতে পারলে সহজেই তা জীবনকে অতিক্রম করতে পারে। তখন আর সে সীমাবদ্ধ নয়। শান্তি-প্রয়াণ যেন সংগ্রামের শেষ নয়। তা সংগ্রামের

উপহার যেন। শান্তি তো আসলে সংগ্রামের ভিতরে একটা সামঞ্জস্য। জীবন সংগ্রামে পূর্ণ হলেও মানুষ তারই ভিতর শান্তি চয়ন করে নিতে পারে। এখানে সপ্তম সর্গে, আমরা যেন কঠোপনিষদের সুর শুনতে পাচ্ছি। কঠোপনিষদের ভাবমূর্তি নিয়ে কবি দেখিয়েছেন শ্রেয় ও প্রেয় এই দুই পথের দ্বন্দ্ব মীমাংসিত হয় সাধকের হৃদয়ে। শান্তি-প্রয়াণে সমর্পণের ভার আসলে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিন্যাস। সেখানে চরিত্রগুলি বাঁচবার জন্য নিজেই একটা বিশ্বাস গড়ে তুলেছে।

তাঁর কাব্যপ্রকরণ আলোচনাসূত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষ দেখা যায়। তিনি কখনোই একটি বিশেষ মানসিক বৃত্তিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ করেন নি। 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'র আঙ্গিকেও এই দুই রীতির ছাপ দেখা যায়। একইসঙ্গে তাঁর কাব্যে গম্ভীর ও লঘু লয় কাজ করেছে। মধুসূদন বিলম্বিত লয়ের কবি। দেবেন্দ্রনাথ সেন দ্রুত লয়ের। দ্বিজেন্দ্রনাথই প্রথম এই দুটি সুর মিলিয়ে দিলেন; তাঁর কাব্য তাই শিল্পোত্তীর্ণ 'গুরুচণ্ডালী'। তিনি পাঠককে প্রস্তুত হবার অবকাশ না দিয়ে তাকে তার বিশ্বাসের অনুকূলে আকর্ষণ করেন— ছন্দোগত, শব্দগত এবং idiom-গত ভাবে। উনবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোনো কবির কাব্যজগতেই এই দুটি ভঙ্গি একই সঙ্গে সঞ্চারিত হয় নি।

তাঁকেই বোধহয় উনিশ শতকের প্রথম শিল্পী বলা যায় যিনি অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্তকে সমান সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পেরেছেন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য গতি। তার প্রতিটি মাত্রা সুপরিমিত (মীয়তে ইতি মাত্রা) হয়েও গতির নিয়মে বাঁধা। অক্ষরবৃত্তের বৈশিষ্ট্য ঘনীভবন (density) স্থিতিস্থাপকতা। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই দুটি ছন্দকে শুধু প্রতিষ্ঠিত করেন নি তাকে শাণিত ও পরিণত করেছেন। মাত্রাবৃত্ত স্পন্দনদ্রুতির (frequency) ছন্দ। এই ছন্দে :

> যথায় মহাবট। শিরে জট। অতি নিবিড়
>
> পালিছে চুপেচাপে। খোপে খোপে। অযুত নীড়।
>
> ২য় সর্গ ॥ ১১৯ ॥

এখানে একই পঙ্‌ক্তিতে মাত্রান্যাসের রূপভেদ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ এমনিতেই

যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ সূক্ষ্মগতির বৈচিত্র্য এনেছেন। আর মাত্রাবৃত্তের পরিসরেও গভীর স্থিতিগুণ এনেছেন। চতুর্থ সর্গের প্রথম স্তবকে :

করিয়া জয় | মহা প্রলয়
৩ ২ ২ ৩

সদ্যোক্ত ঘনীভবন ও স্পন্দনদ্যুতির মিলন তিনি অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত এই দুই ছন্দের ভিতর দিয়েই দেখিয়েছেন। মধ্যখণ্ডনের সাহায্যে তিনি থামিয়ে দিয়েছেন অনির্ণীত চলোর্মি, তাকে করে তুলেছেন স্থৈর্যময়। একটি উদাহরণ প্রাসঙ্গিক :

আনন্দে স | বে আনন্দে
তোমার চ | রণ বন্দে
কটি সূর্য কটি চন্দ্রতারা।—৭ম সর্গ

এ ভাবে শব্দকে বিভক্ত করে তিনি ধ্বনিগাম্ভীর্য বাড়িয়ে তুলেছেন। প্রায় পরক্ষণেই আবার একস্বরাত্মক (monosyllabic) শব্দের সাহায্যে সে অর্জিত গাম্ভীর্য তিনি চূর্ণ করে দিয়েছেন। চলোর্মির চঞ্চলতায় তখন যেন শব্দের নুড়ি-পাথরগুলি বেজে উঠেছে। এইরকম একটি উদাহরণ :

ঘা দিয়া হৃদয় মাঝে
মঙ্গল আরতি বাজে
পুণ্যগন্ধী সমীরে নাচায়।

তুলনীয় অন্য একটি অংশ :

হাঁ করিয়া আছয়ে প্রচণ্ড ঘর

অধোরেখ অংশগুলি যেন গাম্ভীর্যের সঙ্গে চাঞ্চল্যগুণের একটি সমন্বয়ের সৃষ্টি করেছে। এই রকম আরো কয়েকটি প্রকীর্ণ উদাহরণ :

'আ', 'উ' এবং 'হা', 'হু' (চতুর্থ সর্গ/স্তবক ২১ ও ৩৭), 'টু', 'এ', 'টি' (পঞ্চম সর্গ / স্তবক ১১২), 'সু' (ষষ্ঠ সর্গ / স্তবক ১০৬) প্রভৃতি একস্বরাত্মক শব্দগুলি বৈদিক স্তোভ-ধ্বনির রহস্যময় স্বরমণ্ডল রচনা করে। এইভাবেই 'সর্ সর্' (চতুর্থ সর্গ / স্তবক ২৭), 'দুপ্ দাপ্', 'ধুপ ধাপ্' 'হুড় মুড়' (চতুর্থ সর্গ / স্তবক ৩৪), 'ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্' (চতুর্থ সর্গ / স্তবক ৪২) প্রভৃতি ধ্বন্যুক্তি-ধর্মী (onomatopoeic) শব্দগুলি অনায়াসে প্রবেশ করেছে তার স্বরক্ষেপের স্বাচ্ছন্দ্যে, কাব্যের আবহাওয়া গতিচ্ছন্দকে ঋদ্ধ করে তুলেছে।

এই সূত্রে তাঁর স্তবকবিন্যাসের বৈচিত্র্যের কথা অবশ্য স্মর্তব্য। কেবলমাত্র প্রাচীন কবিতাতেই নয় দ্বিজেন্দ্রনাথের সমকালীন কবিতাতেও এই স্তবক-বৈচিত্র্য দেখা যাবে। কবির প্রতিটি mood বা মুহূর্তমর্জির সংগতি রেখেই যেন স্তবকগুলির এই বৈচিত্র্য। কোনো পূর্বনির্দিষ্ট গঠনশিল্পের তাগিদে নয়। মনে রাখা দরকার আরব কবিতার মধ্য থেকে উঠে এসে স্তবক ব্যাপারটি স্পেনের মধ্য দিয়ে যখন ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল তখনো স্তবকের মধ্যে গতি ও স্থিতির সমন্বয় ঘটে ওঠে নি। সেমিটিক রূপকল্প ('বয়েৎ') বা ইয়োরোপীয় কবিতার stanza বলতে বোঝাত একটি সুনির্দিষ্ট ভাববস্তুর আশ্রয়। সংস্কৃত কবিতার শ্লোক'ও ছিল অতিনিরূপিত ভাবাবেগ বা বক্তব্যের মিতালেখ্য (miniature) প্রতিম। সেদিক থেকে দেখলে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্তবক-প্রকল্পটি দুঃসাহসিক নবত্বে পূর্ণ। পয়ার শব্দটিও তাঁর কাছে যেন মধ্য-যুগের ছান্দসিক স্বয়ম্ভুর মতো একটি নমনীয় প্রকার (প্রকার>পআর>পয়ার) বলে কবি-শিল্পী সেখানে নানাবিধ মাত্রাবিন্যাস এবং পঙ্‌ক্তির বৈচিত্র্য ঘটিয়ে স্বাধীন কবি-অভিপ্রায়ের পরিচয় দিয়েছেন।

স্তবকের নিদর্শন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক[৯] দ্বিজেন্দ্রনাথের নতুন শ্লোকে প্রথম চরণে বারো মাত্রা এবং দ্বিতীয় চরণে আঠারো মাত্রা উল্লেখ করেছেন। এই সমালোচক নিধুবাবুর টপ্পার ভিতরে এর একটি সম্ভাব্য পূর্ণসূত্র দেখিয়েছেন। আসলে কবি-ছান্দসিক দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর কবিব্যক্তিত্বের গরজে প্রকরণকে ভেঙেছেন— তাকে নতুন করে গড়বার জন্য। এ ক্ষেত্রে শ্লোক শব্দটির ব্যবহার না করে স্তবক শব্দটির ব্যবহারই সংগত বলে মনে হয়। যেহেতু এ-সব ক্ষেত্রে বহিরঙ্গ শরীরবিন্যাস (outer form) একটি অন্তরঙ্গ রূপকল্প (inner form) থেকেই সঞ্জাত হয়েছে।

মহাপয়ার ছন্দের যে নিদর্শন তিনি পঞ্চম সর্গের প্রথম তিন স্তবকে উপস্থিত করেছেন তার সংহতিগুণ ও অনির্দেশ্য শক্তিটি পরবর্তী কালের কবিরাও এর চেয়ে বৃহত্তর কোনো সার্থকতার দিকে নিয়ে যেতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। এই উদ্দেশ্যে প্রাগাধুনিক বাংলা কবিতার ত্রিপদী formটিকেও তিনি পুনর্নব করে তাকে পয়ারের অনুগত করে তুলেছেন।

কিন্তু ছন্দের ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ কৃতিত্ব সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরকরণে। দ্বিজেন্দ্রকৃত শিখরিণী ছন্দের বাংলায় প্রবর্তনের সময় দেখা যায়

সংস্কৃতের লঘু গুরু উচ্চারণের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে যতিপাতের নতুনত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু 'স্বপ্ন-প্রয়াণে' দ্বিজেন্দ্রনাথ অধিকতর মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এই কাব্যে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় এনেছেন। সেখানে এমন ভাবে তা মিশে গেছে যে অনেক ছন্দোজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষেও তাদের স্বরূপ ধরা কঠিন হয়েছে।[১০]

দ্বিজেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দের অক্ষর সংখ্যা বাংলায় অক্ষুণ্ন রাখবার চেষ্টা করেন নি। এর আগে কেউ কেউ যদিও সে চেষ্টা করেছিলেন। ঠিক তদ্গতভাবে আনতে গেলে বাংলাতেও কৃত্রিমভাবে লঘু গুরু উচ্চারণ করতে হয়। দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণই বাংলায় কৃত্রিমতার সৃষ্টি করে। এই সূত্র নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলায় মন্দাক্রান্তা, মালিনী প্রভৃতি ছন্দ রচনা করেছিলেন। এই সূত্র কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের সময়ে আবিষ্কৃত হয় নি।

এই সূত্রে তাঁর মন্দাক্রান্তা ছন্দ বিষয়ে সচেতনতা পরবর্তীকালে দৃষ্টান্তস্থল হয়ে রয়েছে। কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু লক্ষ করেছেন: মন্দাক্রান্তার প্রত্যেক চরণে চার পর্ব, মাত্রাসংখ্যা ২৭ : ৮। ৭। ৭। ৫'।[১১] এই সূত্রে শঙ্খ ঘোষ লক্ষ করেছেন :

> 'সত্যেন্দ্রনাথের কাঠামোর উপর আমি··· পরিবর্তন করেছি' এ মন্তব্য বোধহয় অসংগত। সত্যেন্দ্রনাথ যদি ৮। ৭। ৭। ৫ মাত্রায় লাইন সাজাতেন (স্বপ্ন-প্রয়াণে যেমন করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ) তা হলে নিশ্চয় ও রকম বলা চলত। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ থেকে আপনার প্রধান ব্যবধান মাত্রা পরিমাণে নয় মাত্রাবিন্যাসের প্রকৃতিতে এ তথ্য উল্লেখ না করলে ভুল বুঝবার সম্ভাবনা থেকে যায়।···
>
> 'প্রথম পর্বে চারটি গুরু মাত্রা, দ্বিতীয় পর্বে পাঁচটি লঘুর পরে একটি গুরু এবং শেষ পর্বে গুরু— লঘু— গুরু গুরু— লঘু— গুরু— গুরু, সংস্কৃতের বা সত্যেন্দ্রনাথের এই মাত্রাক্রম সংগত কারণেই আপনি গণ্য করেন নি, এইটে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া ভালো মনে হয়। এবং সেই অর্থে, সত্যেন্দ্র-নাথের কাঠামো থেকে আপনার পরিবর্তনকে নিতান্ত 'গৌণ' বলা চলে না হয়তো। বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত গরজে প্যারীমোহন সেনগুপ্ত বা কান্তিচন্দ্র ঘোষকেও তাই করতে হয়েছিল; ৭। ৭। ৭। ৫ হিসেবেই লিখেছিলেন

তাঁরা। কেবল, ধ্বনি সৌকর্যের জন্য শেষ পর্বে আপনি যে স্বাধীনতা নিয়েছেন সেটা তাঁদের বোধ বা আয়ত্তের অতীত ছিল।[১২]

'মেঘদূতে'র এই উল্লিখিত অনুবাদকদের মতোই বাঙালির বাকরীতি বিশেষ ভাবে মেনে চলেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং সেই উদ্দেশ্যে মন্দাক্রান্তা ছন্দের অতি নির্ণীত লঘুগুরু ক্রম তিনি মানেন নি, যা নাকি সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে মেনেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ রুদ্ধদলকে (closed syllable) দীর্ঘস্বরের প্রতিকল্প হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এ সব ক্ষেত্রে দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ যুক্তবর্ণকে যথাসাধ্য এড়িয়ে গেছেন। এবং কখনো কখনো এমন-কি পাঁচ-মাত্রার কিনারে তাকে এনে ফেলেছেন :

কভু বাদুড়ের পাখা
ঝাপটি তরু-শাখা
গতি করিয়া বাঁকা
বাজিয়া যায়।
কভু বা বন বিড়াল
বহিয়া-উঠি' ডাল
লয়ে লুটের মাল
লাফায় গায়॥

—বিলাসপুর-প্রয়াণ, স্তবক ১৫৫

অবশ্য মনোরাজ্য-প্রয়াণে ২৪-সংখ্যক মন্দাক্রান্তার লক্ষণাক্রান্ত স্তবকে তিনি 'রম্য', 'পুষ্প', 'নিকুঞ্জ' প্রভৃতি যুক্তবর্ণাত্মক শব্দ ব্যবহার করেও তাদের বিশ্লিষ্ট করেন নি। সেখানে এইটেই বলতে হবে যে তখনো কবি এই সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে বাকরীতির স্বস্তিকর একটি সামঞ্জস্য খুঁজে পান নি। তবু অক্ষরের হিসেবকে গৌণ করে তিনি মাত্রার হিসেবকেই মুখ্য করে তুললেন। সংস্কৃতের লঘু অক্ষর একমাত্রা এবং গুরু অক্ষর দুইমাত্রা ধরে বাংলার পঙ্‌ক্তির মোট মাত্রা-সংখ্যা ঠিক করে নিয়ে যতি বিভাগ অনুযায়ী পর্বভাগ করলেন। মন্দাক্রান্তার যতিবিভাগ এই রকম :

হস্তে লীলা | কমলমলকে | বালকুন্দানুবিদ্ধম্

কলামাত্রার হিসেবে এর প্রথম ভাগে ৮ মাত্রা দ্বিতীয় ভাগে ৭ মাত্রা তৃতীয় ভাগে ১২ মাত্রা এবং দল হিসেবে এতে আছে ১৭টি দল বা সিলেবল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলায় একে করলেন ৮+৭+৭+৫ কলামাত্রা। বাংলায় বারো মাত্রার পর্ব অস্বাভাবিক বলে তাকেও সাত এবং পাঁচ ভাগ করলেন। সেইসঙ্গে প্রতি অংশে অন্ত্যমিল দেওয়ায় ছন্দটি অধিকতর বাংলা হয়ে উঠল।

সুরুচি অবাক্ মানি
হেরিল কানাকানি,
ভাবিল 'কিনা জানি
পাতিছে কল!'
বলিল 'তোরা কি হ'লি!
যে দেখি গলাগলি
কি এত বলাবলি
আমায় বল্॥

—নন্দনপুর-প্রয়াণ, স্তবক ১৪২

মন্দাক্রান্তা ছন্দ তিনি যেভাবে সাজিয়েছেন তা বাঙালি শ্রোতার কাছে অত্যন্ত পরিচিত। 'স্বপ্ন-প্রয়াণে' শিখরিণী ছন্দ আছে একবার, নন্দনপুর-প্রয়াণ, স্তবক ১১৫। এতে ১৭টি দলে ছয় এবং এগারোতে যতি পড়ে, মাত্রার হিসেবে থাকে ২৫ মাত্রা। তাকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ৭+৪+৯+৫—এ মিল দিয়ে বিভক্ত করলেন :

লজ্জা বলিল 'হবে,
কি লো তবে!
কতদিন পরাণ র'বে,
অমন করি'
হইয়ে জল-হীন
যথা মীন
থাকিবে ওলো কত দিন
মরমে মরি॥ ১১৫॥

শিখরিণী ছন্দের এই রচনার পরেই কবির রচিত আর-একটি সংস্কৃত-ভাঙা ছন্দ :

দু-সখী, এই রূপে, চুপে চুপে, কহিল কত।
শোভা, কবির সনে, আলাপনে, হইল রত॥

কখন চড়ে গিরি, ধীরি ধীরি ; কখনো সবে।
নদীর ধারে ধারে, পদ চারে, নবোৎসবে॥

—নন্দনপুর-প্রয়াণ, স্তবক ১১৬

এই ছন্দে ১১৬ থেকে ১৩৩ স্তবক পর্যন্ত কবি অবলীলাক্রমে রচনা করে গিয়েছেন। এটা সংস্কৃত দ্রুতবিলম্বিত নামক ছন্দের অনুসরণ করা। এতে ১২ দলে ১৬ মাত্রা থাকে। দ্রুত বিলম্বিত ছন্দের দৃষ্টান্ত :

অয়ি কৃশোদরি যত্রচতুর্থকং।
গুরু চ সপ্তমকং দশমং তথা॥

একে দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাগ করলেন ৭+৪+৫ মাত্রায় এবং মিল দিলেন সাতে চারে।

'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর চতুর্থ সর্গের প্রথমেই ১-৪ শ্লোক সংস্কৃত মালিনী ছন্দের অনুসরণে রচিত বলে কেউ কেউ মনে করেছেন। মালিনী ছন্দে ১৫টি দলে ২২ মাত্রা থাকে ; যতি পড়ে ১০ এবং ১২ দলে। কিন্তু নিম্নোদ্‌ধৃত পঙ্‌ক্তিতে দেখা যাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ২১ মাত্রার পঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন এবং যতি দিয়েছেন ৫+৫+১১

করিয়া জয়
মহা প্রলয়
বাজিয়া উঠিল বাজনা নানা।

—বিলাসপুর-প্রয়াণ, স্তবক ১

'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এ কবির সংস্কৃত ছন্দ অনুসরণের দৃষ্টান্ত এই কয়টি। এই গ্রন্থের সবশেষে চার চরণের একটি শ্লোক শিখরিণী নামে তৃতীয় সংস্করণে উল্লিখিত। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০৩) ছন্দের কোনো নাম ছিল না শুধু লেখা ছিল—'শেষের এই চারি পঙ্‌ক্তির কবিতা সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ দীর্ঘ হ্রস্ব অনুসারে পঠিতব্য।'

শিখরিণী ছন্দ তিনি অন্যত্রও ব্যবহার করেছেন :

ইঙ্গবঙ্গের বিলাত্‌ যাত্রা

বিলাতে পালাতে ছটপট করে নব্য গৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে,

স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন বশে কিচ্ছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি পিরহণে মান রয় না।

'মেঘদূত' ছাড়াও তিনি মন্দাক্রান্তা ছন্দ আরো নানা স্থানে ব্যবহার করলেন। এমন-কি, তাঁর লিখিত চিঠিতে এ ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় :

ইচ্ছা সম্যক্‌ জগ দরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি,
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু
একি দৈবের শাস্তি।[১৩]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ছন্দ এবং ভাব নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের রচনায়[১৪] তাঁর রচিত একটি সংস্কৃত কবিতার পরিচয় পাই। এটি কলিকাতা নগরীর বর্ণনা :

ইংরাজ রাজরাজ্যং যৎ ত্রিলোকীতলবিশ্রুতং
রাজধানীং সুবিস্তীর্ণাং কলিকাতাং বিভর্ত্তি তৎ।
পয়ঃ পুরপ্রবাহিণ্যা গঙ্গয়া পুণ্যসঙ্গয়া
কলিকাতা পুরী ভাতি নিত্যং মেখলিনীব সা।
রথ্যা রম্যাঃ সুগম্যাশ্চ যত্র ভান্তি সহস্রশঃ
দৃতিপাত্রগলদ্বারি-নিবারিতরজশ্চয়া
শতঘ্নীশতযুক্তেন দুর্গেণ দুগ্রহারিভিঃ
উদ্যৎ বিদ্যুৎপ্রভাজাল সৈন্যশস্ত্রাস্ত্রশোভিনা।

ত্রিলোক বিশ্রুত এই ইংরাজ রাজ্যের মাঝে
সুবিস্তীর্ণা রাজধানী কলিকাতা কিবা সাজে।
পূর্ণকায়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবী বহিয়া যায়,
তারি অঙ্গে কলিকাতা মেখলিনীসম ভায়।
সুরম্য সুগম্য যথা শত পথ ব্যাপি রয়,
চর্মপাত্র গলদ্বারি ধূলিরাশি নিবারয়।
শত শত তোপযুক্ত দুগ্র্হ দুর্গ রক্ষিত।
উদ্যৎ বিদ্যুৎপ্রভাসম সৈন্যাস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত॥

খাঁটি বাংলা কবিতাতে তাঁর সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার :

বৃক্ষগণ হেলিত সুশীতল সমীরণে
পুষ্প যত প্রস্ফুটিত পুষ্পময় কাননে।
মত্ত মধু পাখি দল আইল ত্বরা করি,
জাগিল বিহঙ্গকুল জাগিল বিভাবরী॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দে বিভিন্ন ভাবকল্প নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন এবং যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর কবিকৃতির সংশয়াতীত সাফল্যের কারণ ঘটনাকে তিনি নিছক ছন্দোবদ্ধ বিবরণ মাত্রে পর্যবসিত করেন নি। বর্ণনার প্রতি পর্যায়েই কবিব্যক্তিত্ব এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে তাতে বাংলা কাব্য স্টাইলের একটি পূর্ণরূপ প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে রাজী ছিলেন না। 'স্বয়ংভূত ছন্দ' এবং 'প্রাকৃত পিঙ্গল'-এর পাঠক জানেন পরবর্তী কালের জয়দেব প্রমুখ নব পর্যায়ের কবিদের কবিতায় প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মাত্রাপ্রাণ ছন্দের অভিঘাতে সংস্কৃত ছন্দের সম্প্রসারণ ঘটেছে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তনায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পঞ্চমাত্রিক ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ যখন ঠিকমতো যতি রেখে জয়দেবের 'অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং' পঙ্‌ক্তিটি পড়তে পেরেছিলেন তখন তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠেছিল।[১৫]

সন্দেহ নেই দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর আগে এই ছন্দের পূর্ণায়ত যে প্রতিষ্ঠা ঘটে গিয়েছিল সেটি বাঙালির উচ্চারণ-রীতির সঙ্গে বহুলাংশে সুসংগত। একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ :

করিয়া জয়
মহা- প্রলয়
বাজিয়া উঠিল বাজনা নানা।[১৬]

শেষ লাইনে ছয় মাত্রার ব্যবহার ঘটে গিয়েছে এবং এ-রকম অসংগতি 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্যের অন্যত্রও লক্ষ করা যায়, কিন্তু এইভাবেই তিনি ক্রমে পৌঁছে গিয়েছেন সপ্তমাত্রিক ছন্দের দক্ষ প্রয়োগ-ক্ষমতায় :

যথায় মহাবট, শিরে জট, অতি নিবিড়
পালিছে চুপে চাপে, খোপে খাপে অযুত নীড়॥[১৭]

প্রসঙ্গত সূক্ষ্মগোচর সাদৃশ্যসূত্রে প্রথমটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "সাগরিকা" কবিতা এবং দ্বিতীয়টির সঙ্গে তাঁর "বিরহানন্দ" কবিতাটির অনুষঙ্গ অনিবার্য। এ কথা বললে অসংগত হবে না, দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রকরণিক প্রেরণা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল।

এই সূত্রে আমরা লক্ষ করি সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দোচেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য অন্ত্যমিল রচনার ক্ষমতা। ভারতীয় কবিতার ইতিহাসে অন্ত্যমিল অষ্টম শতাব্দীর আগে কোনো স্পষ্ট রূপ নেয় নি।[১৮]

সংস্কৃত ছন্দের বিশেষজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রনাথ যে শুধু ধ্বনি রচনা না করে সংস্কৃত ছন্দের পরিধি পার হয়ে গিয়ে চমকপ্রদ শ্রুতিসুভগ অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার ফুটিয়েছেন, এটি তাঁর স্বভাব-কবিত্বের নয়, রূপদক্ষ কবিত্ব শক্তির প্রমাণ। এই অন্ত্যমিল প্রায় কোনোখানেই প্রথার্পিত নয়। প্রচলিত মিলগুলি এড়িয়ে গেছেন তিনি। তাই 'আমি নিরলস / রজনী দিবস' (সর্গ ২ ; স্তবক ১৯), 'পরিহারি / জোড় করি' (সর্গ ২, স্তবক ৬৭), 'দরপণ / আরোপণ' (সর্গ ৩, স্তবক ৭৮), 'দুর্নিবার / পারাবার' (সর্গ ৪, স্তবক ১২), 'নাগিনী / দেখি নি' (সর্গ ৩, স্তবক ১৩৩), 'মহাকায় / মাথায়' (সর্গ ৪, স্তবক ১২৩), 'ভস্মধারী / চমৎকারী' (সর্গ ৪, স্তবক ৪৫), 'খেলাই / সেলাই' (সর্গ ৫, স্তবক ৮৯), 'গূঢ় অতি / মূঢ় অতি' (সর্গ ৭, স্তবক অচিহ্নিত), 'রচনারি / নরনারী' (সর্গ ৭, অচিহ্নিত শেষ অংশ)— প্রভৃতি অন্ত্যমিল বৈচিত্র্যের মধ্যে একস্বরাত্মক (monosyllabic) ও একাধিক-স্বরাত্মক (polysyllabic) শব্দ সন্নিবেশ ছাড়াও সচেতন অর্ধমিল (pararhyme)-এ বিপ্রকর্ষের অভাবিতপূর্ব প্রয়োগ অভিনিবেশযোগ্য। এই-সব প্রয়োগ নাটকীয়তা লক্ষণাক্রান্ত হলেও কোথাও কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য নিয়ে ধরা পড়ে না— এখানেই প্রকরণসিদ্ধ কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের সার্থকতা।

•

কবিতায় বাক্‌ছন্দ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আগে দ্বিজেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন। বাক্‌ছন্দের মধ্যে কোনো অতি-নিরূপিত পর্বন্যাস বা মাত্রাসমকত্বের প্রশ্নই ওঠে না যদিও কবি যখন বাক্‌ছন্দকে প্রথানুগত বা প্রচলিত কোনো বাক্‌ছন্দের মধ্যে অনুস্যূত করে দেন তখন পর্ববিভাগ ও মাত্রাভিত্তিকে মেনে চলতেই হয়। সেখানে কবির কৃতিত্ব নির্ধারণ করতে হলে লক্ষ করতে হবে দৈনন্দিন কথোপকথনের বাগধারা, বুলি বা idiom কী পরিমাণে ও কী রকম স্বাচ্ছন্দ্যের

সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এ ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অনন্য। তিনি বাক্‌ছন্দকে কাব্যছন্দের ভিতরে অন্তর্নিবিষ্ট করে দিতে পেরেছেন :

হাস্যমুখে কহে তবে সখ্য-রস
'পথ-কষ্টে গিয়াছে তোমার আজি সমস্ত দিবস,—
উঠাইলে গল্পে,
ফুরাবে না অল্পে,
দীনের কুটিরে হোক্ চরণ-পরশ ॥

অথবা

ধীর যুবা এবে দেখি মনোহর !'
চারিদিক্ নিরখিয়া ধীরে ধীরে কহে কবিবর,
'যেই কোন ঠাঁই
নয়ন ফিরাই,—
সকলি আমার যেন প্রাণের দোসর ॥'[১৯]

যেমন 'উসুখুসু' (২/১০১) 'বেচাকেনা' (৩/১২) প্রভৃতি শব্দের স্বাভাবিক ব্যবহার কখনো কখনো কাব্যান্বিত করেছেন, আবার চলতি কথার ব্যবহারও ঘটিয়েছেন—'চারিদিকে ফুলের বাজার হাট'। (সর্গ ৩ স্তবক ১২)

'মেঘদূত'-এর অনুবাদে দ্বিজেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করেন নি। সেখানে তিনি সংস্কৃত ছন্দের আদলটিকে ব্যবহার করেছেন। এবং সেই মুহূর্তে তিনি বাঙালির উচ্চারণ-রীতি বা কথ্য-অভ্যাসকে তার মধ্যে অনায়াসে অভিযোজিত করে দিতে পেরেছেন।

'বাকরীতির সঙ্গে কাব্যরীতি মেলাতে হলে পয়ারই শ্রেষ্ঠ বাহন।' উদাহরণস্বরূপ পয়ার ও বাক্‌ছন্দের মিলনে স্বাভাবিকতা ও স্বতঃস্ফূর্তির আর-একটি নিদর্শন :

কিন্তু সখে মাটিকে ছাড়িয়ে দিলে
শোভাশূন্য ভোঁ ভাঁ ভিন্ন আর কিছু থাকে না নিখিলে।
জ্ঞানী জনে বলে—
মাটিতেই ফলে
চতুর বরগ ফল ফলাতে জানিলে।

—তৃতীয় সর্গ, ৯

কিংবা,

চিবায়ে কড়াই, বলিছে বড়াই,
'হুঁয়ে মোর কাঁপে লোক, ফুঁয়ে আমি পর্বত-লড়াই !'
পড়িয়া সরিষা
বলিছে ঈরিষা
'হাসিমুখ যত আছে পুড়ি' হোক ছাই।'

—পঞ্চম সর্গ, ৮২

কেবলমাত্র গুরুগম্ভীর বা রোম্যান্টিক বিষয় নিয়েই তিনি যে কাব্য রচনা করেছেন তা নয়। বিষয়কে সরল করে বলার তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। দুরবগাহ দার্শনিকতা ছাড়াও পরিহাসপ্রিয়তা তাঁর চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলায় স্বরবর্ণ ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি ভেবেছিলেন। এ ভাবনার ফল তাঁর কিছু পদ্যপ্রতিম রচনায় ধরা পড়েছে। বাংলা ব্যাকরণের রীতিনীতি তিনি পদ্যবন্ধের সাহায্যে সুন্দর প্রকাশ করেছেন :

বর্ণমালার অব্যবস্থা

বর্ণমালী ভায়াদের বিদ্যা গো অগাধ।
আবর্জনা জড়াবার প্রধান ওস্তাদ॥
কর্ম কার্যটিকে করি কর্ম্ম কার্য্য মস্ত
বিদ্যা ফলাবার পথ করেন প্রশস্ত॥[২০]

বাংলা ভাষায় বানান প্রসঙ্গেও তিনি ভেবেছেন। বানানে যে দ্বিত্ববর্জন আধুনিক বানানে গৃহীত হয়েছে দ্বিজেন্দ্রনাথ আগেই আমাদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করেছিলেন।

তেলা শিরে তেল দিয়া ফল নাই কোনো॥
আর ত দিলে আর্ত-এ ছাড়িবে আর্তরব।
আর দ চাপাইলে পিঠে মরিবে গর্দভ॥
ইষ্ট করিও না নষ্ট বোঝা করি পুষ্ট।
অর্দ্ধে দিয়া অর্ধচন্দ্র অর্ধে থাক তুষ্ট॥[২১]

নানামুখী কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি কাজের কথাকে পদ্যবন্ধে উপহার দিয়েছেন। 'রেখাক্ষর' অর্থাৎ বাংলায় shorthand পদ্ধতি তিনিই প্রচলন

করেন। তিনি চারটি খাতায় রেখাক্ষরের পাণ্ডুলিপি লিখেছিলেন। সেগুলি আগাগোড়া পদ্যবন্ধে রচিত। একটি উদাহরণ :

সাধন পদ্ধতি

কেমনে পাকাবে হাত শুন সাবধানে।
শিষ্য জুটাইয়া আনি মন্ত্র দিবে কানে॥···
আউড়িবে সে ধীরে ধীরে সমাচার পত্র।
তুলিতে থাকিবে তুমি ছত্র পিছু ছত্র॥
ছিটা ফোঁটা দিবে না রেখাই যাবে টানি।
সঙ্গ গুণে তরি যাবে অঙ্গহীন বাণী॥···

দ্বিজেন্দ্রনাথের রচিত একটি মাত্র লিরিকই সাময়িকীতে মুদ্রিত হয়েছিল।[২২] 'ভারতী'তে প্রকাশিত "অন্তিম বাসনা" নামক কবিতার কিয়দংশ :

···

মনে হবে জীবনযাত্রা মোর
হইয়ে এল ভোর,
বিশ্রাম করিবারে চাহিবে হিয়া॥···
তুমিও ফেলিও এক বিন্দু
অধিক নহে বন্ধু
একটি ফোঁটা শুধু নয়ন-লোর।
ফুল তুলি একটি প্রাণ প্রিয়
মোর মাথায় দিও
সাধ মিটায়ে চেয়ো শয়নে মোর॥
পীরিতির সোহাগে ঢল ঢল
সে তব অশ্রুজল
মোরে তা সঁপি দিতে কর না লাজ
ত্রিভুবনে আছয়ে যত মণি
সবার সেরা গণি
রাখিব করি তারে মুকুট-সাজ।

কবিতাটিতে সাংগীতিক একটি দ্যোতনা প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ-রচিত অন্তত উনত্রিশটি ব্রহ্মসংগীত পাওয়া গিয়েছে। এই গানগুলির প্রধান এবং প্রমূর্ত বৈশিষ্ট্য একটি শান্তশীল ব্যক্তিগত আবাহনের ও সম্বোধনের ভঙ্গিমা। স্পষ্টতই বোঝা যায় আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে প্রতিষ্ঠান-নিরপেক্ষ ধর্মবোধের যে মহিমা লক্ষ করা যায় গীতিকার দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যেও তাঁর ভক্তি-কবিতার 'তুমি', সেই ঈশ্বর যিনি জীবন-রসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের সংগীতে যেমন ছয় ঋতুর বর্ণিল চলচ্চিত্রণ, দ্বিজেন্দ্রনাথেও তেমনি, তবে তাঁর সংগীতে চিত্রকল্পের তেমন বৈচিত্র্য নেই। ঋতুর উপযোগী রাগ-রাগিণী (যেমন বর্ষানিসর্গে মেঘমল্লার, বসন্তে বসন্তরাগ) দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন।

তাঁর একটি গান :

আজিকে মধুর সুবিমল প্রাতে, মরম বাঁশরী উঠিল বাজিয়া!
আজি নামে তব ওহে প্রিয়তম, শত নব গান উঠিছে ফুটিয়া!
তোমারি মধুরে সকলি মধুর, তব পুণ্যগন্ধ পড়িছে ঝরিয়া,
সুমন্দ বাতাস তোমারি নিঃশ্বাস, দিতেছে আমারে পাগল করিয়া!

দ্বিজেন্দ্রনাথের সাংগীতিক সংবেদনশীলতা অত্যন্ত প্রখর। ফরাসী কবি বলেছিলেন, কবিতা হল গানের সহোদরা। কথাটি দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে তাঁর কবিতার ভিতরে সাংগীতিক শ্রুতি-মাধুর্য ও মূর্ছনা সংযোজিত করে দিয়েছেন।

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের তুলনায় কোনো অংশেই খর্ব নন। বরং বলা যায়, তাঁর কবিস্বভাব রূপদক্ষতার আশ্রয়ে একটি শাশ্বত শিল্পলোক রচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে অব্যক্ত আবেগ বা স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনায় আশ্রিত না হয়ে উপাদানকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। ভাষাশিল্পী এই কবিকে নাট্যকার অমৃতলাল 'বাক্যাজ্ঞিক' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর আর-কোনো বাঙালি কবির কাব্যেই এই রূপের জগৎ আমরা এমন-ভাবে দেখতে পাই না। এবং এই রূপ ব্যাবহারিক, স্থানকালগত, তত্ত্বগত যাবতীয় ধ্যান-ধারণার পূর্বধার্য গণ্ডি অতিক্রম করে গিয়েছে, এইখানেই কবি হিসেবে তাঁর অনন্য সার্থকতা।

—

৭

অনুবাদক

দ্বিজেন্দ্রনাথের ধ্রুপদী মন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। তারই ফলস্বরূপ অনুবাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম। কোনো-কিছুর প্রতিই তাঁর প্রবল আসক্তি ছিল না। এই ঔদাসীন্যকে অনেকে আবার ব্যক্তিত্বের অভাব বলে মনে করেছেন। কেউ বা একে বলেছেন তাঁর 'গৃহিণীপনার অভাব'।[১] এই স্বভাবের জন্যই দ্বিজেন্দ্রনাথের হাত দিয়ে অনুবাদ যে খুব বেশি বেরিয়েছে তা নয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেটুকু তিনি লিখেছেন বা যা অনুবাদ করেছেন তাই আপন মাধুর্যে বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সংস্কৃত সাহিত্য কাব্যপ্রধান। অন্যান্য অনেক ভাষার মতোই সংস্কৃত সাহিত্যেও এক ধরনের রোমান্টিকতা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কালিদাসের কাব্য তাদের অন্যতম। সেই রোমান্টিক-কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের কাব্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের রসাবগাহন ঘটেছে। এবং 'কালিদাসের "মেঘদূত"-এই আমরা সবচেয়ে বেশি করে পরিপূর্ণ যৌবনোচিত রচনাশক্তি, হৃদয় ঢালা ভাবাবেগ ও মুক্ত কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য দেখতে পাই।'[২]

সেই ভাবাবেগ তরুণ দ্বিজেন্দ্রনাথের মনকে নাড়া দিয়েছিল প্রবলভাবে। তাই মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই তাঁর ভালোলাগার ফলস্বরূপ এই কাব্যখানির অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকা নিম্নরূপ :

> মেঘদূত গ্রন্থখানি যদিও স্বল্পায়তন, তথাপি উহা কালিদাসের এক প্রধান রচনা বলিয়া সর্বত্র গণ্য হইয়া থাকে, ও আশ্চর্য এই যে, এই কাব্যরূপ অট্টালিকাটি শূন্যের উপর নির্মিত হইয়াছে বলিলেও বলা যায় ; উহার শুদ্ধ কেবল গল্পটির প্রতি দৃষ্টি করিলে অধিকাংশ লোকই হাস্য করিবেন যথার্থ ; কিন্তু উহার সর্বাঙ্গ সুন্দর রচনাটি অবলোকন করিলে মনে করিবেন যে, উহার ন্যায় বিস্ময়কর কাব্যরচনা আর জগতে নাই ; এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই যে, যদ্যপি আমার এই যৎসামান্য অনুবাদ পাঠ করিয়া কাহারো মন কালিদাসের মূল গ্রন্থ অবলোকনে উৎসুক হয় তাহা হইলেই আমি আপাতত কৃতকার্য হই। ১২৬৬ সন।[৩]

কিন্তু তিনি 'যখন খুব ছোট তখন থেকেই তাঁর ছবি আঁকার নৈপুণ্য ও কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায়··· তাঁর বাল্যকালের কবিতোচ্ছ্বাসে দুইটি কাব্যরত্ন প্রসূত হয়— মেঘদূতের পদ্যানুবাদ ও স্বপ্ন-প্রয়াণ।'[৪]

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'নবরত্নমালা' শীর্ষক সংকলন-গ্রন্থে এই 'মেঘদূত' কাব্য-খানি প্রথম সংকলিত করেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি ভূমিকায় বলেছেন :

> 'মেঘদূত'-এর দুইটি অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে; তাহার মধ্যে পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর অনুবাদটি তাঁহার অনেক পূর্বকার তরুণ বয়সের রচনা, সুতরাং বাল্যসুলভ কিছু কিছু অপক্কতা দোষে জড়িত থাকা সম্ভব। তাহা সত্ত্বেও মূল ভাবব্যঞ্জক এমন সুন্দর অনুবাদ আমাদের সাহিত্য জগতে দুর্লভ। বড়দাদা মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে তাঁহার এই অনুবাদটিও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল।[৫]

বস্তুত খাঁটি কাব্যরসের সঙ্গে যথার্থ কাব্যরসিকতা যুক্ত হওয়ায় তাঁর রচনায় আগাগোড়া যে বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে তা হল সরলতা এবং সহজ স্বাচ্ছন্দ্য। তাঁর ভ্রাতা এই অনুবাদে কিছু 'অপক্কতা দোষ'-এর উল্লেখ করলেও তৎকালীন সুধী সমাজ এই অনুবাদটিকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দেন।

'মেঘদূত' প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে পাই :

> সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পরে আমার 'মেঘদূত' প্রকাশিত হইল।··· আমি যখন 'মেঘদূত' লিখি, তখন ও ধরণের বাঙ্গালা কবিতা কেহ লিখিতেন না; ঈশ্বর গুপ্তের ধরণটাই তখন প্রচলিত ছিল। মাইকেল তখন ইংরাজীতে কবিতা লিখিতেন। একদিন হাইকোর্টে আমার ভগিনীপতি সারদাকে তিনি বলিলেন, 'আমার ধারণা ছিল বাঙ্গালায় ভাল কবিতা রচিত হোতে পারে না, 'মেঘদূত' পড়ে দেখছি আমার সে ধারণা ভুল।[৬]

বস্তুত দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম কবিকর্ম 'মেঘদূত' যখন প্রকাশ করলেন তখন বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের প্রয়াস একেবারেই ছিল না। সে সময় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বা রঙ্গলালই বাংলার কাব্যজগতে প্রধান কবি ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কিছু কিছু আধুনিক কবিতা লিখেছেন কিন্তু তার সবগুলিই প্রায় বিষয় প্রধান। সেখানে ব্যঙ্গে, পরিহাসে বা সামাজিক বিষয় নির্বাচনে তাঁর বিশিষ্ট মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে 'আসল কবির অন্তর্লোকের ভাবপ্রেরণা বা সৌন্দর্য-মুগ্ধতা প্রকাশ পায় নি।'[৭] যে সময় রঙ্গলালের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মিনীর

উপাখ্যান' প্রকাশিত হল (এবং এটিও একটি বিষয় প্রধান কাব্য) ঠিক সে সময় 'মেঘদূত'-এর মতো বিশুদ্ধ কাব্যের অনুবাদ নিঃসংকোচে একটি বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ ঘটনা।[৮]

দ্বিজেন্দ্রনাথের আমলে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, আমাদের দেশে সংস্কৃত শিক্ষার চল ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যজ্ঞান আহরণের ফলে শিক্ষিত মানুষ বিশ্বসাহিত্যের প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বিদেশী কাব্যের ছায়াবলম্বনে অথবা বিদেশী কাব্যের ভাবানুবাদে বা মূলানুবাদে অনেক কাব্য রচিত হয়েছিল। এই অনুবাদগুলিতে মূলানুগতা ছাড়িয়ে অনেক সময়েই বড়ো হয়ে উঠিছে বাঙালি-মানসের নিজস্ব প্রবণতা, কোমল এষণা ও অভিপ্রায়। মাইকেল মধুসূদনের উক্তি : 'We are also actuated by the same passions, but in us they assume a milder shape.' দেশজ পরিবেশে বা আবহাওয়ায় যে-সমস্ত কাব্যের সৃষ্টি সেগুলিও কোনো-না-কোনো ঐতিহাসিক গল্প গাথাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ঠিক সেই সময় বিশুদ্ধ সৌন্দর্যভোগ এবং সেই রসসম্ভোগের আয়োজন অনুবাদ-সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা।

'দেশ কালের দূরত্ব মোচনের যে কয়েকটি উপায় আমাদের জানা আছে তার মধ্যে অনুবাদ একদিক থেকে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। অনুবাদই সেই ঘটক যার প্ররোচনায় আমরা বুঝতে পারি যে, সাহিত্য একটি নিষ্ফল ও বৃহদায়তন স্থাবর সম্পত্তি নয়, যুগে যুগে তা বাণিজ্যের যোগ্য বলেই আমরা তাকে ক্লাসিক নাম দিয়েছি।... অর্থাৎ অনুবাদ সেই প্রাচীনকে সজীব ও সমকালীন সাহিত্যের অংশ করে তোলে।' আর 'ভালো অনুবাদ শুধু মূল রচনার প্রতিনিধিত্ব করে না, সেই যুগের ও অনুবাদকের ব্যক্তিত্বের স্বাদ দেয়।'[৯] দ্বিজেন্দ্রনাথ অনুবাদকের এই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি। অনুবাদের বিষয়ে কোনো নতুনত্ব আনার স্বাধীনতা তাঁর নেই। তবুও তার ভিতরেই তাঁর বৈশিষ্ট্যটুকু ধরা পড়ে।

এই ক্ষুদ্রালোচনায় মূল কাব্যাংশের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি বিচার করে দেখে বলা যাবে না তিনি কোন্ কোন্ অংশে মূলের প্রতি একান্ত অনুগত, আর কোন্ অংশেই বা তার থেকে বিচ্যুত। এখানে পর পর কয়েকটি অনুবাদের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাব কালিদাসের শ্লোক কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। কালিদাসের প্রথম শ্লোক :

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু॥

দ্বিজেন্দ্রনাথের বিস্তারিত অনুবাদ :

কুবেরের অনুচর কোনো যক্ষরাজ
কান্তা সনে ছিল সুখে ত্যজি কর্ম কাজ।
ক্রোধভরে ধনপতি দিল তারে শাপ—
'বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ!'

প্রবাসে যাইতে হবে নাহি তায় খেদ,
ভাবে কিন্তু দায় বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ।
সে মহিমা নাহি আর নাহি সে আকৃতি,
রামাচলে গিয়া যক্ষ করে অবস্থিতি।

রবিঃতাপ ঢাকা পড়ে বিপিন বিতানে,
পবিত্র যতেক জল জানকীর স্নানে।
ভাবনায় শুষে তার অঙ্গ সমুদায়,
হস্ত হতে খসে পড়ে স্বর্ণের বলয়।

এই অংশের অনুবাদে কবিভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ :

স্বকার্যে প্রমাদ গণি প্রভু দিলা ক্রোধে গুরুশাপ
বর্ষেক ভুঞ্জিবি তুই কান্তা ছাড়ি প্রবাসের তাপ।
নিবসে বিরহী যক্ষ রামগিরি আশ্রমে অধীর,
স্নিগ্ধ ছায়া তরু যথা, জানকীর স্নানে পুণ্যনীর॥

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ এ অংশের তিনটি অনুবাদ করেছেন, তার একটি নমুনা :

যক্ষ সে কোনজনা আছিল আনমনা
সেবার অপরাধে প্রভুশাপে
হয়েছে বিলয়গত মহিমা ছিল যত
বরষকালে যাপে দুঃখতাপে।

নির্জন রামগিরি শিখরে মরে ফিরি
একাকী দূরবাসী প্রিয়াহারা,
যেথায় শীতলছায় ঝরনা বহি যায়
সীতার স্নানপূত জলধারা ॥[১০]

পরবর্তী কালে বুদ্ধদেব বসু এ শ্লোকের অনুবাদ করলেন :

জনক যক্ষের কর্মে অবহেলা ঘটল বলে শাপ দিলেন প্রভু, মহিমা অবসান, বিরহ গুরুভার ভোগ্য হল এক বর্ষাকাল, /বাঁধলো বাসা রামগিরিতে, তরু-গণ স্নিগ্ধচ্ছায়া দেয় যেখানে, / এবং জলধারা জনক তনয়ার স্নানের স্মৃতি মেখে পুণ্য।

রাজশেখর বসু এ শ্লোকের অনুবাদ করেছেন গদ্যে। সেখানে আমরা মূল ভাবানুবাদ পাচ্ছি :

নিজকার্যে অমনোযোগের জন্য কোনও এক যক্ষ কুবেরের শাপগ্রস্ত হয়। কান্তাবিরহে দুঃসহ একবর্ষভোগ্য ঐ শাপের ফলে বিগতমহিমা হয়ে সে রামগিরি-আশ্রমে বসতি করলে। ঐ স্থান স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুময় এবং তথাকার জল জনকতনয়ার স্নানহেতু পবিত্র।

কালিদাসের মূলকাব্য এবং এই-সব অনুবাদগুলি পাশাপাশি রেখে পড়লে বোঝা যায় কোনো কবিই ভাষান্তরিত অনুবাদ করেন নি। এখানের স্বল্প কয়েকটি নিদর্শন ছাড়াও আরো অনেকেই 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ করেছেন। এঁদের সকলের ভিতর দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদেরও একটি স্থান আছে।

অনেকের মতে মূলের ধ্বনি-মাধুর্যটি ছন্দের মাধ্যমে বজায় রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি আলোচনা স্মরণযোগ্য :

সংস্কৃত কাব্য অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, কাব্য ধ্বনিময় পদ্যে ছাড়া বাংলা পদ্যছন্দে তার গাম্ভীর্য ও রসরক্ষা করা সহজ নয়, দুটি চারটি শ্লোক কোনোমতে বানানো যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ কাব্যের অনুবাদকে সহজপাঠ্য ও সহজবোধ্য করা দুঃসাধ্য। নিতান্ত সরল পয়ারে তার অর্থটিকে প্রাঞ্জল করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে ধ্বনিসংগীত মারা যায়, অথচ সংস্কৃতকাব্যে এই ধ্বনিসংগীত অর্থসম্পদের চেয়ে বেশি বই কম নয়।[১১]

কাব্যসংগীতে সুর বাদ দিলে কেবলমাত্র কথার কোনো আবেদন থাকে না। সেরকমই মন্দাক্রান্তা বাদ দিলে 'মেঘদূত'-ও প্রাণহীন জড়বস্তু হয়ে যেতে

পারে। কিন্তু মন্দাক্রান্তা ছাড়াও পয়ার ত্রিপদীর সাহায্যেও যে 'মেঘদূত' কাব্যকে বেশ লোভনীয় করে তোলা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথই প্রথম তা প্রমাণ করলেন। এবং সে দিক থেকে বিচার করলে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'মেঘদূত'-ই বাংলায় প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা। ছন্দোবন্ধের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ মন্দাক্রান্তার অনুরূপ না হলেও রচনাটিতে যে উৎকৃষ্ট লিরিক স্বাদ পরিবেশিত হয়েছে তা সে যুগের কাব্যে বিশেষ দেখা যেত না :

দেখ যদি তুমি গিয়া সুখে আছে ঘুমাইয়া
খুলিও না গর্জনের মুখ,
স্বপনে পাইয়া মোরে বাঁধিয়াছে বাহু ডোরে
ঘুচাইয়া দিও না সুখ।

বনের মালতী জালে উঠাইয়া প্রাতঃকালে
সজল শীতল বায়ু দিয়া
জাগাইবে প্রেয়সীরে পরে তাহে ধীরে ধীরে
কহিবে কি দিতেছি বলিয়া।[১২]

এই অনুবাদ সংস্কৃত থেকে করা হলেও এটি খাঁটি বাংলা। ধ্রুপদী সাহিত্য নিয়ে চর্চা করলেও দ্বিজেন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বাঙালি। সেই কারণেই দেখানে কবি-অনুবাদকের নির্বাচিত শব্দের ব্যবহার কালিদাসের কাব্যে বাঙালিআনার ছাপ এনে ফেলেছে :

"একি ঝড়! মা গো মা দেখে লাগে ডর,
উড়াইয়া ফেলিল বা গিরির শিখর।"[১৩]

কিংবা

ময়ূর যতেক সবে, মত্ত হয়ে কেকারবে
সদা আছে পাখনা তুলিয়া।
সদাই জ্যোৎস্না জলে স্নান করি কুতূহলে
নিশি যায় আঁধার ভুলিয়া।[১৪]

যক্ষের অলকাপুরীতে আমরা কোনো একটি বাঙালি গৃহস্থের বাড়ির ছবিই দেখতে পাই। দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বোধনের মধ্যেও এখানে গৃহস্থালি রীতি বজায় রেখেছেন। এই রীতি পরে মধুসূদন এবং নবীন সেনের মহাকাব্যেও

রক্ষিত হয়। কিন্তু নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের বিরাট ধ্রুপদী মহিমাকে যেন এই ঘরোয়া রীতি বিনষ্ট করে ফেলেছে। নবীনচন্দ্র যখন লিখলেন, 'ছবি, ছবিখানি দিয়ে যাও দিদি'[১৫] কিংবা 'আমায় দেখ পিসিমা আমার'[১৬] বা 'দিদি যাহা কহ তুমি'[১৭] —তখন এ-সব ক্ষেত্রে যেন তাঁর মহাকাব্যসুলভ গাম্ভীর্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন লিখলেন, 'একি ঝড়! মাগো মা দেখে লাগে ডর' তখন তাঁর কাব্য এই সমবেদনা, এই একাত্ম হয়ে যাবার প্রচেষ্টায় এক লিরিক সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। পয়ার এবং দীর্ঘত্রিপদীতেই দ্বিজেন্দ্রনাথের সঞ্চরণ। এবং সম্ভবত এই ঘরোয়া রীতির প্রতি একটা স্বাভাবিক টান তাঁকে সংস্কৃত গুরুগম্ভীর মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুসরণ থেকে বিরত রেখেছে। 'স্মরিতে সে সব কথা / মরমে জনমে ব্যথা / জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা— ক্ষুদ্রায়তন সরল শব্দ, এখানে ছন্দে ৮-এর পর পদভাগ দ্বৈমাত্রিক লয়ের চালে খাঁটি বাংলা বাকস্পন্দকেই ফুটিয়ে তুলেছে। বিষয়গুণে এবং শব্দনির্বাচনে এখানে এমন একটি আধুনিক ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছে যা আধুনিক গীতিকবিতার স্টাইল।

সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা ভাষায় 'মেঘদূত' অনুবাদ করেন। ১৮৬০-এ তাঁর অনুবাদ প্রকাশের পর একশো বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। এবং এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, বুদ্ধদেব বসু, যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ অনেকেই 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ করেছেন। এঁদের অনেকের অনুবাদই সুন্দর, সার্থক। দ্বিজেন্দ্রনাথ কিন্তু, এতদিন পরেও, এত সব অনুবাদকের আড়ালে একটুও ম্লান হয়ে যান নি।

'মেঘদূত'-এ পরিণামী প্রেমের বর্ণনা ছাড়াও ঐশ্বর্যময়ী পূর্বমেঘ অংশে নিসর্গ বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়েছে। অলংকার, বিভাস, বৈভব এবং যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনা পাওয়া যায় উত্তরমেঘ অংশে। এই দুই অংশের কাব্যমহিমা দুই দলকে ভিন্ন ভাবে আনন্দ দিয়েছে। এদের শ্রেষ্ঠতা নিয়েও তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা গেছে। একদল পাঠকের মতে পূর্বমেঘ ভূমিকা। কালিদাসের কাব্য পূর্ণতা লাভ করেছে উত্তরমেঘেই। কেননা এখানেই তাঁর কাব্যের উৎকর্ষ। আবার অন্য এক দলের মতে উত্তরমেঘে কৃত্রিমতা বেশি থাকার জন্য পূর্বমেঘই শ্রেষ্ঠ। কবি 'মেঘদূত'-এ 'ইন্দ্রজালিকের ন্যায় যে রমণীয় দৃশ্য-

পরম্পরা দেখিয়েছেন— যাতে বিরহী যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও চেতন অচেতনের ভেদজ্ঞান লোপ পায়— তার তুলনা সর্বসাহিত্যে দুর্লভ।'[১৮]

দ্বিজেন্দ্রনাথের গৌরব যে তিনি অতি অল্প বয়সেই কালিদাসের কাব্যের গভীরতা বা তার ক্লাসিক তাৎপর্য ধরতে পেরেছিলেন। অনুবাদই ক্লাসিককে সজীব এবং সমকালীন করে তুলতে পারে। সেইজন্যই যুগে যুগে নতুন অনুবাদের প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই প্রয়োজনের দাবি মিটিয়েছেন।

গ্যেটে 'শকুন্তলা' সমালোচনা কালে অনুবাদকর্মকে তিন ধারায় ভাগ করেছেন[১৯] :

১. ভাববস্তুর সারসংক্ষেপ। (Prosaic, substance-oriented)
২. কৌতুকী অভিপ্রায়মূলক। 'Parodisch' (free rendering in conformity with the translator's intention)
৩. মৌলসৃষ্টির পাশাপাশি সমান্তর সৃষ্টি—ভাবনায় এবং আঙ্গিকে। (Creating artistic parallel to the original, in spirit and texture)

দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রধানত এই তৃতীয় ধারায় অনুবাদ করেছেন। কিন্তু কখনো কখনো যে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি এমন নয়।

গদ্য অনুবাদের পিছনে এরকম কোনো মনন নেই কারণ লেখক সেখানে প্রধানত ব্যাবহারিক। কাব্যে এই ব্যবহার-চেতনা অনেক কম। কবি সেখানে স্বাধীন। অনুবাদ এবং অনুবাদক প্রসঙ্গ আলোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় :

> গোতিয়েরর l'art pouer l'art পেটারের হাতে art for art's sake-এ নিবর্তিত হয়ে অবশেষে যখন সুধীন্দ্রনাথের মন্ত্রণায় কলাকৈবল্যবাদে পরিণত হয়, তখন না মেনে উপায় থাকে না শিল্প মুক্ত, যদিও সেই মুক্তির সর্ত সারা বসুন্ধরা থেকে পরিগ্রহণ। এবং যে যথার্থ শক্তিমান সেই তো পারে প্রদত্ত উপহার আত্মমূল্যায়নের উদ্দেশ্যে অর্জন করে নিতে। যখন সুধীন্দ্রনাথের পরিচর্চায় শেক্সপীয়রের life হয়ে ওঠে বিভূতি অথবা জীবনানন্দের 'মায়াবীর মতো জাদুবলে' ইয়েটসের passion হয় রক্তিম বাসনা তখন কি এটাই আমরা অনুভব করি না যে অনুবাদ আসলে একটা চমৎকার ছল নিজেকে আবিষ্কার করার একটা চরম বিনীত উপায়?[২০]

অনুবাদকের সর্বত্র নিজেকে মুক্ত করার অভীপ্সা সুগোচর। নিম্নলিখিত উক্তিটি বিশেষ সময়ে বিশেষ কোনো লেখার জন্য করা হলেও তা সকল সময়েই প্রযোজ্য :

> মূলের ভাবটাকে বাংলায় যথাসাধ্য বোধগম্য করতে গেলে একেবারে ঠিক তার মাপসই করে আঁট করা চলবে না। তাই প্রতিরূপ না হয়ে কতকটা অনুরূপ হয়েছে। মূল কবিতার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই তাঁরা যে জলের মত বুঝবেন এমন আশা নেই, কিন্তু সেজন্য আমি বা বাংলাভাষাই যে একমাত্র দায়ী এমন কথা মানতে পারিনে।[২১]

যে মুহূর্তে অনুবাদকের এই প্রেরণা সম্ভব হল, তখনই জন্ম হল একটি কবিতার, তখন সেইটি হল কবির এক অভিজ্ঞতা। এই নবতম অভিজ্ঞতা এবং কবির ব্যক্তিত্বের সৃষ্টিতে গড়ে উঠল এক নূতন গ্রহণীয় উপাদান। এর ফলে এখানে ঘটল আত্ম আবিষ্কার। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'মেঘদূত'-এ ও কালিদাসের ধ্রুপদী মনের পাশে পাশে দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের প্রকাশ। ১৭৮১ শকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'মেঘদূত' সমালোচনা প্রসঙ্গে যে মূল্যায়ন করেন তা অযৌক্তিক নয় : 'ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে বঙ্গ ভাষায় কালিদাসের কাব্যের যে সকল অনুবাদ প্রকটিত হইয়াছে তার মধ্যে প্রস্তাবিত মেঘদূত কোনমতে কনিষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে না।'[২২]

এই 'মেঘদূত' কাব্যখানি ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রনাথ কিছু ছোটো ছোটো সংস্কৃত কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। 'নবরত্নমালা' নামক সংকলন-গ্রন্থে ঠাকুর-পরিবারের চার ভাইয়ের অনুবাদ আছে। সংগ্রাহক সত্যেন্দ্রনাথ ভূমিকায় স্বীকার করেছেন :

> ইহাতে সংস্কৃতের যে সকল অনুবাদ আছে তন্মধ্যে আমার নিজের ছাড়া কতকগুলি শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের কৃত— কতক শ্রীমান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে— কতক বা পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম হইতে সংগৃহীত।[২৩]

'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম'-এর বেশ কিছু কবিতার অনুবাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ করেছেন। তৎকালীন সাময়িক পত্রেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় :

> নবরত্নমালা··· শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। অনুবাদ অধিকাংশই গ্রন্থকারের নিজের, দ্বিজেন্দ্রবাবু, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু ও রবীন্দ্রবাবুরও কিছু কিছু আছে।[২৪]

দ্বিজেন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত অনুবাদ পাচ্ছি।

মূল :

দ্বা সুপর্ণা সযুজঃ সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ এর ভাষান্তর করলেন :

সুন্দর দুটি পক্ষী থাকে সখ্যে মিলি এক বাস বৃক্ষে।
একটি খায় স্বাদু ফল, না খাইয়া অন্যটি নিরিক্ষে ॥
দৈন্যে আপন শোকে ভোক্তাটি শোক
তার ঘুচি যায়।
মহিমা আপন সখা পাখিটিতে দেখিবারে যবে পায়।[২৫]

কবি এই সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হলেন না; সঙ্গে সঙ্গে 'অর্দ্ধে অর্দ্ধে একের পূরণ' নামক নিম্নলিখিত একটি রূপক পদ্যও লিখলেন—

অর্দ্ধে অর্দ্ধে একের পূরণ

(রূপক পদ্য)

দ্রষ্টা অর্দ্ধ ॥ (স্বস্থানে থাকিয়া) ॥
এলে তুমি কাঁপায়ে মহী, রণের যেন তুরগ।
ভোক্তা অর্দ্ধ ॥ (দূর দেশ হইতে আসিয়া) ॥
কোথায় মহী জানিনা আমি, স্বর্গের এ স্বরগ।
অমৃত রাশিতে গলিয়া গেল বিন্ধ্য হিমাচল।
নিভিয়া গেল যুগান্তের দুঃখ দাবানল ॥
দ্রষ্টা অর্দ্ধ ॥ কি এনেছ সে দেশ থেকে দেখিতে
পিয়াছে সাধ।
ভোক্তা অর্দ্ধ ॥ এনেছি উপবাসী হিয়া, ক্ষমহ অপরাধ ॥
তৃষী অগস্ত্য ঋষি একজন আছে আমার ভিতর।
মিটিছে না আশ, পিয়া এ আজ মিলন সুধা সাগর।[২৬]

এই অনুবাদ এবং তারপরে আর-একটি পদ্য রূপকের রচনার ভিতর দিয়ে

দ্বিজেন্দ্রনাথের কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষণীয়। উপনিষদের গুরুগম্ভীর নীতিমূলক কবিতার নীতির বেড়াজালেই তিনি আবদ্ধ থাকলেন না। তাই এ কবিতা পড়েও তাঁর কবিমনে 'উপবাসী হিয়া', বা 'সুধা সাগরের' কল্পনা জেগেছে।

ছোটো ছোটো কিছু ইংরেজী proverb ও সংস্কৃত প্রবচনের তিনি অনুবাদ করেছেন। কখনো বা সরাসরি অনুবাদ না করে তার ভাবটুকু গ্রহণ করে তিনি কাব্য সৃষ্টি করেছেন।

নিম্নে তাঁর এরকম কয়েকটি সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ :

মূল ॥ ইতর দুঃখ শতানি যদৃচ্ছায়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ ॥

অনুবাদ ॥ আর যা দ্যাও বিধি দুঃখ মোর
লইব মাথা করি হেঁট
লিখনা গো লিখনা কপালে মোর
অরসিকে রসের ভেট।[২৭]

ত্রিপথগা আনন্দলহরী থেকে :

১. ব্রহ্মার কমণ্ডলুনিঃসৃতা মন্দাকিনী লহরী
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।
ন বিভেতি কদাচন ॥

অনুবাদ :

ব্রহ্মের আনন্দ যে বুঝিয়াছে
ডরে না কভু সে কাহারো কাছে।[২৮]

২. শঙ্কর শিরোধৃতা গঙ্গালহরী
যোগ রতো বা ভোগ রতো বা
সঙ্গ রতো বা সঙ্গবিহীনঃ
পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তো
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব

যোগরত হোক্ বা ভোগরত হোক্ সঙ্গহীন বা সঙ্গরত
ব্রহ্মে যে জন যোজিতচিত্ত আনন্দ তার অনবরত ॥

উপনিষদে অতি পরিচিত কিছু শ্লোকের অনুবাদে দ্বিজেন্দ্রনাথ :

ক. রসো বৈ স :

রসময় তিনি ; কি মধু, আহা,
সেই জানে যে পেয়েছে তাহা !
আনন্দরূপে ব্যাপিয়া আকাশ
না থাকিলে সেই স্বয়ং প্রকাশ,
বাঁচিয়া রহিত কে তবে আজ.
চলিত বলিত করিত কাজ ?
আনন্দামৃত জীবের প্রাণ
সব আনন্দ তাঁহারি দান ॥
নাহি তাঁর রূপ নাহি আধার ।
কায়মনের অতীত পার ॥[২৯]

খ. শৃণ্বন্তুবিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ :

শুন দিব্যধামবাসী অমৃত সন্তান
শুন দিব্যধামবাসী অমৃতের যতেক সন্তান
জানিয়াছি আমি সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ মহান—
আদিত্যবরণ তিমিরের পার, তাঁরে জানিয়াই
মরণ এড়ায়ে জীব, নিস্তারের অন্যপথ নাই ॥
আপনাতে ভর করি রয়েছেন যিনি এই নিত্য,
জানিবারই বস্তু তিনি, যে জানে সে হয় কৃতকৃত্য ।[৩০]

স্মরিহে তোমায় প্রভু, একচিত্তে ভজি হে তোমায়
জগতের সাক্ষীরূপে, মিলে সবে নমি তব পায় ।
সত্যে এক নিরালম্ব, মহা ঈশ, সর্বমূলাধার
লইনু শরণ তব, ভবার্ণবে তুমি কর্ণধার ॥[৩১]

কিছু কিছু দু-চার পঙ্‌ক্তির শ্লোক মূলানুবাদ বা ভাবানুবাদ করে তিনি তাদের

আখ্যায়িত করেছেন। সেগুলিতে যেন রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'-র পূর্বাভাস বলা যেতে পারে :

ক. আত্মপ্রসাদ

অন্তরাত্মা তোমার সন্তোষ মানে যেইরূপ কাজে,
করিবে তা সযতনে ; করিবে না হৃদে যাহা বাজে।[৩২]

খ. নির্বৈর

অতিবাদ সহিবে, অবজ্ঞা করিবে না কোন জনে,
ধরি এই মর্ত দেহ, বৈরী করিবে না কারো সনে॥[৩৩]

গ. পরনিন্দা

পরনিন্দি সাধু হয় যেমন দুঃখিত
দুর্জন তেমনি হয় হর্ষে পুলকিত॥[৩৪]

উপনিষদের শ্লোকের আরো দু-একটি অনুবাদ :

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ
সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।

দ্বিজেন্দ্রনাথের হাতে অনূদিত হল :

না ছিল এসব কিছু শুন শিষ্য প্রিয়,
ছিলেন কেবল সৎ এক অদ্বিতীয়॥[৩৫]

মূলের স্বাভাবিক গতিরূপ ও স্বতঃস্ফূর্তিভাব বজায় রাখা যদি সার্থক অনুবাদের একটি মানদণ্ড হয়, তবে সেদিক থেকে বিচার করলে, দ্বিজেন্দ্রনাথের এ-সব অনুবাদগুলি অসামান্য।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্য ভালো লেগেছিল। তার অফুরন্ত কাব্য-ভাণ্ডার থেকে রসগ্রহণে তিনি সক্ষম হন। এবং অনুবাদের ভিতর দিয়ে আমাদেরও তার কিছু ভাগ দিয়েছিলেন। পরে যদি তিনি বিশেষভাবে দর্শনের মধ্যে ডুবে না থাকতেন তবে হয়তো আমরা তাঁর নিকট আরো কিছু ভালো কাব্যানুবাদ পেতাম।

প্রাচীন কাব্যের রসমাধুর্য, তার গভীরতা তাঁর যেমন ভালো লেগেছিল তেমনি আধুনিক বিদেশী কবির সনেটের ভাবমাধুর্যও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই তিনি তার অনুবাদ করলেন।

ডিরোজিও-কৃত মূল সনেট :

To India—My Native Land

My country ! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast.
Where is that glory, where that reverence now ?
Thy eagle pinion is pinned down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou ;
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery !
Well-- let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold ;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country ! One kind wish from thee ![৩৬]

দ্বিজেন্দ্রনাথের রূপান্তরে :

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার ; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্যপদ ! মহিমা কোথায় !
গগন বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ

এ শ্রমের এইমাত্র পুরস্কার গণি
তবু শুভাধ্যায় লোকে, অভাগা জননী।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ডিরোজিওর কবিতা অনুবাদ করলেন বলে এমন নয় যে তিনি ডিরোজিও-পন্থী ছিলেন। যুগধর্মের সঙ্গেই ব্যক্তিধর্মের সম্পর্ক থাকে। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর যুগের বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি সকলের কাছ থেকে স্বকীয় জগতে সরে এসেছেন।

এখানে উল্লেখ করলে বোধহয় অন্যায় হবে না ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রগতিশীলদের কাছে গীতাস্বরূপ যে-বই *Age of Reason* তার লেখক Thomas Paine-এর মৃত্যু হয় ১৮০৯ খৃস্টাব্দে। সেই বছরই ডিরোজিওর জন্ম। ডিরোজিও যেন প্রগতিবাদীদের উত্তরাধিকার তুলে আনলেন এবং তার সঙ্গে একটা ক্রপদী চেতনা যুক্ত করলেন। ডিরোজিও নতুন করে গড়ে তোলার জন্য সব-কিছু ভাঙতে চান নি। অতীতের সঙ্গে একটা সচেতন সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিলেন।[৩৭]

দ্বিজেন্দ্রনাথ যে এঁরই কবিতা অনুবাদ করলেন এটাই যেন স্বাভাবিক। দ্বিজেন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধ এবং যুগচেতনা দুইই ছিল অত্যন্ত তীব্র। তিনি তাই প্রথাকে বর্জন করে ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই প্রবর্তনা অনেকটাই যেন ডিরোজিও যুগের ফলশ্রুতি।

আপন বক্তব্য পরিস্ফুট করবার জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রেরও আংশিক অনুবাদ করেছেন :

To gild refined gold, to paint the lily,
To throw a perfume on the violet,
To smooth the ice, or add another hue
Unto the rainbow, or with taper-light
To seek the beauteous eye of heaven to garnish,
Is wasteful and ridiculous excess.

কাঞ্চনে সোনালি কাজ শ্বেতপদ্মে চুনকাম করা,
গন্ধ ছিটাইয়া দেওয়া বিকসিত গন্ধ রাজফুলে,
হিমশিলা পেশল করিতে যাওয়া মাজিয়া ঘসিয়া,

ইন্দ্র-ধনুকের গায়ে নূতন রঞ্জন বিলেপন,
অথবা সুন্দর আঁখি দ্যুলোকের, নব দিবাকর,
মশালের আলো দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস,
অপব্যয়-সার ; হেন অত্যাচার উপহাসাস্পদ।[৩৮]

দীর্ঘ পয়ারের মাধুর্যে এই অনুবাদে শেক্সপীয়রীয় লালিত্যগুণ আছে কিনা সন্দেহ কিন্তু এক ধরনের স্বাভাবিক সংহতি ও সৌন্দর্য যে আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

এটি ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রনাথ দু-একটি ইংরেজি প্রবাদ প্রবচনের সার্থক অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'-র কবিতায় এই ধারা লক্ষিত হয়।

There is many a slip between the cup and the lip ; এই অতিপরিচিত বাক্য দ্বিজেন্দ্রনাথের হাতে এই রূপ পেল :

হাতে আছে পাত্রখানা
ঠোঁটে পাবে কুল
মাঝের পথে ঝগড়া নানা
বলে জোহান বুল॥ (John Bull)

এই রচনার আবার নিম্নলিখিত রূপও পাওয়া যায়। এখানে মূলের কেবলমাত্র ভাবটুকু বজায় আছে :

বিলম্বে হয় কার্যহানি
শাস্ত্রে দেয় বিধি
শ্রেয়সি বহু বিঘ্নানি
বলে বিদ্যানিধি।[৩৯]

বাংলা থেকে ইংরেজিতেও সার্থক ভাষান্তর তিনি করেছেন। প্রসঙ্গত দ্বিজেন্দ্র-অনূদিত বাউলের এই তর্জমাটি উল্লেখযোগ্য :

বাউলের গান

গোলে মালে মিশায়ে আছে
ও তার গোল ছেড়ে মাল লও রে বেছে।

শুনেছি বৈষ্ণবের করণ
বালির সঙ্গে চিনির মিলন ;
ও তা জানে দুই একজন ;
ও তা মত্ত হস্তী টের পেলে না
চেঁউটি মরম জেনেছে ॥

অনুবাদ :

Harm and money dwell together in harmony
Leave the harm and get the money
I have heard of the meth d pursued
by the worthy people of God :—
Sugar is mixed with the sand ; only
one or two men knew it,
The big elephant knows nothing
of it ; but little ant knows the secret.[৪০]

কেবল কাব্যানুবাদই বা কেন তিনি কিছু গদ্য অনুবাদ করেছেন এমন বলা যায়। তাঁর 'গীতাপাঠ' গীতার একেবারে বর্ণানুক্রমিক অনুবাদ না হলেও তাঁর এই গ্রন্থ অনুবাদ পর্যায়-ভুক্ত। এখানে তিনি গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। এবং ব্যাখ্যাকালীন, আপন বক্তব্যের সমর্থনে ও বিশ্লেষণে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন দার্শনিকের মতামতের অবতারণা করেছেন। কান্ট, বেন্থাম, সাংখ্য, কপিলমুনি সকলের কথা উত্থাপন করেছেন 'কেবল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন-শাস্ত্রের ভেদাভেদের মোটামুটি রকমের একটা আদর্শ শ্রোতৃবর্গের বিবেচনা ক্ষেত্রে আনয়ন করিবার উদ্দেশে।'

গীতা সর্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক। তাই গীতার মতে যাঁর মন নিষ্কাম, অনাসক্তভাবে যিনি মঙ্গলের পথে যান এবং সর্বকালে যিনি ঈশ্বরমুখী তিনিই মহাপুরুষ। প্রয়োজনমত মূলের সাহায্য নিয়ে এবং প্রধানত গীতার মূলধারা থেকে সরে না গিয়ে, তিনি শ্লোক-অনুবাদ এবং ব্যাখ্যার সাহায্যে গীতার মূল বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

'গীতাপাঠ' এর সূচনা সম্বন্ধে একটি স্মৃতিচিত্রণ পাওয়া যায় সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর বইয়ে :

একদিন বড়োবাবু নিচুবাংলা থেকে বিকেলবেলায় আশ্রম বিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ নন্দীর ভাষাতেই বলি : 'সব ছেলেরা মাষ্টারমশায়রা বিকেলের খেলার মাঠে— আশ্রম স্তব্ধ শান্ত, সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে মাঠের কোলে। এমনি স্তব্ধ শান্ত দিন— সন্ধ্যার অপূর্ব সন্ধিক্ষণে হঠাৎ এসে প্রাক্-কুটিরের ও লাইব্রেরির মধ্যস্থানে উপস্থিত হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। কে কে সে সময় তাঁকে দেখেছিলাম মনে নেই। আমি সেখানে ঘটনাচক্রে উপস্থিত ছিলাম।··· খবর পেয়ে সেখানে শাস্ত্রীমশায় এসে হাজির হলেন। তখন বড়বাবু বললেন, 'দেশের বড়ো অভাব, দেশের বড়ো প্রয়োজন, তাই ভাবছি গীতা সম্বন্ধে আমি কিছু লিখতে আরম্ভ করব।' এর পরই তাঁর সেই নিজের তৈরি ছোটো খাতার পৃষ্ঠা মুক্তাক্ষরে ভরে উঠতে লাগল পাতার পর পাতা। আর এক এক অধ্যায় শান্তি-নিকেতনের দোতলা ঘরে সপ্তাহ দু সপ্তাহ বাদেই পাঠ হতে লাগল। অধ্যাপক অনেকেই, আমাদের মত দু চারজন অর্বাচীন, আর স্বয়ং ছোট ভাই রবি সে পাঠে উপস্থিত হতে লাগলেন। গীতাপাঠ— তার অপূর্ব-ভাষা— অপূর্ব সূচনা— সবার উপরে অপূর্ব মানুষটির সেই আনন্দময় চেহারা আর হাসির সুযোগ হলে একবার সকলের দিকে চেয়ে প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়া, সে এক চিরস্মরণীয় ব্যাপার।[৪১]

দ্বিজেন্দ্রনাথ কাণ্ট প্রমুখ বিদেশী দার্শনিকগণের রচনা খুব ভালো করে পড়েছিলেন। তাঁদের মতামতের প্রভাব এবং তাঁদের বিষয়ে আলোচনা তাঁর অজস্র রচনায় দেখা গেছে। তবে এঁদের কারো রচনাই তিনি সরাসরি অনুবাদ করেন নি।

মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি অথবা বিদেশী শব্দ ভাষান্তরের মধ্য দিয়ে গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন। বাংলাভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করতে হলে কিছু কিছু শব্দকে অনুবাদ করে গ্রহণ করে নিতে হবে।

বাংলা পারিভাষা রচনার কাজে দ্বিজেন্দ্রনাথের দক্ষতা অপ্রতিম। আলোচন প্রসঙ্গে বলা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের কিছু পরে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের শিক্ষক, জগদানন্দ রায়ও[৪২] পরিভাষার কাজে হাত দিয়েছিলেন। বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পুরোধা এই পুরুষ তাঁর রচনায় প্রয়োজনমত

কিছু কিছু শব্দ বাংলায় গ্রহণ করেছেন ; আর কিছু শব্দের নূতন পরিভাষা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ও তাঁর রচনার খাতিরে শব্দ ভাষান্তরিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য দিকের মতো 'পরিভাষা' বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন, তিনি প্রচুর নতুন নতুন পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন। বাংলাভাষায় নতুন শব্দ প্রণয়নে তাঁর অবদান অসামান্য। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'কেবল পরিভাষা নহে, সকল প্রকার আলোচনাতেই আমরা এমন অনেক কথা পাই যাহা ইংরেজি ভাষায় সুপ্রচলিত, অথচ যাহার ঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় নাই। ইহা লইয়া আমাদের পদে পদেই বাধা। আজিকার দিনে সে সকল কথায় প্রয়োজন উপেক্ষা করিবার জো নাই।... আমরা প্রতিশব্দ বানাইবার চেষ্টা করিব।'[৪৩]

দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট ভাবতেন ; অনুবাদ করতে গিয়ে কোন্ শব্দ জাতীয়-স্মৃতির অনুষঙ্গে কতদূর খাপ খাবে এ বিষয়ে তিনি চিন্তা করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর পত্রে : 'বিগত পত্রে phoenix-এর বাংলা নাম দিয়েছি ব্যাঙ্গমা। এ নামটি নিতান্ত অসঙ্গত নয় যেহেতু উভয়েই ছেলে ভুলনিয়া উপন্যাস মুলুকের পক্ষী।'[৪৪]

ভাষান্তর বা শব্দের অনুবাদের আগে তাঁর চিন্তার পরিষ্কার ছবি তাঁর প্রবন্ধেও ফুটে উঠেছে :

> ইংরাজী কথা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিবার বিহিত প্রণালী কিরূপ তাহা যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে তাহার সন্ধান আমি আপনা-দিগকে দুই কথায় বলিয়া দিতে পারি, তাহা এই যে, যে পর্যন্ত অনুবাদিত রচনাটি **ভাবাংশের মূলের মতো,** আর **ভাষাংশে মনের মতো না হয়,**[৪৫] সে পর্যন্ত তাহাকে হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না দেওয়া। এইরূপ প্রণালীতে অনুবাদের নদী সন্তরণ করিয়া আমি অনেকানেক স্থলে কূল প্রাপ্ত হইয়াছি, তবে মাঝপথে হাবুডুবু খাইয়াছিও বিস্তর।[৪৬]

উৎকলন সংখ্যাতিরিক্ত হয়ে পড়লেও পরবর্তী দু-একটি দৃষ্টান্ত এখানে একান্তই প্রাসঙ্গিক। এই-সব দৃষ্টান্ত থেকে অনুবাদের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর বিবেকী প্রবণতার নিগূঢ় পরিচয় ধরা পড়ে :

> আমার কোনো শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অনেক কাল হইল আমাকে একদিন কথায়

কথায় বলিয়াছিলেন যে, Centripetal এবং Centrifugal force তিনি অনুবাদ করিয়াছেন— কেন্দ্রবাহিনী এবং কেন্দ্রবর্জিনী শক্তি। আমি দেখিলাম ঐ অনুবাদ ভাবাংশে যদিও মূলের অনুরূপ কিন্তু ভাবাংশে 'ইংরাজি অনুবাদ' এই বৃত্তান্তটি উহার গায়ে টিকিট মারা রহিয়াছে। আমি তাই উহাকে ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া কহিলাম **কেন্দ্রানুগা** এবং **কেন্দ্রাতিগা** শক্তি।[৪৭]

অথবা, অনুবাদকর্মে তাঁর ক্লান্তিহীন শব্দ-সচেতনতা :

organized labour— এ রচনাটির অনুবাদ আমার বিবেচনায় 'যন্ত্রবদ্ধ পরিশ্রম' হইলে মন্দ হয় না। organ = যন্ত্র ; organization = যন্ত্র-বন্ধন ; organized = যন্ত্রবদ্ধ।

'যন্ত্রবন্ধন' কথাটাকে আপনারা যতটা ইংরাজি অনুকরণ ঠাওরাইতেছেন —বাস্তবিক উহা ততটা নহে। ষড়যন্ত্র শব্দটা তাহা সংস্কৃত। তা ছাড়া, আমরা সচরাচর কথায় বলি 'অমুক কাজটা যোগাড় যন্ত্র করিয়া করা চাই।'

দ্বিজেন্দ্রনাথের মতে :

অনুবাদের উভয় সঙ্কট। (১) অনুবাদ যদি মূলের অবিকল প্রতিবিম্ব না হয়, তবে তাহা অনুবাদ না— তাহা অন্যায়বাদ— আবার (২) অনুবাদ যদি আপনাকে মূলের অবিকল প্রতিচ্ছবি করিতে গিয়া বিদেশীয় ঢঙের স্বদেশীয় ভাষার সং সাজিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে তাহা অনুবাদ না— হনুবাদ।[৪৮]

নীচে দ্বিজেন্দ্রনাথের সৃষ্ট কয়েকটি শব্দের একটি তালিকা দেওয়া হল। এই তালিকা থেকে বোঝা যাবে, অনুবাদ দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে একটি সামগ্রিক জীবনকর্মের অন্তর্গত কার্যক্রম। পারিভাষিক শব্দকে তিনি নিছক পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত করে তোলেন নি, এই শব্দের অনুবাদ কোথাও কষ্টকল্পিত নয়। শব্দগুলির সহায়তায় আমাদের জাতীয় মানসিকতার স্বধর্ম বজায় রেখে তিনি তাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এইখানেই অনুবাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের সঠিক পরিচয়।

'প্রবন্ধমালা'

Parallel-running—সহানুপাতী, পৃ ১৫০

Non Conductor—রোধক ; Conductor—সঞ্চারক ;

Mechanics—যন্ত্রবিদ্যা, পৃ ১৭১

Probe—এষণী, পৃ ১৭৬ ; Shirt—অঙ্গরাখা, পৃ ১৮০
Collor—গলাসী, পৃ ১৮৯

'নানাচিন্তা'

Shackles of Indolence—অবসাদের শিকল, পৃ ১৭ ; Instinct—সংস্কার, পৃ ৫৮ ; Protoplasm—জীবাঙ্কুর, পৃ ৫৯ ; Raw material—কাঁচা সামগ্রী, পৃ ১৯০ ; Division of Labour—শ্রমের বিভাজন, পৃ ১৯০-৯১ ; Nerve—তৈজস তন্তু ; Tendon—স্নায়ু ; Ganglion—তৈজস পিণ্ড, পৃ ১৯১ ; Lever—তোলক, Pendulum—দোলক, Screw—আবর্তক, পৃ ১৯২ ; Spring—প্রস্থাপক, পৃ ১৯৩ ; Organ—যন্ত্র ; Organization—যন্ত্রবন্ধন ; Organized—যন্ত্রবদ্ধ, পৃ ২০০ ; Organic Chemistry—শারীরিক রসায়ন, Inorganic Chemistry—ভৌতিক রসায়ন, পৃ ২০১ ; Moral Science—ধর্মতত্ত্ব, Moral Maxim—ধর্মনীতি, পৃ ২০৫ ; Conscience—অন্তরাত্মা, Conscientiousness—ধর্মভীরুতা, Discrimination—বিবেক, পৃ ২০৮ ; Wisdom—ফলজ্ঞান / (প্রজ্ঞা), Science—শাখাজ্ঞান / (বিজ্ঞান) ; Consciousness—সংজ্ঞা, পৃ ২৭১

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ১৮২৭, পৃ ৯৩—

Burning glass—প্রদাহক কাচ, vegetation system—প্রাণময় কোষ ; Brain—বিজ্ঞানময় কোষ ; Consciousness—সংবিৎ ; Self-Consciousness—চৈতন্য ; Sensation—চেতনা ; Apply—যোজনা ; Globular space—গোলাকৃতি শূন্যস্থান ; Rigid Body—দৃঢ় বস্তু

'ভারতী', ১২৮৪

পৃ ৮৮—Accidental—যৌগিক ; Arbitrary—যদৃচ্ছা সম্ভূত
পৃ ৪০৩—Linear Extension—রেখায়তন ; Superficial Extension—ক্ষেত্রায়তন ; Solid Extension—পিণ্ডায়তন।

—

৮

গদ্যশিল্পী

গদ্যরচয়িতা দ্বিজেন্দ্রনাথ যেখানে তাঁর 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর রাজ্য ছেড়ে 'প্রবন্ধমালা' বা 'নানাচিন্তা' রচনা করেছেন সেখানে তিনি যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান নি বা যেতে চান নি। তাই "নব্যবঙ্গের স্থিতি এবং গতি", "আর্যামি এবং সাহেবিআনা", "কাল্পনিক ও বাস্তবিক দুই ভাগের দুই লোক", "বাবুর গঙ্গা-যাত্রা" বা "সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা"— প্রভৃতি রচনাগুলি যে-নামেই আখ্যায়িত হোক-না-কেন তারা সকলেই সেই যুগের মধ্যে আবদ্ধ।

প্রবন্ধকার তাঁর যুগের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেও তাঁর মন কোনো এক স্থানে বদ্ধ থাকে না। সেজন্যই প্রবন্ধকারের মনের বিকাশ অনুযায়ী তাঁর রচনার ভিতর নানামুখী চিন্তাধারা প্রকাশ পায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ কখনো কান্টের দর্শন আলোচনা, কখনো বা উপসর্গের অর্থবিচার করেছেন। আর কখনো বা সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসার বিধান দিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের বহুমুখী বিষয় অবলম্বনে রচনার প্রমাণে পর পর কয়েকটি উদ্ধৃতি রাখা হল :

> হৃদয়ের যে সভ্যতা তাহাই মুখ্য সভ্যতা— আর আর যত প্রকার সভ্যতা সবই গৌণ সভ্যতা।··· মুখ্য সভ্যতা তাহাকেই বলে যাহা হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হয়, অভিন্ন আর যতপ্রকার সভ্যতা সমস্তই বাজে সভ্যতা।[১]

দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বসচেতন হলেও দেশজ রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনে বিদেশী রীতিনীতি গ্রহণেও তাঁর আপত্তি ছিল না। ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় দুই সভ্যতার সংমিশ্রণেই যে প্রকৃত মঙ্গলের জন্ম তাই তাঁর মনে হয়েছিল :

> আর্যামিকে আমি এজন্য ভাল বলি যেহেতু তার গর্ভে আর্যোচিত কার্য ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় জাগিতেছে; আর সাহেবিআনাকে আমি এইজন্য ভাল বলি যেহেতু তার গৃহাভ্যন্তরে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা গোকুলে বাড়িতেছে। আর্যামির গর্ভ হইতে যখন আর্যোচিত কার্য ভূমিষ্ঠ হইয়া কালক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিবে তখন সে উনবিংশ শতাব্দীর

সভ্যতার পাণিগ্রহণ করিবে; তাহার পরে আর্যোচিত কার্যের ঔরসে এবং উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার গর্ভে তিলোত্তমার ন্যায় একটি পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে; তাহার নাম পঞ্চবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা; এ সভ্যতার গাত্রে ভারতবর্ষীয় আর্যদিগের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং ইউরোপীয় আর্য-দিগের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ দুই একাধারে সম্মিলিত হইবে— এই যেদিন হইবে সেইদিন ভারতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দিনের অবসান হইবে··· ।[২]

দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশ্বাস পুরাতনকে সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্জন করলে নূতনের বিকশিত হবার সম্ভাবনা কম :

পুরাতনের ভিত্তিভূমির উপর কি রূপে নূতনের মূলপত্তন করতে হয় তাহা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না। আমাদের আপনাদের দেশের স্বর্গীয় মহাত্মারা— রামমোহন রায় প্রভৃতি সংস্কারকেরা আমাদিগকে তার প্রকৃত পদ্ধতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দু-সমাজের সংস্কারক ছিলেন··· উচ্ছেদক ছিলেন না। তাঁহারা স্বজাতির হীনতা-সূচক কুসংস্কারগুলি কেবল মানিতেন না, তদ্ভিন্ন কেমন করিয়া গৌরব রক্ষা করিতে হয়, তাহা তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতেন।[৩]

দ্বিজেন্দ্রনাথ মনে করতেন পুরোনো সংস্কারগুলিকে পরিমার্জন এবং সংশোধন করা আধুনিকতার লক্ষণ। আধুনিকতা বলে পুরোনো সংস্কার বিচারের দ্বারা যাচাই করে নিতে এবং যা বর্জনযোগ্য তাকে বর্জন করা এবং যা সংরক্ষণ-যোগ্য তাকে রক্ষা করতে হবে। 'কালের ইঙ্গিতকে প্রাণের দ্বারা উপলব্ধি করা, স্থাণুতাকে দূর করে ব্যক্তির জীবনকে ও সমাজকে গতি দেওয়ার চেষ্টা করা এবং গতির পাগলামিকে আদর্শের লাগাম দিয়ে বশীভূত করে সংযত করা'[৪] আধুনিকতার মূল কথা। এই অর্থে দ্বিজেন্দ্রনাথ আধুনিক।

বাক্য এবং অর্থে যেমন যোগাযোগ, ব্যক্তি ও তাঁর বক্তব্যেও সেরকম একটা যোগাযোগ রয়েছে। অবশ্য মনন সাহিত্যের পার্শ্বস্থিত যে রূপটিকে আমরা রম্যরচনা নাম দিয়ে থাকি মনটেন-বর্ণিত সেই রচনাগুলিতে (personal essays) উত্তম পুরুষেরই প্রাধান্য। প্রথমোক্ত রচনারীতি অস্মিতা প্রধান রচনারীতি না হলেও সেখানে লেখার অন্তরালে লেখকের অনতিপ্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব (consubstantiality) পাওয়া যাবে।

কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব কথাটিকে এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত কৌলীন্য আরোপ

করা দুই কারণে ভুল হবে। প্রথমত উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাসাহিত্যে প্রবন্ধ জাতীয় যে লেখায় সূত্রপাত ঘটে, ঐতিহাসিক কারণে মনে রাখা উচিত সেগুলি 'প্রস্তাব' নামে অভিহিত হত। রামমোহন থেকে শুরু করে অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র ঐ ধারার পোষকতা করেছিলেন। প্রধানত সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কখনো দেশবাসীর ভ্রান্তি কখনো কুসংস্কার অপনোদন— এই উদ্দেশ্যেই এঁরা লেখনী ধারণ করায় ঐ নামটিই যুক্তিযুক্ত ছিল।

বাংলা গদ্য অনেকটা ভারসাম্য এবং ব্যবহারযোগ্যতা পায় অক্ষয়কুমারের হাতে। সেই গদ্যে স্পন্দগুণ সৃষ্টি করলেন বিদ্যাসাগর। প্রধানত ব্যাবহারিক প্রয়োজনেই এই গদ্য সৃষ্টি হল। সম্পূর্ণভাবে না হলেও, অংশত, দ্বিজেন্দ্রনাথও এই-সব সংস্কারধর্মী-লেখকদের সঙ্গে সমধর্মী ছিলেন। তাই অনেকসময়েই তাঁর সংস্কারধর্মী মন— কিভাবে দেশবাসীর চলা উচিত, কিভাবে দেশের উন্নতি সম্ভব— এ-বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে। তখন তিনি পাঠকবর্গকে তৎপর হতে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন :

> কিরূপে ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হইতে হয় তাহার সুবিজ্ঞ প্রণালী পদ্ধতি বিধিমত প্রকারে শিক্ষা করুন ; শিক্ষা করিয়া তদনুসারে তৎপরতার সহিত স্বকার্যে প্রবৃত্ত হউন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র— ইংরাজীতে যাহাকে বলে petty intrigues সেই সকল কর্মনাশা জঞ্জালগুলা সমূলে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া ঘর পরিষ্কার করুন ; ঘর পরিষ্কার করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে মূলমন্ত্র অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে cause সেই মূলমন্ত্র জপ করুন।··· সকলের সহিত সকলে একত্র হইয়া কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগুন।[৫]

দ্বিজেন্দ্রনাথের গঠন অনেকটা যুক্তিবাদী তার্কিকের। তা অনেকটা বংশলালিত্য এবং কতকটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমন্দ্রিত। সাহিত্য সমালোচনায় ব্যবহৃত 'মন্ময়' (subjective) ও 'তন্ময়' (objective) এই দুটি শব্দ গ্রহণ করে কোনো একটি ধারার অঙ্গীভূত বলে তাঁকে ঠিক গ্রহণ করা যেতে পারে না। তা হলেও ভাবনিষ্ঠতা (subjectivity) এবং তন্ময়তা (objectivity) ও ব্যক্তিত্ব— এ দুটি ভাব দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে অন্যোন্যাশ্রয়ী না হয়ে পরস্পর পরিমিশ্রিত হয়েছিল এবং প্রধানত শেষোক্ত লক্ষণটিই তাঁর রচনার নিয়ন্ত্রী শক্তি। তাই তাঁকে দেখি তাঁর একান্ত হালকা, সামাজিক বা

দার্শনিক যে-কোনো রচনায় তিনি তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে পরিবেশন করতে পেরেছেন :

> ছয় সমুদ্রপারে সপ্তম সমুদ্রের মাঝখানে একটি উপদ্বীপ আছে ; সেখানে মনুষ্য, বা অন্য কোনো জীবজন্তুর উপদ্রব নাই, কেবল একপাল··· গরু মুক্তভাবে চরিয়া বেড়ায়। সেই উপদ্বীপের মধ্যস্থলে ক্রোশখানেক বিস্তৃত একটি মাঠ আছে, তাহাতেই কেবল তৃণ জন্মে, তা বই উপদ্বীপের অন্য কোনো প্রদেশে তৃণ জন্মে না। তবেই হইতেছে এই যে, সেই মাঠটাই গরুগুলোর একমাত্র চরিবার স্থান। গরুগুলো দিবাসুখে খায়-দায় থাকে, কাহারো সঙ্গে কাহারো বিবাদ বিসম্বাদ নাই, সকলের সঙ্গেই সকলের প্রাণে প্রাণে হৃদ্যতা— চরিবার মাঠটি শান্তির আলয়।[৬]

অথবা,

> মনুষ্য যখন মানসক্ষেত্র হইতে বিদ্যাবুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া কর্মক্ষেত্রে স্বপদে ভর দিয় দাঁড়ায় তখন সে আপনাকে চালাইবার ভার আপন হস্তে টানিয়া লইয়া স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই তো আর স্বাধীন হওয়া যায় না ; স্বাধীন হইতে হইলে স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করা চাই। যাঁহারা স্বাধীনতার মুক্ত অরণ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সুপথে চলেন তাঁহারা স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করেন, আর যাঁহারা ক্ষণিক সুখের স্বর্ণ পিঞ্জরের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া বিপথে চলেন, তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া স্বাধীনতার অযোগ্য হইয়া পড়েন।[৬]

কিংবা,

> পরমাত্মার অনিরুদ্ধ এবং অপরিচ্ছিন্ন সত্তা রজস্তমোগুণ দ্বারা একটুও বাধামুক্ত নহে। তিনি সর্বশক্তিমান অথচ আপনার কোনোপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অপনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে শক্তি খাটাইবার স্বল্পমাত্রও তাঁহার প্রয়োজন নাই। তিনি স্বরূপে অবিচলিত রহিয়াছেন ; আর, তাঁহার প্রধান স্বরূপা মহতী শক্তির প্রবর্তনীয় প্রতি মুহূর্তে নিখিল জগতের প্রভূত কার্যকলাপ যথাবিহিতরূপে নির্বাহিত হইয়া যাইতেছে।[৬]

সমকালীন যুগের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কিভাবে তাঁকে পরিস্ফুট করেছিল, তাঁর জীবনশৈলী ও লিখনকৌশল অনুধাবন কালে এ প্রশ্ন অপরিহার্য। য়ুরোপের ভাবধারার মুখোমুখি হয়ে দেশের অভ্যন্ত ঐতিহ্যে যে রূপান্তর দেখা

দিল সাহিত্যের ভিতর মধুসূদন ও বঙ্কিমের দেবদত্ত সৃজনে তার উন্নত ঊর্ধ্বগ দিকটিকে প্রতিফলিত করেছিল। কিন্তু সমাজের বৃহত্তর অংশে প্রাচীন-প্রাচ্যের সর্ববিধ দিগ্‌দর্শন অস্বীকারের নেতিমূলক তাড়না, সভ্যতার সব-কিছুই এতদূর অতিরঞ্জনে অনুরঞ্জিত হল, ইয়ং বেঙ্গলে যার সর্বাধিক অভিব্যক্তি প্রকাশিত, কারণ তার ভিতরে নিরপেক্ষ মানদণ্ড নিয়ে প্রবেশ করার সামর্থ্য অনেকের ছিল না। রক্ষণশীল সমাজে এর বিপরীতধর্মী অভিজ্ঞতা স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হলেও প্রকৃত যুক্তিপূর্ণ প্রস্থানভূমি থেকে বাধাদানের উপযোগী শক্তি থেকে এঁরা বঞ্চিত হলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনাতেও দেখা যায় তিনি অতীতাশ্রয়ী ধারাটিকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের সঙ্গে একটি যোগসূত্র রক্ষা করতে চেয়েছেন। তাই তিনি লিখেছেন: 'আমাদের পুরাতন প্রথা সকল ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।··· সকল প্রাচীন প্রথার মধ্যেই যুক্তির ভিত্তি সুবিধা ও উপযোগিতার পুরাতন নিদর্শন থাকিতে পারে··· যেমন পুরাতন প্রথা সকল আলোচনা করিয়া দেখা উচিত, সেইরূপ নতুন পরিবর্তন সকলও ভাল করিয়া দেখা উচিত।··· কি নূতন কি পুরাতন যাহাতে যাহা কিছু ভাল আছে তাহা উপলব্ধি করিবার শক্তি এই সকল প্রকৃত সমাজ-সংস্কারকের থাকা চাই।'

স্বদেশনির্ভর ও স্বধর্মনিষ্ঠ মনোধর্মই অনেক সময়েই দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রধান প্রতিপাদ্য বলা যেতে পারে। বিশেষ করে তাঁর প্রবন্ধের প্রধান যে দুটি সংকলন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সেগুলির বিষয়-নির্বাচন দেখলেই বোঝা যায় তিনি দেশের ও সমাজের কথা কোন্ দিক থেকে এবং কিভাবে ভাবতেন।

'প্রবন্ধমালা'র "মুখ্য এবং গৌণ", "কাল্পনিক ও বাস্তবিক দুই ভাগের দুই প্রকার লোক", "সোনার কাটি রূপার কাটি", "সোনায় সোহাগা", "নব্যবঙ্গের উৎপত্তি", "স্থিতি এবং গতি", "আর্যামি এবং সাহেবিআনা", "সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা", "বাবুর গঙ্গাযাত্রা" প্রভৃতি রচনাগুলি তাঁর গভীর দেশাত্মবোধের পরিচয় দেয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বিষয় থেকে বিষম সঞ্চরণ করেছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক, জ্যামিতিক, দার্শনিক, ব্যঙ্গাত্মক, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়েই তিনি লিখেছেন। কিন্তু সমস্ত রচনার ভিতরই একটি হালকা বিশ্রম্ভালাপের সুর ('loose sally of the mind') বেজেছে।

তাঁর রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রসন্ন কৌতুক। প্রধানত ব্যঙ্গ বা স্যাটায়ার-কেন্দ্রিক না হয়ে তাঁর রচনার মূলে প্রসন্ন কৌতুকের হাওয়া। তিনি সমালোচনার সময়ে ব্যঙ্গের কশাঘাতে কাউকে আঘাত করেন নি। সমবেদনার সঙ্গে সমালোচ্য ব্যক্তির বা জাতির মূলটি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন :

> লামাঙ্কা নগরের বীরকেশরী ডনকুইসোট যতবার কোমর বাঁধিয়া পৃথিবী উল্টাইয়া দিতে গিয়াছেন, ততবার উল্টাইয়া পড়িবার মধ্যে তিনিই অশ্ব হইতে উল্টাইয়া পড়িয়াছেন— তা বই পৃথিবী এক তিলও উল্টায় নাই! এইরূপ করিয়া যখন তাঁহার সমুদয় দন্তগুলি একে একে অন্তর্ধান করিল তখন তিনি দর্পণে আপনার ভগ্নদন্ত চপেটিতকপোল মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া আপনিই আপনার নাম দিলেন 'বিষণ্ণ মুখাকৃতি বীর' knight of the sorrowful figure![৭]

প্রবন্ধের দুটি ধারা— ১. প্রভুসম্মিত ও ২. সুহৃদসম্মিত। প্রথম শ্রেণীর লেখকগণ পাঠকের সঙ্গে একাসনে বসেন না। তাঁরা সকল সময়েই পাঠকের সঙ্গে একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান রাখেন। সেই দূরত্ব থেকেই তাঁর বক্তব্য তিনি তুলে ধরেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই দলের। তিনি কোনো সময়েই পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু অন্যদল প্রাথমিক প্রচেষ্টাতেই পাঠকের সঙ্গে ব্যবধান সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন। সেইজন্য তাঁদের রচনায় একটি আলাপচারিতার সুর। দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ— এঁদের প্রত্যেকের রচনাতেই সেই আলাপচারিতার সুর।

ক্লাসিকাল গদ্যের গুণ : মাত্রাবোধ (measure), শুদ্ধতা (purity) এবং ধৈর্যগুণ (temper)। দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনায় তত্ত্বগত শুদ্ধতা এবং চিত্তগত পরিচ্ছন্নতা থাকলেও স্থানে স্থানে অন্যদুটি গুণের অভাব দেখা গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর রচনাপ্রসঙ্গ সংযত নয়। সেখানে মাত্রাবোধের অভাব ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রেই উপমা, উদাহরণ জালে তাঁর বক্তব্য অযথা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। অবশ্য বক্তব্যকে পাঠকের নিকট তুলে ধরতে হলে প্রথম থেকেই তন্নিষ্ঠ থাকলে ভালো এ সম্বন্ধে তিনি অনবহিত ছিলেন না :

> গোড়ার কথা গোড়ায় না বলিয়া আমি যদি মাঝখানকার কোনো একটি কথার উপরে প্রবন্ধের গোড়াপত্তন করি, তাহা হইলে হইবে এই যে,

আমি একভাবে এক কথা বলিব— আপনারা পাঁচজনে তাহা পাঁচভাবে শ্রবণ করিয়া তাহার পাঁচরকম অর্থ করিবেন ; লাভে হইবে আমার প্রকৃত মন্তব্যটি মাঠে মারা যাইবে।[৮]

কিন্তু তা হলেও অনেক সময় তিনি বক্তব্য থেকে সরে গেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্য রচনার একটি প্রধানতম স্তম্ভ তাঁর 'গীতাপাঠ'। গীতার ব্যাখ্যায় দেখা যায় তিনি অজ্ঞেয়বাদের ভূমিকাটিকে (agnostic position) তিরস্কার না করে তাকে গভীর ভাবে বিচার করেছেন। সেদিক থেকে গীতার বস্তুগত বিশ্লেষণ অপেক্ষা তার স্বগত পর্যালোচনাই তাঁর কাম্য। এই আলোচনা অনেক সময়েই আত্মবিকাশের পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। তুলনায় দেখা যাবে এর পাশাপাশি বঙ্কিম বা তিলকের গীতাভাষ্য হয়তো বস্তুগত ব্যাখ্যান অথবা একদেশদর্শী বিন্যাস। তাঁদের ক্ষেত্রে সনাতন ভারতীয় বিশ্বাসের পটভূমিতেই গীতার ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ ঘটেছে।

সমসাময়িক রচনাদি লক্ষ করলে দেখা যায় রামমোহন-পরবর্তী ব্রাহ্মধর্ম কর্ম থেকে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকেছিল। রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতাগণ সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের অলৌকিকতা-বর্জিত বস্তুধর্মিতার ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ দুজনেই ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের আলোচনার মধ্যে তাঁদের চিন্তাধারায় পার্থক্য ফুটে উঠেছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মোপলব্ধির মাধ্যম হিসেবে গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। সমালোচক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাকে 'স্বায়ম্ভূত ভাষ্য' বলে অভিযুক্ত করেছেন। এ অভিযোগ দ্বিজেন্দ্রনাথেরও প্রাপ্য, কেননা এই গ্রন্থে গীতার বস্তুনিষ্ঠ ভাষ্য নেই, তার বদলে সেখানে ফুটে উঠেছে কবি ও দার্শনিকের প্রাচী প্রতীচীর তুলনা। দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা সম্পর্কে বলা যায়, তাঁর ধর্মাশ্রিত রচনায় সাহিত্যভাবনার অভিযান পর্যাপ্ত। তাই তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে আলোচনাকালে তিনি লিখতে পারেন :

যে বিষয় যত গভীর ততই কাল সাপেক্ষ। জগৎ যেরূপ অতলস্পর্শ 'গভীর রচনা' ও তাহার প্রকাশও সেইরূপ অনন্তকালব্যাপী। কবি যদি অন্তঃকরণের সকল ভাব এককালেই প্রকাশ করিতে যান তাহা হইলে সে ভাব ভাব মাত্রই রহিয়া যায়, আবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে না। কবি

আপনার মনের ভাব আপাতত অপ্রকাশ রাখিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিলে তবেই তাহা কাব্যরূপে আবির্ভূত হয়।[৯]

তিনি অনেক সময়েই বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে গেছেন। কিন্তু নানা বিষয়ে সঞ্চরণ সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় থাকতে পেরেছেন। আপন বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য বিরাট পরিধি (range) নিয়ে রচনার বিস্তার সে সময় দ্বিজেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। গীতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের চিন্তা কেবলমাত্র ধর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি। 'হোমরের ইলিয়ড ওলিম্পাস হইতে পারে কিন্তু তাহা হিমালয় নহে। কাব্যজগতে হিমালয় একা কেবল মহাভারত। রামায়ণ হিমালয় না হউক তাহা বিন্ধ্যাচল তাহাতে আর ভুল নাই। রামায়ণ আর মহাভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রভেদ।'[১০]

কখনো কখনো তিনি গীতার মূল ভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকের প্রসঙ্গ অবতারণার প্রয়োজন বোধ করেছেন :

বেদান্ত এবং সাংখ্য ছাড়া আর এক শাস্ত্র আছে : সে শাস্ত্র বলে এই যে, ১। সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতি ২। Kant-এর thing in itself ৩। Schopenhauer-এর অন্ধ will ৪। Mill-র ইন্দ্রিয়চেতনার অধিষ্ঠাত্রী নিত্যাশক্তি, ইংরাজী ভাষায় permanent possibility of sensation ৫। বেদান্তের সদসদ্‌ভ্যামনির্ব্বচনীয়া অবিদ্যা ;—পাঁচ শাস্ত্রের এই পাঁচ রকম বস্তু একই বস্তু ···।[১১]

প্রাঞ্জল করে, সহজ করে বলা তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচনার প্রসাদগুণ আধুনিক সমালোচককে এতদূর পর্যন্ত মুগ্ধ করেছিল যে তিনি তাঁর কোনো একটি রচনার সমালোচনা কালে বলেছেন : 'এরকম কঠিন জিনিস এর চেয়ে সরল করে স্বয়ং সরস্বতীও লিখতে পারতেন না।'[১২]

অনেক সময়েই তিনি দুরূহ বিষয়ের সরলীকরণ না করে তাকে সহজ করে বলেছেন। প্রয়োজনমত সাহিত্যের উল্লেখ (literary allusion) করে বক্তব্যকে সহজ করেছেন। গীতার ব্যাখ্যায় তাই বারবার হোমার, বাল্মীকি, শেক্সপীয়র এসেছেন।

বাংলা গদ্য এবং পদ্য দু ক্ষেত্রেই দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম চলিত ভাষা ব্যবহার করেন। সে হিসেবে এ পথে তাঁকেই পথিকৃৎ বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম

জীবনে রচনার মাধ্যম ছিল সাধুভাষা। চলিতকে লেখার ভাষার মর্যাদা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে বেশ পরের দিকে। প্রমথ চৌধুরী যে চলিতভাষার পক্ষ সমর্থন করে 'সবুজ পত্রে' বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন তাও দ্বিজেন্দ্রনাথের পরে। অতএব বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহারের প্রথম সম্মান দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রাপ্য। তাঁর ব্যবহৃত কিছু চলিত ভাষার নমুনা :

> কাঁচিয়া গোঁড়ার দলে মিশিয়া গোঁড়ামি করেন··· তাঁহার··· স্যাতসেঁতে জোলো বায়ু[১৩]
>
> লাভের মধ্যে কোল ফুঁয়ে ফুঁয়ে টকরাটকৃরি[১৪]
>
> যার যা তারে সাজে··· অন্যে তা লাঠি বাজে[১৫]
>
> যেখানে নানা পথের নানা ক্যাঁকড়া যোগে[১৬]
>
> শীতকালের রাত্রে হি হি করিয়া লেপ মুড়ি স্থড়ি দিয়া··· নিভৃত কোণে জড়সড় হইয়া[১৭]

এই জাতীয় দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দের ব্যবহার তাঁর রচনাকে স্বাভাবিক, সহজবোধ্য এবং কাছের করে তুলেছে। তরল শব্দের ব্যবহারে স্থানে স্থানে ভাবের গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে গেছে, কখনো কখনো এর ফলে তাঁর রচনা গুরুচণ্ডালী দোষযুক্ত হয়ে পড়েছে : 'সত্ত্বগুণের আর একটি পরিচয় লক্ষণ আছে— সেটি হ'চ্চে সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ।'[১৮]

দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনায় এ ছাড়াও অন্য একটি দুর্বলতা কখনো সখনো চোখে পড়ে। তিনি বিভিন্ন সময়ে, অনেক ক্ষেত্রেই বিনা প্রয়োজনে, রচনামধ্যে ইংরেজি শব্দ অথবা ইডিয়ম ব্যবহার করেছেন।[১৯] তা না করে বাংলা ভাষাতেই তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করলে তা বোধহয় আরো শ্রুতিসুখকর হত।

রচনায় অনেক সময় তিনি কল্পিত উপাখ্যানের (anecdotes) অবতারণা করেছেন। কান্টের টীকা প্রসঙ্গে :

> মনে কর আমি বৌভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা উপলক্ষ্যে মধ্যাহ্নকালে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমার একটি আত্মীয় লোকের বাটি গিয়াছিলাম। ভোজনান্তে ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পরে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম যে, আমার বসিবার ঘরে আমার বাল্যকালের কাব্যানুরাগী বন্ধু দেবদত্ত চৌকি হ্যালান দিয়া বসিয়া মেঘদূত পাঠ করিতেছেন।[২০]

সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ আরোহপন্থী (inductive)। তিনি যে মুহূর্তেই বিশেষ থেকে সামান্যে উপনীত হয়েছেন এমন বলা যায় না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধান্তকে আগে প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের স্তব্ধ করে দিয়েছেন। তিনি পাঠকের সঙ্গে সঙ্গে থাকলেও একটু যেন দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন। সেজন্যই তাঁর প্রবন্ধে আমরা নিজেদের মনন-স্বাধীনতা খুঁজে পাই, মানবজীবনের বিষয়ে নিজ নিজ অভিজ্ঞতাকে মূল্য দিতে শিখি।

দ্বিজেন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি দিক তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা। অনেক চিঠিতেই তাঁর ব্যঙ্গাত্মক রচনারীতির প্রকাশ ঘটেছে। রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন :

কলিকাতা ১৭ চৈত্র ১৭৯০

স্মরিয়ে তব চরিত্র অনুপম।
মনোমাঝে ঘণ্টা বাজে নমোনমঃ নমোনমঃ ॥

কবিতাপরাধ মার্জনা করিবেন। এখনো চাতক জলবিন্দুর জন্য হাঁ করিয়া আছে, কিন্তু আর কতদিন—

সহিয়ে সহিয়ে, রহিয়ে রহিয়ে
আর সহিতে না পারি।
জিঘাংসা আমার জেনেছে কেদার,
তোমার নিকট কিন্তু হারি ॥

আমি পিপাসাতুর শুষ্ক কণ্ঠ, এই যাহা লিখিলাম এই ঢের, দুই এক ছত্র না পাইলে কলম আর চলে না, আর কিছুদিন আপনার স্নেহের স্রোত বন্ধ রহিলে আমি রাগ করিয়া কলম কাগজ কালি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, ঢালিয়া ঢুলিয়া, ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া একাকার করিব। অতএব এই ভয়ানক দুর্গতি হইতে আপনি আমাকে কোনরূপে রক্ষা করুন।— নিদাঘাত উদ্ভিদ। প্রচুর জলবর্ষণাভিলাষী…[২১]

দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার একটি দিকের প্রকাশ তাঁর চিঠিপত্রে। চিঠি লেখায় তাঁর একটা সহজ সরল নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ চিঠির সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন : 'ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস।' দ্বিজেন্দ্রনাথেরও চিঠির প্রধান মাধুর্য সেই ভারহীন সহজের রসে। তিনি যত চিঠি লিখেছেন তার কোনোটিই কোনো জায়গায় জটিল বা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি।

একদিক থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠিগুলি ঠিক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কেননা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে তিনি ঠিক ব্যক্তিগত মণ্ডলের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন নি। তিনি ব্যক্তি থেকে বিশেষে উপনীত হয়েছেন। 'ছিন্নপত্রাবলী'র পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে যে কবিমনের প্রকাশ তা যে-কোনো সাধারণ পাঠককেই সমান আনন্দ দেবে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠি যেন বিশেষ করে যাঁকে লেখা হয়েছে তাঁরই জন্য। সেখানে রসগ্রহণে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। তাই রস-সমৃদ্ধ হয়েও দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্র সাহিত্যপর্যায়ভুক্ত হতে পারে নি।

বক্তব্যের সমর্থনে এখানে পর পর কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া গেল। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রের কিয়দংশ: 'আপনি আমার উপর—নিরীহ আমার উপর যেরূপ প্রবল বেগে কারণের সহস্র কিরণ বর্ষণ করিয়াছেন—তাহাতে আমি তো একেবারে বিগতপ্রায়। শিশির বিন্দু প্রচণ্ড সূর্যকিরণে যেরূপ হয়— আমারও সেইরূপ দশা। প্রধান কারণ— শুধু যে আপনাকেই অতিষ্ঠ করিয়াছে তাহা নহে— অনেককে অতিষ্ঠ করিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও আমি যেখানকার সেইখানেই আছি কলিকাতা ছাড়ি নাই।··· আপনি অভয় দিয়াছেন— সুতরাং আমার সাতখুন মাপ··· ।'

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত অন্য একটি সম্পূর্ণ পত্র:

এক শতাব্দী হইল আপনার সাড়া-শব্দ নাই। আপনি Rip Van Winkle-এর গল্প জানেন; ইহার পর আমাদের দেখিলে হয়তো চিনিতে পারিবেন না। আপনার দর্শন দুষ্প্রাপ্য, আপনার হস্তাক্ষর দুষ্প্রাপ্য—আপনার কুশল সংবাদ দুষ্প্রাপ্য।··· আপনি নিজে তো একেবারে 'য' হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আপনি Receding Echoর ন্যায় আমাদের শ্রবণপথ ক্রমশ এড়াইয়া অবশেষে একটি য ফলায় ঠেকিয়াছেন। এমন হইবে তাহা কেমন করিয়া জানিব।

হর্ষের খুলিল উৎস দর্শন যেদিন
এখন স্মরণ মাত্রে হয়েছে বিলীন।
পত্র নাহি উড়ে আর,— দু একটি যাহা,
ক্ষীণজীবী বেচারার দেখিয়া রকম
পিপীলিকা গড়াগড়ি ভাঙ্গিয়া পাকম।

তোমায় পা'ব কি আর, হায়রে অদৃষ্ট
দেহোঘরে দেহ যয় অচল প্রতিষ্ঠ।[২২]

দ্বিজেন্দ্রনাথের অনেক চিঠিই পুরোপুরি কবিতায় লিখিত। আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবকে সরস ছড়ায় চিত্তাকর্ষক পত্র লিখিবার অভ্যাস ছিল তাঁর। রাজনারায়ণ বসু, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেন, অনিল মিত্র, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী— অনেকের কাছেই তিনি এজাতীয় পত্র লিখেছেন। কখনো বা তাঁর অতিপ্রয়োজনীয় নির্দেশ বা আমন্ত্রণ তিনি কবিতায় লিখে পাঠাতেন :

এখনি আসব বলো যখন
আসবে কত তুমি জানে তা মন
মুনীশ্বরকে হইবে যেতে।
বোলবে সে 'আসবেন খেতে'
তারপরে যাবে কানাই সেন।
বোলবে সে এসে 'আসিতেছেন'।
ভাববো তখন ঘণ্টা চারি
করিলাম আমি কি ঝকমারি।[২৩]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে প্রবাসের বার্তা পৌঁছে দিতে লিখলেন :

কি বলিব কি সুখে যমুনাতীরে
সেবিয়ে সুমধুর বায় স্নান করিয়ে যমুনায়
কাটাই কাল নীরোগ শরীরে
বাস করি একখানা ছোটখাটো কুটীরে।

* * *

কলকাতা ছি ছি কলির আলয়
সহরের মলিন পাঁকে গুণজ্যোতি ডুবিয়া থাকে
দ্বিজের প্রাণে কেমনে ইহা সয়
গুণজ্যোতি বিনা দ্বিজত্ব কভু রয়॥

এই জাতীয় পরিহাস, রঙ্গ-রসিকতা ব্যক্তিগত কুশল আদান-প্রদান ব্যতীতও অনেক চিঠিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর ঘরোয়া মনটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত।

সেই-সব চিঠি দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিরূপ প্রকাশে সার্থক সহায়ক। তিনি তাঁর চিঠির ভিতর দার্শনিক বিষয়েও আলোচনা করেছেন। আত্মার শক্তি সম্বন্ধে, অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর মতামত, শিক্ষা বিষয়ে, জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি বিষয়ে তিনি চিঠির ভিতর দিয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তী কয়েকটি পত্রের বিক্ষিপ্ত অংশ গদ্যাশ্রিত বিতর্কবিশ্লেষণমূলক (discussive) চিন্তাধারার বিভিন্ন দিকে কিছুটা আলোকপাত হবে। তিনি লিখছেন :

> আমি mysticism undervalue করি না— overvalueও করি না।··· আমার মত এই যে আর্যভট্ট,··· সুশ্রুত প্রভৃতি আমাদের দেশের গৌরব স্থানীয়। কবি এবং ঔপনিষদিক philosopher সকলেও গৌরবস্থানীয় —but they indulged in mysticism—never mind; Newtonও indulged in mysticism in his last stage. But I don't undervalue mysticism— nor do I overvalue it.[২৪]

তিনি মনে করেন :

> বিবাহের পাত্র নির্বাচনের কষ্টিপাথর— প্রেম, জহুরী— জ্ঞান। দুয়ের যোগ মণিকাঞ্চনের যোগ। যে বিবাহ প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং জ্ঞান দ্বারা অনুমোদিত তাহা সর্বথা অনুষ্ঠাতব্য। আইন রক্ষার্থে যাহা আবশ্যক তাহা দেশকাল পাত্র বিবেচনা মতে অনুষ্ঠাতব্য।··· আইন যদি বরকে জোর করিয়া বলাইতে চায় 'আমি কিছু নহি', তবে আইনের সেই বলগর্বিত কথার জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া দেওয়া অধম নীচত্বের চিহ্ন। বিবাহের ন্যায় অতবড় একটা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অমন ধারা কাপুরুষোচিত নীচত্ব স্বীকার করা বরের পক্ষে কোনো ক্রমেই শোভা পায় না।[২৫]

একবার অমিয় চক্রবর্তীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখলেন : 'নিজের আত্মশক্তি যে কত বড় মঙ্গল তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তবে পরমাত্মার আত্মশক্তি— অর্থাৎ জগৎব্যাপারে যে শক্তি খাটিতেছে সেই ঐশী শক্তি— কত বড় মঙ্গল তাহা আমাদের বুঝিতে বাকি থাকিবে না।'[২৬]

তাঁর পত্রাবলী লক্ষ করলে দেখা যায় তিনি যখন যে কাজ নিয়ে থাকতেন সমসাময়িক লেখার মধ্যে বা চিঠির মধ্যে তার উল্লেখ দেখা যেত। ১৮৭৫ সালে লেখা একটি চিঠি : 'আমার কবিতার স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহার বিশেষ কারণ মেলার হাঙ্গামা।···' কিংবা, 'আমি এখন একটা ভারী

interesting বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত আছি— তাই একটুতেই interruption বোধ হয়। Boxometry তৈয়ার কচ্ছি। অর্থাৎ বাক্স তৈয়ার করিবার mathematical formula.'

ঐ একই বিষয়ে অন্য একটি পত্রে লেখেন: 'আমি এত কাজে ব্যস্ত যে আপনাকে পত্র লিখিব— তাহা আর হইয়া উঠিল না।··· But what that কাজ is— is a mystery! আপনাকে বলি— কাগজের বাক্স বিরচনায় একটি শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেছি পদ্যে।'[২৭]

দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠিতে তাঁর বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষাত্মক (analytical ও synthetic) বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যরীতির সমালোচনা করে সমালোচক লিখেছেন: 'দ্বিজেন্দ্র-নাথের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য ছিল। একদিকে তাহাতে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব নাই তেমনি আর এক দিকে তাহা প্রতিভাময় কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রভাব হইতেও মুক্ত। এ গদ্যরীতি একেবারে তাঁহার নিজস্ব। যে মন লজিক ও কল্পনার সমাবেশে গঠিত, এ গদ্যরীতি তাহারই সৃষ্টি।··· বাংলা গদ্যের যে কয়েকটি বিশিষ্ট রীতি আছে দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্য তাহাদের অন্যতম।'[২৮]

কবিতার মতোই গদ্যে তাঁর মেধার সচেতন ও স্বাভাবিক সঞ্চরণ। যদিও তাঁর কবিতার প্রতিভা-স্পৃষ্ট বৈদ্যুতিকতা তাঁর গদ্যকে সবসময়ে উদ্ভাসিত করে নি তবুও দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যে— তাঁর বিভিন্ন নিবন্ধাবলী এবং তাঁর লিখিত বিভিন্ন চিঠিপত্রে— তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর চিন্তাভাবনা একসঙ্গে মিশে গেছে। তাঁর ব্যক্তিসত্তার ভিতর একই সঙ্গে কবি ও দার্শনিকের বাস।

সংস্কৃত আলংকারিক বলেছেন: 'গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি।' গদ্যই কবিদের কৃতিত্বের নিকষ পাথর। কবি এবং দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখনীতেও গদ্য এবং পদ্য আপন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

৯

সৌন্দর্যভাবনা

উনিশ শতকের শেষের দিকে (fin de siecle) ইউরোপীয় নন্দন দিগন্তে যে-সব আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যে 'স্বাশ্রিত শিল্পবাদ' (Art for art's sake)[১] অন্যতম। শিল্পকে স্বনির্ভর করার তাগিদেই এই আন্দোলনের জন্ম। এই আন্দোলনের পূর্বাভাস দেখেই হার্ডার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন :

> The work of art can so draw men to itself that this very passion brings the other power and inclination out of their proper bounds, and so the unbounded passion of taste, like every other unbounded passions become noose.[২]

শুধুমাত্র শিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়লে জীবনের সামগ্রিক ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয় বলে হার্ডার যে আশঙ্কা করেন তা পরবর্তীকালে তেমন কোনো ভয়াবহ রূপ নেয় নি। অসকার ওয়াইল্ড *The Picture at Dorian Gray* গ্রন্থে যদিও তাঁর সর্বাত্মক ও স্বনির্ভর শিল্প-বীক্ষার পরিচয় দিয়েছিলেন ; 'ডে প্রোফাণ্ডিস' (১৯০৫)[৩] গ্রন্থে তাঁর সেই শিল্প-সমীক্ষা অনায়াসেই একটি মহত্তর জীবনবীক্ষার সঙ্গে সমন্বিত হতে পেরেছিল।

Robert Lynd-এর 'poetry has a double origin' উক্তিটি যেন উনবিংশ শতাব্দীর যুগমানসের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রয়োগসিদ্ধ বলে মনে হয়। এই সময়ের বাংলাদেশে শিল্পের উদ্দেশ্যবাদ বা প্রয়োজনবোধ তার নান্দনিক দিকটিকে বিশেষভাবেই নিয়ন্ত্রণ করেছিল। শতাব্দীর শেষ প্রান্তে রচিত হল টলস্টয়ের *What is Art ?* বইখানির ইংরেজি ভাষ্যও পাওয়া গেল।[৪] এই গ্রন্থে টলস্টয় শিল্পের জন্য একটি প্রশস্ত পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। শিল্প হবে সহজ, সরল, সর্বসাধারণের বোধগম্য, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলনের, মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার যোগসূত্র।[৫] দ্বিজেন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেন কিন্তু এই আত্যন্তিক উদ্দেশ্যময়তার পক্ষপাতী ছিলেন না।

ফলত, এরকম বলা যাবে না যে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে স্বাশ্রিত শিল্পবাদ ও জীবননির্ভর শিল্পবাদের মধ্যে একটি আমেরু ব্যবধান বিদ্যমান। প্রমথনাথ বিশী 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'র প্রথম সর্গ থেকে সপ্তম সর্গ পর্যন্ত পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন স্বনির্ভর শিল্পচেতনাই পরিণত হয়েছে জীবনসাপেক্ষ শিল্পভাবনায়। তিনি লিখেছেন :

> নন্দনপুর পর্যন্ত যে কল্পনাকে দেখিয়াছি তাহা কবিকল্পনা মাত্র ; কিন্তু শান্তিপুরে যে কল্পনাকে দেখিলাম তাহার সংজ্ঞা ও সার্থকতা ব্যাপকতর, সে আর কবির আরাধ্য ধনমাত্র নয় যোগী জ্ঞানী সাধু সন্ত মনুষ্য মাত্রেরই ধ্যানের ধন, তাহার অভাবে মনুষ্যজীবন অন্ধ ও অকর্মণ্য। নন্দনপুরের কলাকৈবল্য হইতে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন আর art for art's sake নয়, এখন art for life's sake-এ দাঁড়াইয়াছে।[৬]

এই বিশ্লেষণ অত্যন্ত যথার্থ বলে মনে হয়। নন্দনপুর নামটির মধ্যেই নান্দনিক (aesthetics) সংকেতময়তা আছে। এই নন্দনলোক শিল্পীর প্রাথমিক সোপান হলেও হয়তো শেষ লক্ষ্য ছিল না। তাই তৃতীয় সর্গে এসেই আমিয়েলের[৭] মধ্যবর্তিতায় যা ছিল প্রধানত আবেগনির্ভর সুন্দর দ্বিজেন্দ্রনাথ তাকে আত্মস্থ সুন্দরের ধারণায় পরিণত করেছেন :

> পুষ্প সে যে-হৃদয়ের দর্পণ
> অবলা লালিত্য যেন করিয়াছে ছবি আরোপণ
> তার দলে দলে।[৮]

অবশ্য চতুর্থ সর্গে এই সৌন্দর্যসিদ্ধি জর্জরিত হয়ে উঠেছে অমঙ্গলের করক্ষেপে এবং সপ্তম সর্গের প্রাক্‌মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা এই সৌন্দর্যের মধ্যে কোনো কল্যাণ-চিন্তার আভাসমাত্রও পাই না। সপ্তম তথা অন্তিম সর্গেই শ্রী ও সুকল্যাণের প্রার্থিত মিলন ঘটেছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে এই উত্তরণ যথেষ্ট পরিমাণেই দ্বন্দ্বসঙ্কুল। যখন তিনি অন্তিম সর্গে বলে উঠেছেন : 'দ্বন্দ্ব করি জয় / আরোহ আমার সনে পর্বত মহান'[৯] —তখনই তাঁর সৌন্দর্যসন্ধানী মানসের এই স্তরসঙ্কুল চেহারাটি আমাদের চোখে পড়ে। আধুনিক নন্দনতত্ত্বের মধ্যে এই দ্বন্দ্বময়তার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। অ্যাণ্ড্রুজের মধ্যস্থতায় তিনি বেনেদেত্ত ক্রোচের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর ঈপ্সিত এই জটিলতার সন্ধান পান নি।[১০]

অথচ ক্রোচের সঙ্গে তাঁর মিল ছিল সৌন্দর্যের আত্মগত প্রকল্পনায়। ক্রোচে বিশ্বাস করতেন মনের বাইরে কোনো কিছুরই অধিষ্ঠান নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রোচে কোনো তদ্‌গত বস্তু অথবা পূর্ণতার পথনির্দেশ দেন নি বলেই সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁকে গ্রহণ করেন নি।

তাঁর অধ্যাত্মচিন্তার ক্ষেত্রে যেমন, নন্দনচিন্তার ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ কাণ্টের সৌন্দর্যসমীক্ষার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁর *Kritik der rinen Vernunft* (বিশুদ্ধ যুক্তি চর্যা) *Kritik der Urteils kraft* (সংবেদনশক্তির সমীক্ষা) গ্রন্থদ্বয়ে তিনি সৌন্দর্য সম্পর্কে যে-সব ধারণা প্রকাশ করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই-সব ধারণা আমূল পরিবর্জন করেন নি, যদিও পরিবর্তিত করে নিতে চেয়েছেন।

কাণ্টের নন্দনচিন্তার মধ্যে অশুদ্ধ বিন্যাস (Impure mode) ও শুদ্ধ বিন্যাসের (Pure mode) একটি বিভাজন রেখা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত সৌন্দর্যসম্বিৎসায় কোনো একটি বা একাধিক তত্ত্বের আধিপত্য থাকে, দ্বিতীয়টিতে থাকে না। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত প্রমুক্ত সৌন্দর্য (pulchritudo vaga) ও তত্ত্বসাপেক্ষ সৌন্দর্যের (pulchritudo adhaerens) পার্থক্যটি মেনে নিয়েছেন। দ্বিতীয়োক্ত সৌন্দর্যময়তার অস্তিত্ব স্বীকার করেও কাণ্ট বলেছেন যে নান্দনিক সংবেদন বিশুদ্ধ রূপেই স্বগত (subjective)। এই সৌন্দর্যের আলোচনা সূত্রেই তিনি যেন পথ হারিয়ে ফেলেছেন। এখানে তিনি ঊর্ধ্বায়নের (sublimation) প্রয়োজন স্বীকার করেও শেষ পর্যন্ত শ্রেয়োবোধ (sublime) ও শ্রী-র (beautiful) মধ্যে সামঞ্জস্যের কোনো দূরতম সম্ভাবনাও দেখতে পান নি যদিও প্রায়, স্ববিরোধের ভঙ্গিতেই সৌন্দর্যকে সুনীতি-শৃঙ্খলার (sittlickkeit) প্রতীক বলে মনে করছেন।[১১] এখানেই কাণ্টের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের বৈসাদৃশ্যের সূচনা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর প্রকীর্ণ বহু প্রবন্ধে জীবনের নীতিগত (ethical) দিকটির সম্পর্কে তাঁর গভীর অভিনিবেশের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু শিল্পের ভিতরে তিনি সুনীতি খোঁজেন নি; খুঁজেছেন শ্রেয়োবোধ। কঠোপনিষদের প্রেরণায়[১২] তিনি শান্তিপ্রয়াণ শীর্ষক সপ্তম সর্গে যে ভাবানুবাদ[১৩] করেছেন তার মধ্যে ঠিক নীতির কথা নেই। মহত্তর একটি সৌন্দর্যরীতির আগ্রহই যেন সেখানে আভাসিত হয়ে উঠেছে। আনাতোল ফ্রাঁসের মতো তিনিও যেন

বলতে পারতেন, 'art is neither moral nor immoral but amoral.'[১৪]

এ কথাও ঠিক যে দ্বিজেন্দ্রনাথ সৌন্দর্যসৃষ্টির উপরে একটি শর্ত অর্পণ করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে শিল্পীকে একটি জায়গায় সৃজ্যমান সৌন্দর্য থেকে একটি প্রাতিভাসিক দূরত্বের অনাসক্তি পোষণ করতে হবে, তার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেলে চলবে না। বিহারীলালের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচিন্তার তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি সুন্দরভাবে বলেছেন: 'আমার বিহারীলালকে মনে পড়ে; লোকটি নেহাত অসজ্জিত ঢিলেঢালা, অপরিপাটি কিন্তু তার লেখা পড়লে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে, সে একটি সৌন্দর্যের মাতাল ছিল। বড়দাদা যে একসময় যথার্থ কবির মত সমস্ত সৌন্দর্য উপভোগ করতেন সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই...।'[১৫] অধোরেখ দুটি অংশের তুলনা করলেই দ্বিজেন্দ্রনাথের মনোগত এষণা ধরা পড়বে। আর বিহারীলাল নিজেকে সৌন্দর্যের ভিতর ডুবিয়ে দিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ এভাবে লীন হয়ে যাওয়াতে বিশ্বাস করতেন না, তিনি মনে করতেন শিল্পীসত্তার কাছে মেতে ওঠার থেকে মাতানোই আসল:

> সৌন্দর্য সকলকেই পাগল করিয়া তোলে; তাহার ভিতরকার নিগূঢ় তত্ত্ব জানা বড়ই দরকার। পর্দার আড়ালে কি আছে তাহা একবার উঁকি দিয়া দেখা আবশ্যক। লোকে বলে আপনি না মাতিলে অন্যকে মাতানো যায় না,— কিন্তু গোলাপফুল তো অন্যকে বেশ মাতায়— আপনি তো কখনও মাতে না; একজন সুন্দরী ললনা সভার মাঝখান দিয়া চলিয়া গেলে ঠিক যেন একটা ষ্টীমার গঙ্গার মাঝখান দিয়া চলিয়া যায়— ক্ষণ পরেই গঙ্গার দোধারি তরঙ্গে তরঙ্গে হুলস্থুল হইয়া উঠে; কিন্তু ষ্টীমার তো একটুও হেলে-না দোলে না। মাতানো-টাই তো সর্ব্বদা চক্ষে পড়ে; কিন্তু মাতা-টা কোন্ খানে? কোন সুরসিক ব্যক্তি ইহার একটা সদুত্তর প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।[১৬]

এখানেই বোঝা যায় সৌন্দর্য সৃষ্টি বলতে তিনি প্রথানুগত সৌন্দর্য-ধারণাটিকে মানেন নি। প্রথানুগ ধারণা ক্রমে বহিস্থ সৌন্দর্যের সঙ্গে শিল্পীর মানসিকতার দূরত্বকে সংকুচিত করে আনতে হবে। এটিই ধ্রুপদী (classical) অন্যতম মূল সূত্র। পক্ষান্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথ শিল্পসৌন্দর্য বা নান্দনিক সৌন্দর্য

বলতে তথাকথিত কোনো সার্বজনীন আদর্শকে বোঝেন নি, সচেতনভাবে সৃষ্ট একেকটি ভাবমণ্ডলকেই বুঝেছেন। বিচিত্রিত ব্যক্তিবিশ্বই ছিল তাঁর সৌন্দর্য রচনার অন্যতম শর্ত। এই সূত্রে তিনি যে কথা বলেছেন সেটি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের প্রচলিত প্রথানুগ সৌন্দর্যদর্শনের মূর্ত ব্যতিক্রম :

> যখন মনুষ্যের মনোমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভাবের উদয়কে পতিত্বে বরণ করে, তখনই যথাসময়ে তাহার গর্ভে নূতন উদ্ভাবনা জন্মগ্রহণ করে। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, সৌন্দর্যের ভাব, মঙ্গলের ভাব, সত্যের ভাব, ধর্মের ভাব এই এই প্রচার বিশেষ বিশেষ ভাবের আলোকে বিশেষ বিশেষ মহাত্মারা বিশেষ বিশেষ অন্তর্জগৎ সৃষ্টি করেন ; তার সাক্ষী— কালিদাস সৌন্দর্যের আলোকে শকুন্তলা সৃষ্টি করিয়াছিলেন··· কোন লোকপূজ্য মহাপুরুষ ধর্মের আলোকে স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন।[১৭]

"এই বিশেষ বিশেষ অন্তর্জগৎ" যেমন শিল্পসৌন্দর্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি অধ্যাত্ম সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেও। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুইয়ের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ কোনো পার্থক্য দেখেন নি। ঠিক তেমনি, অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের যেমন শেষ পর্যন্ত শিল্প ও শিল্পীর মধ্যে একটি অন্যনিরপেক্ষ পার্থক্য তথা শিল্পীর একচ্ছত্র সাধিকার-তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে, তার সঙ্গেও দ্বিজেন্দ্রনাথের অভীপ্সার প্রভেদ দুস্তর। বক্ষ্যমান প্রসঙ্গে আধুনিক মার্কসবাদী সমালোচকের এই উক্তিটি উৎকলনযোগ্য :

> "শিল্পী ও শিল্প অন্যের অধীন নহে—'অনন্যপরতন্ত্র'; ইহা হইতে একমাত্র সিদ্ধান্ত আসে কাণ্টের সহজাত মনোবৃত্তিবাদ বা apriorism। সৌন্দর্য বিচারেও অবনীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলিয়াছিলেন—
>
> "তদ্ রম্যং যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ"
>
> "মনে যার যা ধরলো সেই হল সুন্দর।"[১৮]

দ্বিজেন্দ্রনাথ শিল্পীর অনুশীলিত স্বাতন্ত্র্যকে কিছুদূর পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েও শেষ পর্যন্ত তার অন্যনিরপেক্ষ এই ভূমিকাটিকে মানেন নি। এক ধরনের "মহত্তর অভিমুখিতা" (Peter-কথিত = alliance to greater ends) তাঁর শিল্পীসত্তাকে করে তুলেছে ঊর্ধ্বগ, যদিও শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি আধ্যাত্মিকতার সর্বগ্রাসী চাহিদাকেও মানেন নি। এখানেই তাঁর সঙ্গে মহর্ষির প্রিয় নন্দন-তাত্ত্বিক ভিক্তর কুঁজার (১৭৯২-১৮৬৭) পার্থক্য অত্যন্ত উচ্চারিত। কুঁজা

সুন্দর এবং এক নিছক প্রীতিকর অনুভূতির মধ্যে যে পার্থক্যরেখা টেনেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের সৌন্দর্যদর্শনে তার প্রতিচ্ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়।[১৯]

তাঁর 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল' গ্রন্থে[২০] তিনি সৌন্দর্যকে শেষ পর্যন্ত আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়গম্য চেতনার পরপারে নিয়ে গিয়ে একটি নিরঞ্জন শুদ্ধতায় দীক্ষিত করেছেন :

"আমরা যখন অসীম বস্তুকে ভালবাসি,— এমন কি, সত্যকে, সুন্দরকে, মঙ্গলকে ভালবাসি— তখন আসলে আমরা সেই অসীমকেই ভালবাসি। আমরা এতই অসীমে আকৃষ্ট, অসীমে মুগ্ধ যে, যতক্ষণ না আমরা অসীমের অমৃত-উৎসে উপনীত হই, ততক্ষণ আমরা তৃপ্তিলাভ করি না। আমরা অসীমকে চাহি বলিয়াই আমাদের হৃদয় আর কিছুতেই তৃপ্ত হয় না।"[২১]

এই অসীমতা দ্বিজেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচিন্তার আরাধ্য লক্ষণ নয়। তিনিও সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের ত্রিধারাসঙ্গমে গাহন করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা সৌন্দর্যের রূপময় সীমারেখাকে ঘুচিয়ে দিয়ে নয়। ইনি চেয়েছিলেন, "process of de-subjectification of the artistic image from the pure subjectivity of the artist"।[২২] অন্য ভাষায় বলতে গেলে, ব্যক্তির মন্ময় অনুভূতিতে রূপান্তরিত করে একটি রূপকল্পলোকের প্রতিষ্ঠা। এই রূপকল্পলোক একদিকে যেমন তাত্ত্বিকের করক্ষেপ থেকে মুক্ত, অন্যদিকে আবার তার সঙ্গে মানুষের মাঙ্গলিক মূল্যবোধের একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে।

প্রিয়নাথ সেন একবার বলেন : 'পরমার্থের সঙ্গে সৌন্দর্যকে গ্রথিত করিয়া হিন্দু কবি কাব্যকে অশেষ এবং অসীমের দিকে প্রসারিত করিয়াছেন।'[২৩] এর অর্থ এই নয় যে দ্বিজেন্দ্রনাথ অশেষ অথবা অসীমকে শিল্পসৌন্দর্যের নিয়ন্তা করে তুলেছিলেন। এর তাৎপর্য এই যে তিনি সৌন্দর্যের ধারণায় একটি অমর্ত্য মাঙ্গলিকতার মাত্রা অন্বিত করে দিয়েছিলেন। কীটস-কথিত fine excess উক্তিটির মধ্যে শিল্পের মুক্তির এই সম্ভাবনা যেন নিহিত আকারে ছিল। ভারতীয় ভাবুকের সৌন্দর্যচিন্তায় সেই সম্ভাবনাটি যেন চিন্ময়তার ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত হয়েছে। কিন্তু 'পরমার্থের' সঙ্গে সৌন্দর্যের এই গ্রন্থনায় পারমার্থিকতাই নিয়ম হয়ে ওঠে নি, তা নিজেও যেন ঈষৎ আনত হয়ে সৌন্দর্যের সঙ্গে একটি মৈত্রীমধুর সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

—

দার্শনিক ও ধর্মীয় ভাবুক

ভাবার্পিত অথবা বস্তুচেতন, একজন যুগমনীষীর মন যেভাবেই গঠিত হোক-না কেন যুগমৃত্তিকার সঙ্গে তার যোগাযোগের অনিবার্যতা অবশ্যস্বীকার্য। দ্বিজেন্দ্রনাথের মন ভাবার্পিত অথবা আত্মগত অভিমুখিতায় ন্যস্ত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুগ প্রতিবেশের সামগ্রিক চাহিদা তিনি পরিহার করেন নি, তাঁর দর্শনচিন্তা ও ধর্মভাবনার মধ্যে যুগসত্তার সঙ্গে সেই সম্পর্কের ছায়াপাত ও রূপান্তর ঘটেছে। আঠারো শতকের ইউরোপীয় দর্শনও অনুধাবন করলে দেখা যায় তার অব্যবহিত প্রাগ্বর্তী যুগের সংবেদন ও পূর্বপটের পরিগ্রহণে (derivation) ও নব্যপ্রস্থানভূমির বিন্যাসে (deviation) তার সংস্থাপন রূপটি গড়ে উঠেছে। তাই ইমানুয়েল কান্টের মানসিকতা জানতে গেলে দেকার্তের থেকে শুরু করে লক, বার্কলি ও হিউমের চিন্তনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় একটি আবশ্যিক শর্ত।

ক. তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিকোণ :

দ্বিজেন্দ্রনাথের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়নেও তাৎক্ষণিক দার্শনিক মনন-চিন্তনের আবহপট আমাদের কাছে স্পষ্ট হবার প্রয়োজন আছে। প্রসঙ্গত তাঁর অনুজ রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন: 'তখনকার কালে য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতার প্রভাবই প্রধান। তখন বেন্থাম, মিল ও কোঁতের আধিপত্য। তাহাদেরই যুক্তি লইয়া আমাদের যুবকেরা তখন তর্ক করিতেছিলেন···আমাদের দেশে ইহা আমাদের পড়িয়া পাওয়া জিনিস।··· নাস্তিকতা আমাদের একটা নেশা ছিল।'[১]

সমসাময়িক অন্যান্য চিন্তাবিদদের রচনাতেও সেই যুগের মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় :

> একদিকে কার্টিজিয়ান দর্শনশাস্ত্রের অযৌক্তিক অনিয়ন্ত্রিত বাগ্‌বাহুল্য ও সমতাভিমানের অতি ভীষণ আঘাতে এবং আন্বিক্ষিকী যুক্তির দৃঢ়ভূমির সমুৎপাদনে জ্ঞানবিজ্ঞানের অতুল অমিতনির্ঝর স্বরূপদর্শন শাস্ত্রের অতীব শোচনীয় ও ভয়াবহ অবস্থা হইয়াছিল, অপরদিকে তদ্রূপ ডেভিড হিউম

প্রভৃতির অন্তঃসারশূন্য "শূন্যবাদ" জ্ঞানপিপাসু মনুষ্য জাতিকে বড়ই ভয়ব্যাকুল ও হতাশ করিয়াছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের অভ্যন্তরে বা অন্তরালে যে জ্ঞানানুস্যূতা অনাদি অপ্রমেয় মহাশক্তির নিত্যলীলা বর্তমান, তাহার মূলেও অতি নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে মনুষ্যকে বড়ই আকুল ও বিত্রাসিত করিয়াছিল।[২]

এই অনীশ্বর মনোভঙ্গিটির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েও তাকে সমর্থন করতে পারেন নি. অতিক্রম করে গিয়েছেন। রোমাঁ রোলাঁ রবীন্দ্রনাথপ্রসঙ্গে একটি বীজমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন : 'He recoiled from every thing that stood for No,' এ কথার অর্থ এই নয় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আনন্দবাদের সাহায্যে নেতিকে একটি সদর্থক প্রতীতিতে পরিণত করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গেও কথাটি সার্থকভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। তাঁর 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্যের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ সর্গের ভাবক্রম অনুসরণ করলে দেখা যায় যে জীবনের নিরীশ্বর অথবা নাস্তিক পর্যায়গুলিকে তিনি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু সপ্তম সর্গে এসে সেই নাস্তিক্যও বলিষ্ঠ একটি সমগ্রতায় (totality) পরিণত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের পারমার্থিক (metaphysical)[৩] তথা দার্শনিক এবং ধর্মীয় চিন্তাধারার মধ্যে পরিণামী এই প্রক্রিয়াটি লক্ষ করা যায়।

কোঁতের স্বভাববাদ (positivism), বার্কলের অনুভূত অস্তিত্ববাদ (Esse est percipi), মিলের উপযোগবাদ (Utiliterianism) তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। হেগেলের চিন্তাবস্তু (thought) ও বস্তু-বিশ্বের (Reality) সমীকরণকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন।[৪]

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ইমানুয়েল কাণ্ট। এই রকম বলা অযৌক্তিক হবে না যে এই দার্শনিকের চিন্তাপদ্ধতি তাঁকে সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত করেছিল, এ নিয়ে তিনি সব থেকে বেশি ভেবেছিলেন। এ কথার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে কাণ্টের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের মানসিকতার গতিপ্রকৃতি সর্বাঙ্গীণ অর্থে সদৃশ ছিল। বরং তাঁদের মনোধর্মের বৈষম্য একাধিক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে এই ভাবুকটির ভিতরেই দ্বিজেন্দ্রনাথ এমন একটি ঋদ্ধি ও বৈচিত্র্য লক্ষ করেছিলেন যা ভারতীয়তায় (Indianness) মীমাংসিত হতে পারে।

অন্যভাবে বলতে গেলে তিনি অনেকক্ষেত্রেই কাণ্টের পূর্বপ্রতিজ্ঞা (premise) গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত নয়। কাণ্ট তাঁর মনে জাগিয়েছিলেন প্রেরণা-সঞ্চারী ভাবনা তত্ত্ববিদ্যা ও সত্যাসত্য বিষয়ে কিছু উদ্দীপক প্রশ্ন ; এবং সেই-সব প্রশ্ন বা প্রবর্তনাকে তিনি তাঁর ভারতীয় মন নিয়ে যে শাস্ত্রটির অভিমুখে সঞ্চালিত করেছিলেন— সে শাস্ত্রের নাম উপনিষদ।[৫]

সন্দেহ নেই দ্বিজেন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের সূচনা-পর্ব থেকেই উপনিষদ ছিল প্রধানতম প্রস্থানভূমি। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'তাঁর জীবনের আনন্দপ্রভাতে উপনিষদের শ্লোকগুলি ছিল প্রভাতের আলো।'[৬] কিন্তু এ কথা বললে অসংগত হবে যে উপনিষদের অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক উত্তরণকে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই গ্রহণ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে দর্শনচর্চাকে তিনি জৈব প্রয়োজনের মতোই একটি প্রাত্যহিক ও অনিবার্য চর্চা হিসেবে দেখেছিলেন। 'আধ্যাত্মিক' শব্দটি প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি মানুষের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সাধ্য ও কর্মকেই বুঝিয়েছিলেন, জীবন থেকে দূরবর্তী, নিতান্ত নির্বস্তুক কোনো অনুশীলনকে নয়। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত তাঁর একটি চিঠির এই উৎকলনটি অপ্রাসঙ্গিক নয়: 'মনুষ্যের অন্নবস্ত্রাদি অভাব মোচনের জন্য কৃষিবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করা আবশ্যক, এবং আধ্যাত্মিক অভাব মোচনের জন্য আত্মা-বিষয়ক এবং পরমাত্মা-বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক।'[৭]

উক্ত উদ্ধৃতিটিতে উল্লিখিত আধ্যাত্মিক অভাব ঠিক divine discontent -এর প্রতিশব্দ নয়, পক্ষান্তরে সর্বাঙ্গীণ জীবনের একটি বিশেষ অবস্থা (situation) যার ভিতর থেকে তিনি স্বাভাবিক উপায়ে একটি ঊর্ধ্বগ পথ রচনা করতে চেয়েছিলেন। কাণ্ট প্রমুখ দার্শনিকদের চর্যায় অনেক সময়েই দর্শনের ঔপপত্তিক (theoretical) ও প্রযুক্তিগত (applied) দিকটি বিভাজিত হয়ে গিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর "আধ্যাত্মিক অভাবমোচনের" জন্য কাণ্টীয় দর্শনের মর্মবস্তুকে সর্বজনগ্রাহ্য করে 'প্রবাসী'র পাতার পর পাতায় মাসের মাস তুলে ধরেছিলেন, তাঁর কাছে দার্শনিক পথনির্দেশ ব্যাপারটি ছিল জীবন যাপনের মতো অবহিত সত্য।

তাঁর *Critique of Pure Reason* সন্দর্ভে জ্ঞানের ভিত্তিকে কাণ্ট বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কাণ্টের মতে স্বজ্ঞার (intuition) সাহায্যে আমরা বস্তুরাশির সংস্পর্শে আসি। সংবেদনের সাহায্যে আমরা বস্তুর পরিচয় যথাসাধ্য লাভ করি যা আমাদের চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টির আধার হয়ে ওঠে। তার ফলেই আসে আমাদের বোধক্ষমতা ও প্রতীতিবর্গ (concepts) এই প্রজ্ঞা যা ইন্দ্রিয়চেতনার মধ্য দিয়ে বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই হল অভিজ্ঞতাজাত (empirical) এবং অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বোধির অনির্ণেয় আধেয় হল তার প্রকাশ (appearance)। প্রাতিভাসিক এই-সব প্রকাশ ইন্দ্রিয়-আহৃত নয়, মনোরাজ্যে পূর্বনিরূপিত স্বতঃসিদ্ধ (a priori) কাণ্টের এই চিন্তন-বিন্যাস দ্বিজেন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় সামগ্রিকভাবে গৃহীত হয় নি।

তিনি মনে করেছিলেন উল্লিখিত এই জ্ঞানের স্বরূপ শুধুমাত্র বিবিক্ত স্বতঃসিদ্ধ প্রণালীগুলির অনুধাবনে আয়ত্ত করা যাবে না। এই প্রণালীগুলি কাণ্টের গূঢ়ার্থ সন্ধানী প্রবণতাকে সূচিত করলেও পরমার্থের সন্ধিৎসাকে সবতোরূপে সহায়তা করে না :

> কাণ্ট কেবল জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ প্রণালীগুলি আবিষ্কার করতে সবিশেষ যত্ন পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক সত্তার সহিত যে তাহাদের পদে পদে যোগ আছে— তাহারা যে কেবল শূন্য প্রণালীমাত্র নহে— ইহার মীমাংসার স্থলে তিনি বিষম সংশয়চক্রে পড়িয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। এই অভাবটির পূরণ উদ্দেশ্যে ব্যাপ্তির লক্ষণ ও শক্তি ঘটিত প্রণালী সকল পূর্ণরূপে পরমাত্মা ও জগতের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে ; সুতরাং বাস্তবিক সত্তাই উহাদের মূল।[৮]

বস্তুত কাণ্টের সমীক্ষণ-দক্ষতা তাঁকে মুগ্ধ করলেও তাঁর অমীমাংসিত ও অনির্ণীত পরিণাম দ্বিজেন্দ্রনাথের মানসিকতার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি, তাই তিনি বলেছেন :

> কাণ্ট মনে করিলেই পারমার্থিক সত্যের কূলে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি কিনারায় আসিয়া নৌকাডুবি করিয়া বসিলেন। কাণ্ট প্রথমে এই বলিয়া যাত্রারম্ভ করিয়াছিলেন যে ইন্দ্রে যাহা প্রকাশ পায় তাহা বাস্তবিক সত্য। আমরা বলি যে, যাহা বিশুদ্ধজ্ঞানে প্রকাশ পায় তাহা জ্ঞানগত সত্য মাত্র—তাহা বস্তুগত সত্য নহে, বাস্তবিক

সত্য নহে; ঐন্দ্রিয়ক অবভাসই বাস্তবিকতার মূল— এইখানে তাঁহার দার্শনিক নৌকো একেবারেই বিপর্যস্ত হইল— নৌকোর মাস্তুল নীচে চলিয়া গেল ও নৌকোর তলদেশ উপরে উঠিল। কান্ট বলেন যে বিশুদ্ধ জ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মূলে বস্তু যাহা অবধারণ করে তাহা মোটামুটি সত্য মাত্র, তা ভিন্ন তা পারমার্থিক সত্য নহে, অর্থাৎ তাহা প্রকৃত পক্ষে বস্তু নহে তবে কিনা তাহাকে বস্তু বলিয়া বিশ্বাস না করিলে লোকযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে না— এমন কি বিজ্ঞানও একপদ চলিতে পারে না— এইজন্য তাহাকে বস্তু বলিয়া স্বীকার না করিলেই নয়। কান্টের এই কথার বিরুদ্ধে বেদান্তদর্শন বলেন— তুমি আপনি তো বলিয়াছ যে ঐন্দ্রিয়ক অবভাস— অবিদ্যা আমাদিগকে বাস্তবিক সত্য দিতে পারে না— বিশুদ্ধজ্ঞানই আমাদিগকে বাস্তবিক সত্য দিতে পারে।[৯]

এই বিশুদ্ধ জ্ঞান কান্টের ধারণায় ধরা দেয় নি বলে দ্বিজেন্দ্রনাথের ধারণা। তিনি এইখানে কান্টের সঙ্গে তুলনায় বেদান্তের আপেক্ষিক জয় দেখিয়েছেন: "কান্ট বলেন যে খাঁটি সত্য আমাদের জ্ঞানে ধরা দেয় না— যদি বা ধরা দেয় তা আমাদের কোন ব্যবহারে আসে না— বেদান্ত বলেন ব্যবহারে আসা বা না আসা পরের কথা আপাতত তাহা জ্ঞানে ধরা দেয় কিনা তাহাই স্থির হোক।"

আসলে কান্টের অনির্ণেয়তা বা অনির্দেশ্যতা তাঁকে দুশ্চিন্তিত করেছিল। জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মের বিশ্বাসপুষ্ট তাঁর মন চেয়েছিল অনির্ণেয়কে সুনির্ণীত করতে, তাই তাঁকে দেখা যায় বেদান্তের সঙ্গে তুলনা করে আধুনিক চিন্তাজগতের প্রিয় দার্শনিক কান্টের অক্ষমতা প্রমাণের চেষ্টা করতে:

তিনি পারমার্থিক সত্যের কূল প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন দেখিয়া হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে, পারমার্থিক সত্যকে জ্ঞানে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না। জ্যোতির্ময় জাগ্রত জীবন্ত পারমার্থিক সত্যের পরিবর্তে কান্ট কি দেখিলেন? না একটা অন্ধ, অনির্দেশ্য মৃত বস্তু, তাহা কি যে তাহার ঠিকানা নাই আর তিনি তাহার নাম দিলেন— the thing in itself বস্তু-স্বরূপ অথবা তমস্বরূপ বেদান্ত দর্শনের পারমার্থিক সত্য যেমন সত্য স্বরূপ তেমনি জ্ঞান-স্বরূপ সেখানে সত্য এবং জ্ঞান একাধারে বর্তমান। কিন্তু কান্টের সেই যে বস্তু-স্বরূপ সেখানে জ্ঞানের একেবারেই যাইতে বারণ।

সেখানে জ্ঞান প্রবেশ করিলে পাছে বস্তুগত সত্য জ্ঞান সত্য হইয়া উঠে এই ভয়েই কাণ্ট সর্বদা আশঙ্কিত। কাণ্টের এই ভয় নিতান্তই নিষ্করুণ একটা রোগ বিশেষ।[১০]

কাণ্ট প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের অসংখ্য নিবন্ধমালার প্রণিধানযোগ্য কয়েকটি পর পর তিন বছরের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত :

১. জর্মন্যদর্শনের দুর্ভেদ্য গিরিসংকটের মধ্য দিয়া সাংখ্য বেদান্তে প্রবেশ[১১]
২. কাণ্টে বেদান্তে বোঝাপড়া[১২]
৩. কাণ্টীয় দর্শনের স্বরূপবস্তু[১৩]
৪. কাণ্ট এবং সাংখ্য বেদান্ত[১৪]
৫. কাণ্টীয় বিজ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তিমূল[১৫]
৬. কাণ্টীয় বিজ্ঞানতত্ত্বের মোট সিদ্ধান্ত[১৬]
৭. কাণ্টের অভিপ্রেত উৎপাদিকা ও প্রত্যুৎপাদিকা মনোবৃত্তি[১৭]
৮, কাণ্টীয় দর্শনের মরুভূমি হইতে সাংখ্য বেদান্তের তপোবনে গমনোদ্যোগ[১৮]
৯. প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য দর্শনে পথিমধ্যে কোলাকুলি[১৯]
১০. এ পারের দেশীয় দর্শন হইতে ওপারের কাণ্টীয় দর্শনে সেতু প্রসারণ[২০]
১১, দার্শনিক সেতুবন্ধন কার্যের বাগ ফিরাইয়া বাকী পূরণের উদ্যোগ[২১]
১২. প্রাচ্য প্রতীচ্য দর্শনের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধন কার্যের মাঝপথে সহসা উত্থিত তর্কবিতর্কের প্রথম ঝটিকা[২২]

রচনাগুলির নামকরণ থেকেই এ কথা বোঝা যাবে যে কাণ্টের মধ্যে তিনি বিশাল একটি ভাবরাজ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু এই ভাবরাজ্যটি তাঁর কাছে সমস্ত ঐশ্বর্য সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। এই অসম্পূর্ণতাকে তিনি ঢেকে দিতে চেয়েছিলেন মাঙ্গলিক বেদান্ত চিন্তার আচ্ছাদনে। তাঁর 'তত্ত্ববিদ্যা' গ্রন্থটি পাঠ করলেই বোঝা যাবে তিনি অনেকক্ষেত্রেই কাণ্টের বিশ্ব-বিশ্রুত গ্রন্থের সারাংশ বজায় রেখে তার উপরে একটি অমর্ত্য ভারতীয় মাত্রা (dimension) জুড়ে দিয়েছেন। ইন্দ্রিয়বোধে ও প্রজ্ঞায় উপলব্ধ যে-সব অতীন্দ্রিয়, অবশ্যম্ভাবী, সার্বভৌম মূলতত্ত্ব নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন তাদের

অধিকাংশই কাণ্টের বর্গ (categories) বা যুক্তি ভাবনার (ideas of reason) তালিকায় পড়ে না। তাঁর নিজস্ব এষণার প্রবর্তনায় কাণ্টের তালিকাভুক্ত অনেককিছুই তিনি বাদ দিয়েছেন। কাণ্টের নির্দেশিত পারমার্থিক সত্তার তিনটি রূপ, ঈশ্বর, মুক্তি ও আত্মার অমরত্ব দ্বিজেন্দ্রনাথের পুনর্বিবেচনায় অন্যতর লোকে নীত হয়েছে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে যুগপর্বে তাঁর আবির্ভাব সেটি নব্য-বৈদান্তিক ভাবাদর্শে প্রাণিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ বেদান্তের মত অনুসরণ করে বিশ্বাস করতেন পারমার্থিক সত্য হচ্ছে ব্রহ্মতত্ত্ব। এই ব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত, চিৎশক্তি। জীব এবং জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশ। জীব জগৎকে যে ভালোবাসে তার প্রধান কারণ উভয়েই একই তত্ত্বের আংশিক প্রকাশ। দ্বিজেন্দ্রনাথ মনে করেন, কাণ্ট সত্যের অস্তিত্ব বিশ্লেষণ সূত্রে দেখিয়েছেন প্রাকৃতিক জগৎ জ্ঞেয় কিন্তু অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে আছে যে অতিশায়ী বস্তুসত্তা সেই জগৎ জ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধির গম্য নয় ফলত কাণ্টের দর্শনে অনিবার্যভাবে একটি দ্বৈতবাদ (dualism) এবং এক ধরনের সংশয়বাদ এসে যাচ্ছে। বেদান্তের অবস্থানভূমি থেকে বলা চলে যে প্রকৃতজ্ঞান পারমার্থিক তত্ত্ব নিয়েই সম্ভব; অন্য সব জ্ঞান এক অর্থে খণ্ড জ্ঞান। সুতরাং অদ্বৈততত্ত্বের ভূমি থেকে যদি আরম্ভ করা যায় তবে জগৎ-স্বরূপ এবং জীব স্বরূপের সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

এই সূত্রে এ কথা বলা অন্তত প্রাসঙ্গিক যে দ্বিজেন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদ (morism) এবং অবিত্তাবাদ (atheism) কোনোটিই মানেন নি। অদ্বৈত-বাদের দাবি: পরব্রহ্মে বিলীন হওয়াই জীবের পরম পুরুষার্থ; পক্ষান্তরে অবিত্তাবাদে প্রস্তাব পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই জীবনের সার্থকতা।

> এই দুই মতের কোনটি আমরা শুনব? পৃথিবী centripetal এবং centrifugal এই দুই tendencyর টানাপোড়েনে সূর্যের চারিদিকে অবিরাম ঘুরছে। এবং সূর্যের আলো জ্যোতি দ্বারা লাভবান হচ্ছে।
>
> আমাদেরও সেরকম সর্বাঙ্গীণ সত্যের পথ অবলম্বন করা কর্তব্য। অদ্বৈতবাদ বা অবিত্তাবাদ— এই উভয় মতবাদই আমার মতে একদিক ঘ্যাঁসা।[২৩]

শংকরের নির্গুণ ব্রহ্মকে বর্জন করে ব্রাহ্ম-ভাবুক ব্রহ্মকে পরম কারুণিক বলে মনে করেছেন। তার আনন্দময় স্বরূপেও তাই দ্বিজেন্দ্রনাথের আস্থা। বেদান্ত

দর্শনের পারমার্থিক সত্য একাধারে সত্যস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। সুতরাং বেদান্তের কাছে পরম সত্যকে জানার সমস্যা কোনো সমস্যাই নয়। এই ব্রহ্মবোধ অপরোক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে অর্জন-সাপেক্ষ।

কাণ্ট বস্তুগত বিজ্ঞান সত্যকে স্বীকার করলেও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন এবং মনে করেছেন সেই পরম তত্ত্বের কাছে উপনীত হবার পথ অন্য, যেমন নৈতিক বোধ (ethical sense) বা সৌন্দর্যচেতনা (aesthetic sense)। দ্বিজেন্দ্রনাথে কিন্তু পরবিদ্যার ভেদরেখা নেই। দ্বিজেন্দ্রনাথ মনে করেন যাকে কাণ্ট অজ্ঞেয় বলে নির্দেশ করছেন তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও অনারোহ নয়। ফলত এই-সব তত্ত্ব বা বস্তু যে জ্ঞানস্বরূপ, কাণ্টের কর্তব্য ছিল সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। এইখানেই দ্বিজেন্দ্রনাথের মতে কাণ্টের দর্শনের প্রধান দুর্বলতা।

এইভাবে তিনি কোঁতকেও বর্জন করেছেন: 'আমরা যেখানে বলি যে মূল সত্ত্ব, কমটি সেখানে বলেন যে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীই আমাদের বিশ্বাস।'[২৪] অন্য যে দুজন দার্শনিককে তিনি তাঁর নব্য বৈদান্তিক চরিতমানসের ছাঁচে ঢেলে নিতে চেয়েছেন তাঁরা হলেন দেকার্তে এবং বার্কলে। 'সন্দেহকারীর অস্তিত্ব আর অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকে না। বেদান্ত দর্শনের মূলে এই প্রধান সত্য— Cogito ergo sum— আমি ভাবিতেছি অতএব আমি আছি।'[২৫] এই আরোপণে তিনি দেকার্তের সিদ্ধান্তকে নিজস্ব অভিরুচির রঙে সাজিয়ে নিয়েছেন। বার্কলের প্রবণতাকেও তিনি সম্পূর্ণ বুঝতে চেয়েছেন বলে মনে হয় না; কেননা তার মধ্যে তিনি বেদান্তানুগ পরমাত্মার (Supreme God head) অভিক্ষেপ এই ভাবে খুঁজেছেন: 'ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের মনে উপর এমন ভাবে কার্য করে যাহাতে আমাদের মনে এইরূপ পরিবর্তন উৎপন্ন হয় যে তাহাতে আমাদের বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বরূপ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়।'[২৬] এই উদ্‌ধৃতিটি থেকে এরকম মনে করার অবকাশ আছে যে, অক্ষয়কুমার দত্ত -লিখিত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' বইখানির প্রস্থান-কোণটিকেও তিনি বেদান্তের আলোয় খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন।[২৭]

বস্তুত অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণে দেখা যায় মহর্ষির মতো তিনিও 'উপনিষদকেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ' করেছেন। বেদান্ত দর্শনের জীব-ব্রহ্ম সমীকরণকেও শেষপর্যন্ত সমর্থন করতে না পেরে উপনিষদের আনন্দ সত্তা তথা একধরনের

ভক্তিবাদকে স্বীকার করেছেন। যার প্রবর্তনায় রবীন্দ্রনাথ বলতে পেরেছিলেন : 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর / তোমার প্রেম হত যে মিছে।'

প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গে তিনি যে-সব উক্তি করেছেন সে-সব ক্ষেত্রে সর্বত্রই তাঁর দার্শনিক অবলোকনে এমন একটি পরিশ্রুত দ্বৈতবাদের পরিচয় আভাসিত হয়েছে যাকে আমরা আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষায় আপেক্ষিক দ্বৈতবাদ (adualism) বলতে পারি। তাঁর এই আপেক্ষিক দ্বৈতবাদে বেদান্তের জ্ঞানস্বরূপ এবং উপনিষদের আনন্দ সত্তা সমন্বিত হয়েছে। শংকরাচার্যের মায়াবাদকে তিনি চূড়ান্তভাবে বর্জন করেছেন। রামানুজ বা নিম্বার্কাচার্যের ভক্তিবাদকেও সর্বৈবভাবে গ্রহণ করেন নি ; অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব তাঁর অপ্রমত্ত মানসিকতার কাছে বিবেচিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব' বইখানির সূত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর অনুজকে যে কথা লিখেছেন সেটি প্রসঙ্গত গভীর তাৎপর্যময় :

> ওই বইটে বড়ই গোলমেলে— একদিকে পৌত্তলিকতা আর একদিকে অদ্বৈতজ্ঞান··· সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই মধ্যপথ— তাহাই প্রকৃত সত্যের পথ। পৌত্তলিকতা তাহার একরূপ বিকৃতি এবং শূন্য অদ্বৈতবাদ তাহার একরূপ বিকৃতি— ভক্তেরা personal godকে means to an end করিতে পারেন না— কিন্তু তাহাই লেখক বলেন। তিনি বলেন Personal God impersonal-এ উঠিবার সোপান।

বস্তুত দ্বৈতভিত্তিক ভক্তিবাদকে পুনর্বিবেচনা করার ঝোঁকটি তিনি মহর্ষির কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মহর্ষি-বিবেকানন্দের নিম্নবর্ণিত সাক্ষাৎকার ও আলোচনা গত শতকের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তনের ইতিহাসে একটি উল্লেখ্য ঘটনা :

> "Can you teach me Advaita ?" "The Lord has yet only shown me Dualism", was the simple reply. And then, seeing the young man's discouragement in the face of such sincerely, the older master had consoled him : "Have confidence, my son. You have the eyes of a Yogi ; the finger of god is upon you...."[২৮]

পূর্ণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য উপাসকের ভূমিকাকে তিনি স্বীকার করে

নিয়েছেন। তিনি এই অবস্থান ভূমিটিকে অধ্যাত্ম যোগ নামাঙ্কিত করেছেন। একালের দার্শনিক তাই নাম দিয়েছেন "বিরোধ-জয়ী অখণ্ড সত্তাবাদ"।[২৯]

বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনায়নের মধ্যে একটি শুভংকর সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তোলাই দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের লক্ষ্য :

> সাংখ্য দর্শন প্রকৃতিকে পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাকে অনাথা উন্মত্তা ও উচ্ছৃঙ্খলা করিয়া ফেলিল।... বৈষ্ণব শাস্ত্র ভক্তিকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে বিপথ-গামিনী করিয়া ফেলিল।... শৈবদর্শন শিবকে অর্থাৎ মঙ্গলকে শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল।" "তারপর এই সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবয়ব খণ্ডে জীবন সঞ্চার করিবার অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভাবনা আরম্ভ হইল।... অনীশ্বরা প্রকৃতিকে কালী দুর্গা রূপে সাজাইয়া তোলা হইল।... এ মহা ব্যাধির প্রতীকার কেবল এক উপায়ে হইতে পারে। সে উপায় হচ্ছে— আত্মার একটিও আধ্যাত্মিক অবয়ব ছিন্ন না করিয়া পরমাত্মার সহিত তাহার সর্বাবয়ব সম্পন্ন যোগ সংস্থাপন করা। এইরূপ যোগের নাম অধ্যাত্ম-যোগ।[৩০]

কখনো কখনো দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বৈতত্ত্বের ভিত্তিটিকে স্বীকার করে সাংখ্য এবং পাতঞ্জলের বীক্ষণভূমি মেলাতে চেয়েছেন। সন্দেহ নেই সাংখ্যদর্শন এবং পাতঞ্জলের যোগের একটি নিগূঢ় সাদৃশ্য-সূত্র বিদ্যমান কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর দার্শনিক উপলব্ধিকে উদাহরণ যোগে প্রতিপাদন করবার উদ্দেশ্যে একটু জোর দিয়েই এই সাদৃশ্যটিকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন : "আত্মাতে সমাধি করিতে পারিলেই সঠিক প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ... এইরূপ প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ করাই সাংখ্য এবং পাতঞ্জলের মতে পুরুষের পুরুষার্থ।"[৩১]

এখানে এমন সিদ্ধান্ত করবার কারণ নেই, তিনি এই দুটি দার্শনিক ধারাকে পরিহার করেছেন। বরং তাঁর প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণে এই কথাটি আমাদের কাছে ক্রমশ গোচর হতে থাকে যে সর্বাভ্যন্তরে চৈতন্যের সাহায্যে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অথচ অভিজ্ঞতার নানাভিমুখী বিক্ষেপজালকে পরিশীলিত করে, নিত্যবস্তুর অনিঃশেষ এবং নিঃশর্ত অন্বেষণ এবং উদ্ঘাটনই তাঁর পথ, উদ্দিষ্ট। তাই দুঃখ থেকে মুক্তির কথা তিনি বারংবার উচ্চারণ করলেও তিনি যে সুখের কথা আমাদের শুনিয়েছেন তা যেমন কোনো ক্রমেই চার্বাক পন্থার

ভাবসঙ্গবাহী নয়; অন্যদিকে তেমনি ইউরোপীয় দর্শনের সুখবাদ (hedonism) স্পর্শবহ নয়। তাঁর সেই বোধ উপনিষদ-প্রেরিত। সুখ যেখানে আনন্দের সমার্থক, আনন্দ সেখানে জ্ঞানের উদ্দীপক। তাই আচার্যের আসনে বসে তিনি আমাদের উপনিষদের বাণীই শোনালেন—

"যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥

যিনি মহান তিনি সুখস্বরূপ, অল্প কিছুতে সুখ নাই, মহানই সুখ, মহানকেই জানতে ইচ্ছা কর।"

দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রস্থান-ভূমিতে কাণ্ট, উদ্দিষ্ট উপনিষদ। '*The point of excersion is home*'— ডি. এইচ. লরেন্সের (১৮৮৫-১৯৩০) এই উক্তিটির আলোকে বলা যায় তিনি পাশ্চাত্য দর্শনে তাঁর সুনিপুণ অধ্যয়নের ভাবকেন্দ্র হিসেবে রেখেছিলেন উপনিষদের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা। এই আস্থা শুধুমাত্র তাঁর মনন-জাত নয়, তাঁর সমগ্র জীবনচর্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেখানে তিনি নিবিড়ভাবেই ভারতীয়। এই ভারতীয়তার মনন ও প্রাণন ওতপ্রোত। দ্বিজেন্দ্রনাথের দার্শনিকতায় এই দুয়ের মিলন একটি স্বাভাবিক ভারসাম্য পেয়েছে।

খ: তাঁর ধর্মচিন্তা

দার্শনিক জিজ্ঞাসার সঙ্গে ধর্মীয় ভাবনার একটি অচ্ছেদ্য মৈত্রী ভারতীয় মানসের বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ইউরোপে যেমন দেবায়ন বা divinityকে সরিয়ে দিয়ে মানববিদ্যার (humanities) প্রচলন হয়েছিল, আমাদের যাঁরা প্রবক্তা তাঁদের রচনাতেও সেই সময় এইজাতীয় পরিবর্তন চোখে পড়ে। Literature is the expression of religious ideas— ফিশটের এই উক্তির সত্যতা তাঁদের রচনাতেও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। 'জাতির মর্মকে আশ্রয় করিতে গেলে তাহার ধর্মকেও আশ্রয় করিতে হইবে।'— গিরিশচন্দ্রের এই উক্তিটি উনবিংশ শতাব্দীর মানবপ্রবণতাকে মূর্ত করে তোলে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তার সঙ্গে ধর্মচিন্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়েছিল। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা তাঁর ধর্মভাবনার বিশেষত্বটি ঈষৎ পৃথকভাবে

আলোচনা করছি। প্রসঙ্গত আমরা ভগবদ্‌গীতার দ্বিজেন্দ্র-কৃত ভাষ্য ও অন্যান্য দু-একটি ভাষ্য অবলম্বন করে এই ধর্মভাবনার স্বরূপ সূত্রটি অনুধাবন করতে চেষ্টা করি।

অন্তরঙ্গ দৃষ্টিপাতে প্রমাণিত হয় কাণ্টীয় দর্শনের অনির্ণেয়, অমীমাংসিত সুর ও তৎকালীন বঙ্গসমাজের নিরীশ্বর ভাবমণ্ডলটি দ্বিজেন্দ্রনাথ, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ চিন্তানায়কদের মনে একটি প্রতিমুখী প্রেরণা জাগিয়েছিল এবং তারই মীমাংসা কল্পে গীতাভাষ্যে হাত দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত শ্রীঅরবিন্দের একটি উক্তি নিকষোপম :

> নাস্তিক বলেন, ভগবানও নাই, আত্মাও নাই, আছে অন্ধশক্তির অন্ধক্রিয়া মাত্র। তাহাই বা কিরূপ কথা। শক্তি কাহার? কোথা হইতে সৃষ্টি হইল, কেনই বা অন্ধ উন্মত্ত এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা কেহই করিতে পারেনি। না খৃস্টান, না বৌদ্ধ, না অদ্বৈতবাদী, না নাস্তিক, না বৈজ্ঞানিক ; সকলেই এই বিষয়ে নিরুত্তর অথচ সমস্যা এড়াইয়া ফাঁকি দিতে সচেষ্ট। এক উপনিষদ ও তাহার অনুকূল গীতা এরূপ ফাঁকি দিতে অনিচ্ছুক।[৩২]

এই যুগপ্রেক্ষণীটি দ্বিজেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার মধ্যেও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক যুগচেতনার নৈরাশ্যময় আবহমণ্ডলকে তিনি অতিক্রম করে যেতে চেয়েছেন। এবং গীতার আলোয় একটি সমাধান করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য :

> পশ্চিমের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া যত না আলোকচ্ছটা দিগ-দিগন্তে বিস্তারিত হইতেছে— আমাদের ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপের অপরাজিত শিখা সে সমস্তেরই উপর মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বর্গীয় মহিমায় দীপ্তি পাইতেছে··· বাষ্পনিশ্চয়ের শ্বেতাভ্র হইতে বিন্দু বিন্দু শান্তিবারি যাহা আমাদের ত্রিতাপ তপ্ত হৃদয়ে সিঞ্চিত হইতেছে তাহা মৃতসঞ্জীবনী সুধা, তাহা অমরত্বের সোপান··· জর্মন দেশের সুবিখ্যাত তত্ত্ববিদ কাণ্ট আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞানীদের অনেকটা কাছাকাছি আসিয়াছিলেন— যদিচ কিন্তু তাঁহার দুইমুখী কথাগুলির ভাব সহজ ধাঁচার বুদ্ধিতে আঁকড়িয়া পাওয়া সুকঠিন।··· কাণ্ট তাঁহার নিজের কথার অসম্পূর্ণতা বুঝিতে পারিয়াও তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করিতে পারিয়া উঠেন নাই।[৩৩]

এই অসম্পূর্ণতার প্রতিবাদন করেই তাঁর গীতাভাষ্য রচনা। কাণ্ট যেখানে এসে থেমে গিয়েছেন, তাকেই দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর ভারতীয় উত্তরাধিকারের দীপ্তি দিয়ে শুভশীল একটি রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছেন এবং ভগবদ্গীতার এই রূপান্তরণ প্রক্রিয়ার অন্যতম একটি উৎস-প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। বালগঙ্গাধর তিলকের গীতাভাষ্যেরও উদ্দীপন বিভব কাণ্ট তথা য়ুরোপীয় দর্শনসঞ্জাত এই অনিশ্চয়তার বোধ যা তাঁকে যুগোপযোগী ভাষ্যদীপিকা প্রণয়নে প্রবুদ্ধ করেছে :

> এই নামরূপের মূলে অবস্থিত যে অনাদি, অন্তর্বাহিরে পূর্ণরূপে অবস্থিত একাত্মক নিত্য ও অমৃততত্ত্ব (গীতা / ১৩, ১২-১৭) আছে তাহার বাস্তব স্বরূপের নির্ণয় কিরূপে হইবে। অনেক অধ্যাত্ম শাস্ত্রজ্ঞ বলেন যে, আর যাহাই হোক না কেন, এই তত্ত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞেয় থাকিবেই, কাণ্ট তো এই প্রশ্নের বিচার করাই ছাড়িয়া দিয়াছেন… তথাপি এই অগম্য অবস্থাতেও মনুষ্য আপন বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের এক প্রকার নির্ণয় করিতে পারে ইহা অধ্যাত্ম শাস্ত্র স্থির করিয়াছে।[৩৪]

এই অধ্যাত্ম শাস্ত্র গীতা। দ্বিজেন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও তিলকের চিন্তাধারার ভিতরে এই একটি জায়গায় একটি সাধর্ম্য সূত্র লক্ষ করা যায় যে এঁরা তিনজনেই গীতার ভিতরে তাঁদের জীবনজিজ্ঞাসার ধর্মীয় নিরসন খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু এখানে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন বঙ্কিমচন্দ্রের মানব-ভিত্তিক তথা ঐতিহাসিক কৃষ্ণচরিত্রায়ণ এবং ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা এঁরা কেউই মানে নি, যদিও বঙ্কিম তিলকের দেশাত্ম-বোধক ধর্মভাবনার অন্তরাত্মা স্পর্শ করতে চেয়েছেন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে তাঁর কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কিত পত্র লিখে তাঁর মতামতের প্রতীক্ষা করছেন।[৩৫] বঙ্কিমচন্দ্রের গীতাভাষ্য ও কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যা তাঁর মনঃপূত হয় নি। তার কারণ বঙ্কিম "মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান"কে অথবা "মনুষ্যজীবন নির্বাহের নিয়ম"কেই তাঁর ধর্মতত্ত্বের প্রধান উপায় (means) এবং উদ্দেশ্য (end) বলে মনে করেছেন।[৩৬]

মানবজীবনই দ্বিজেন্দ্রনাথের ধর্মৈষণার ভিত্তি, কিন্তু লক্ষ্য নয়। একটি শ্রেয়োভাবনায় তাই তিনি বঙ্কিম সম্বন্ধে অনুযোগ করেছেন :

> বঙ্কিমচন্দ্র শেষাশেষি যতই গীতাভক্ত হউন না কেন, তিনি অনেকদিন ধরিয়া পাকা পজিটিভিস্ট ছিলেন। পজিটিভ ফিলসফি যাহাই হউক না

কেন, শুধু মানুষকে লইয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলে চলিবে কেন, religion কি অমনি গড়িয়া তুলিলেই হয়?[৩৭]

মানুষের জীবনে অনেক আপেক্ষিক অনিশ্চয়তার অবকাশ আছে। কিন্তু আদর্শ ধর্মশাস্ত্রে সেই-সব অনির্ধারিত অসম্পূর্ণতা কোনো জায়গা পেতে পারে না, একটি মানদণ্ডের শুদ্ধতায় স্থানান্তরিত হতে পারে মাত্র। প্রসঙ্গত আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকের উক্তিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দৃষ্টিকোণগত মিল দেখি :

It is the nature of the case that the empirical elements should he combined with and set of into non-empirical elements at the points where justification of the ultimate goals··· become involved.[৩৮]

এখানেই কান্ট কোঁতে ও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রময় ভূমিকার প্রধান পার্থক্য। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পেরেছেন : 'প্রবৃত্তির অতীত নিষ্কাম কার্য এবং স্বার্থের অতীত নিঃস্বার্থ কার্য করিলে তাহাতেই বুঝাইয়া যায় যে জগতের মঙ্গলের জন্য, পরমার্থের জন্য কার্য করিতেছি।'[৩৯]

কোঁত যেখানে "জীবনের চিন্তা, প্রবৃত্তি ক্রিয়া—এই তিনটি ব্যাপারকে নিয়মবদ্ধ" করার ভিতরেই দর্শনের প্রান্তিক বিন্দুটিকে খুঁজেছেন, সেখানে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর ভূমিকাটিকে অস্বীকার না করে শেষ পর্যন্ত তাকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন মূল সত্যের নৈর্ব্যক্তিকতার মন্ত্রণায় : 'আমরা বলি মূল সত্যেই আমাদের বিশ্বাস কমটি সেখানে বলেন প্রাকৃতিক নিয়মাবলীই আমাদের বিশ্বাস।'[৪০]

তাই তিনি অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন : 'একমাত্র অদ্বিতীয় সদ্বস্তু নিত্য সত্য। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার সত্তাকে পরিপূর্ণ করে নিত্যকাল বর্তমান।'[৪১]

এইখানেই ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে যে দুঃখের ভূমিকা ও দুঃখনিবৃত্তির উপায় একটি পৌনঃপুনিক প্রসঙ্গ দ্বিজেন্দ্রনাথ তার পর্যালোচনা করে গীতার আলোয় তাৎক্ষণিক প্রচলিত ধর্মচিন্তায় একটি পুনর্নব তাৎপর্য অর্পণ করেছেন :

জনসমাজের মস্তক শ্রেণীর লোকদিগের ভোগের পরিসর যেমন সুবিস্তীর্ণ তাঁহাদের দুঃখ নিবারণ কর্ম চেষ্টার পরিসরও সেইরূপ সুবিস্তীর্ণ···

আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাই বলেন, যে দুঃখই—রজঃগুণী কর্মচেষ্টার প্রবর্তক, আর যেমন কাঁটা বাহির করা যায়, তেমনি কর্ম দ্বারাই কর্ম বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।'[৪২]

তাঁর প্রাঞ্জল গীতা ভাবান্তরের মধ্যে আমরা তাঁর দুঃখ ও দুঃখনিবৃত্তির সম্পর্ক যে নিরুক্তি পরম্পরা পাই, তার মূল ভাবনাটি সাংখ্য-প্রেরিত। তাঁর অনুবাদটি নিম্নরূপ :

অশোচ্যদিগের জন্য শোক করিতেছ। অথচ মুখে জ্ঞানবত্তা প্রকাশ করিতেছ, এটা জেনো স্থির যে লোকের মরণবাঁচনে পণ্ডিতেরা শোক করেন না। শরীরধারীর শরীরে শৈশব যৌবন জরা যেমন অবশ্যম্ভাবী, দেহান্তর প্রাপ্তিও তেমনি অবশ্যম্ভাবী, ধীর ব্যক্তি তাহাতে মুহ্যমান হন না। আত্মা কোনকালে জন্মেনওনা— মরেনওনা— শরীর হত হইলে আত্মা হত হন না। শাস্ত্র ইহাকে ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে ভিজাইতে নষ্ট করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য সর্বগত, অচল, সনাতন। ইহাকে এইরূপ জানিয়া পণ্ডিতেরা ইহার জন্য শোক করেন না। অতএব সুখ এবং দুঃখ, লাভ এবং অলাভ, জয় এবং পরাজয় দুইই সমান জানিয়া বুদ্ধ কৃত-সংকল্প হও, তাহা হইলে পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। এ যাহা তোমাকে বলিলাম এ বুদ্ধি সাংখ্যের মধ্যে পাওয়া যায়, তা ছাড়া আরো এক প্রকার বুদ্ধি যাহা যোগের মধ্যে পাওয়া যায় তাহাকে আশ্রয় করিয়া তুমি স্বচ্ছন্দে কর্মবন্ধন হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবে।[৪৩]

এই ভাবানুবাদের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের তন্নিষ্ঠ অনুবাদের পার্থক্য আছে। কৃষ্ণার্জুন সংলাপের অরবিন্দ কৃত অনুবাদের অংশবিশেষ এরকম :

যাহাদের জন্য শোক করার কোনো কারণ নাই, তুমি তাহাদের জন্য শোক কর। অথচ জ্ঞানীর ন্যায় তত্ত্ব কথা লইয়া পদ করিতে চেষ্টা কর তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারা মৃত বা জীবিত কারোও জন্য শোক করেন না।

*　　　*　　　*

আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন।..

আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য, বিকার রহিত। তুমি আত্মাকে এইরূপ জানিয়া শোক করা পরিত্যাগ কর।[৪৪]

শ্রীঅরবিন্দ এই ভাষান্তরের শেষে সিদ্ধান্ত করেছেন 'মৃত্যু আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, মৃত্যু ফাঁকা আওয়াজ মৃত্যু ভ্রম মৃত্যু নাই।'[৪৫] কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ এরকম কোনো অতীন্দ্রিয় আশাবাদ-আশ্রিত হতে পারেন নি, তিনি স্বীকার করেছেন নিছক তত্ত্বজ্ঞান প্রিয়জন বিচ্ছেদকে সান্ত্বনা করতে পারে না। তাই তিনি অনিত্য দুঃখময় সংসারের পরিবর্তমান স্তর পরম্পর মানুষকে চিরন্তনী আত্মার অনুশীলন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই অনুশীলনের মধ্যে থেকেই তাঁর বিশ্বাস অন্য এক স্তরের 'জ্ঞান, প্রেম এবং আনন্দের' অভিষেক ঘটবে :

প্রকৃত কথা এই যে আত্মা শুধু যে কেবলমাত্র আছে তা নয়, আত্মা জ্ঞান প্রেম এবং আনন্দের খনি। পৃথিবী কত যে যুগ যুগান্ত তপস্যা করিয়া আত্মাকে চাহিয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের অবিদিত নহে··· বেদান্ত শাস্ত্র বলেন যে, আত্মা অস্তি, ভাতি এবং প্রিয়। এই তিন অমূল্য রত্ন একাধারে। অস্তি কিনা আত্মার ধ্রুব প্রতিষ্ঠা, ভাতি কিনা আত্মার জ্ঞানালোক, প্রিয় কিনা আত্মার প্রেমামৃত। পুষ্করিণীতে পঙ্ক জমিয়া তাহার জল যখন অব্যবহার্য হয় তখন পুষ্করিণীর জল যেমন ঝালান আবশ্যক, তেমনি বিবেক, বৈরাগ্য এবং সংযম দ্বারা আত্মার পঙ্কোদ্ধার করা আবশ্যক। তা নহিলে আত্মা সাধকের ভোগে আসিতে পারে না।[৪৬]

দেখা যাচ্ছে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর্মীয় বোধ বলতে প্রাপ্তির চেয়েও প্রক্রিয়ার উপর জোর দিচ্ছেন।[৪৭] প্রকৃতপক্ষে আত্মউত্তরণ ও আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়াটির সঙ্গেই তিনি তাঁর ঈশ্বরোপাসনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন এর মধ্যে কোনোটিকেই তিনি ছোটো করে দেখেন নি। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণে এই ভারসাম্যটি স্পষ্ট :

বুদ্ধদেব অহিংসা, ক্ষমা, দয়া সত্যপরায়ণতা শুদ্ধাচার ইত্যাদি নানা প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্বলিত সাধর্ম জনসমাজে প্রচার করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আত্মপ্রবাহের প্রশ্রয় দিলেন এত বেশী যে, তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তীকালে তাঁহার পক্ষাবলম্বী সাধকদিগের মনে এইরূপ একটা অসংগত বিশ্বাস ক্রমে বল করিয়া উঠিল, যে বীজ বা অস্ফুট চক্ষু মনুষ্যের আত্মার অন্তরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে— বিশিষ্ট রূপ সাধন দ্বারা

কেবল ফুটাইয়া তুলিবার অপেক্ষা। তাহা হইলেই মনুষ্য সর্বজ্ঞ হইতে পারে।[৪৮]

আত্মাকে উন্মোচনের লক্ষ্য হিসেবে তিনি সমগ্রতাকে স্থাপন করেছেন। তাঁর এই সমগ্রতার ধারণা, ব্যক্তির চৈতন্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেও ঐশী দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি আচার-নীতির কঠোর অনুশাসনে বদ্ধ হতে চান নি : 'ব্রাহ্মধর্মকে সম্প্রদায়ে বদ্ধ করিও না। সাবধান ইহা যেন কোন গ্রন্থে বা গুরুতে আবদ্ধ করিও না।'[৪৯]

দ্বিজেন্দ্রনাথ-রচিত অন্তত ২৮টি ধর্মসংগীত বা ব্রহ্মসংগীত পাওয়া গিয়েছে সেই গানগুলির মধ্যেও প্রতিষ্ঠান-নিরপেক্ষ অথচ জীবন-ঘনিষ্ঠ অথচ তন্নিষ্ঠ ধর্মবোধের মহিমা লক্ষ করা যায়, তাঁর এই-সব গানের উদ্দিষ্ট 'তুমি' প্রতিষ্ঠান-অতিশায়ী সেই ঈশ্বর যিনি বিশেষভাবেই আবার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের সংগীতগুলি যেমন ছয় ঋতুর বর্ণিল ছবি, দ্বিজেন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতও তাই। চিত্রকল্পে (image) বৈচিত্র্য না থাকলেও ঋতুর উপযোগী রাগ-রাগিণী (যেমন বর্ষা-নিসর্গে মেঘমল্লার, বসন্তে বসন্তরাগ) দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীর পরিমাণে ব্যবহার করেছিলেন। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি উদ্‌ধৃত হল :

আনন্দে আকুল সবে দেখি তোমারে।
পূরিল হৃদয় প্রীতি বিমল-কুসুম-সুবাসে
তব প্রসাদ সব দুঃখ তাপ-নিবারে।
সকল কলুষ ভঞ্জন, জগজন-চিত-রঞ্জন,
তোমারি প্রেম মধুময় জীবন সঞ্চারে।[৫০]

এই সংগীত প্রমাণ করে দ্বিজেন্দ্রনাথও তাঁর ধর্মচেতনার অব্যবহিত বিভাব হিসেবে তাঁর শিল্পচেতনাকে ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গত যেন বলা চলে তাঁর ধর্মজীবন তাঁর রহস্যঋদ্ধ কবিজীবনকে অনুসরণ করেছে।[৫১] এ কথা আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না জীবনের সর্বাঙ্গীণ সমন্বয়ের এই সাধক তাঁর পিতৃদেব মহর্ষির সুফী সাধনায় সমৃদ্ধ দিব্য প্রেম (আস্‌নাই) ও উপনিষদের আনন্দবাদের উত্তরাধিকারকে অঙ্গীকার করে নিয়েই অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন সত্য-শিব-সুন্দরের অভিমুখে।

টীকা

১ যুগভূমিকা ॥

১ যোগেশচন্দ্র বাগল, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা', "নিবেদন", পৃ. ৵৹

২ প্রসঙ্গত দ্র. সুশোভন সরকার, 'সমাজ ও ইতিহাস', পৃ ১৬৪ : 'ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সমগোত্রীয় না হলেও আমাদের রেনেসাঁসই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলাধার।'

সি. এফ. এণ্ড্রুজেরও মনে হয়েছিল বাংলাদেশের রেনেসাঁস ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনীয়। এখানে তাঁর প্রবন্ধ থেকে প্রাসঙ্গিক একটি উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হল :

'The course taken by the Bengal Renaissance a hundred years ago were strangely similar to that of Western Europe in the sixteenth century. The result in the history of mankind is likely to be in certain respects the same also. For, just as Europe awoke to new life then, so Asia is awakening to-day··· in Bengal it was the shock of western civilization which startled the East into new life and helped forward its wonderful re-birth··· Rabindranath Tagore has been its crown.'—"The Bengal Renaissance and Rabindranath Tagore", *Representative Writings*, p. 48

৩ 'সভ্যতার সংকট', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ২৬, পৃ ৬০৫

৪ 'He based his reforms, social or political, agrarian or industrial, on a criticism of social life, on ulterior postulates and concepts, in which he effected a synthesis between the East and the West'— Brojendranath Seal, *Rammohun the Universal Man*, p. 27

৫ H. M. Dasgupta, "Introduction", *Western Influence on 19th Century Bengali Poetry*, pp. 6-7

৬ যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বাংলার নব্য সংস্কৃতি', পৃ ২

৭ Sophia Dobson Collet, *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, pp. 167-8

৮ তু. '১৮২৬ সালে রামতনুবাবু যখন বিদ্যারম্ভ করিলেন, তখন রামমোহন রায় হিন্দু ও খৃস্টান উভয় দলের অপ্রিয় ও উভয়ের কটূক্তির লক্ষ্যস্থল হইয়া রহিয়াছিলেন। বাবুদের বৈঠকখানাতে, রাজপথে, লোক সমাগম স্থলে, এমন কি স্কুলে বালকদিগের মধ্যেও এই সকল বিষয়ে কথা-বার্তা ও বাগবিতণ্ডা সর্বদা চলিত।'—শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ ৬২

৯ Bipinchandra Paul, *Beginning of Freedom Movement in Modern India*, p. 52

১০ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ ৮৫

১১ দ্র. George D. Bearce, *British Attitude towards India* গ্রন্থের অন্যতম উপপাদ্য।

১২ প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথের মন্তব্যে সেখানে দেখা যাচ্ছে তাঁর দৃষ্টিতেও ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল: 'যাঁহাদিগকে তখন ইয়ং বেঙ্গল নামে অভিহিত করা হইত, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।' পৃ ১৮৩

১৩ সুকুমার সেন, "ভূমিকা", 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, পৃ ৭

প্রসঙ্গত বিপিনচন্দ্র পালের *Beginning of Freedom Movement in Modern India* গ্রন্থের (পৃ ৫৩) নিম্নলিখিত অংশ দেখা যেতে পারে:

'Upon the accession of Devendranath Tagore to the leadership of the Brahmo Samaj Movement, and the establishment of Tattvabodhini Sabha and the starting, as its organ, of the *Tattvabodhini Patrika*, the Brahmo

Samaj led for many years the movement of the new Renaissance in Bengali literature.'

১৪ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, পৃ ১৪

১৫ দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন : '...রাজনারায়ণ বাবু ও আমি, আমরা পরস্পর উভয়ের প্রতি খুব আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।'—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, পৃ ১৮৪

২. ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডল ও কবিব্যক্তিত্ব ॥

১ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যাত্রী', ১ম খণ্ড, পৃ ২

২ দেবীপদ ভট্টাচার্য, "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার", 'রবীন্দ্রচর্চা', পৃ ১

৩ 'মা আমার সতীসাধ্বী পতিপরায়ণা ছিলেন। পিতা সর্বদাই বিদেশে কাটাইতেন এই কারণে সর্বদাই তিনি চিন্তিত হইয়া থাকিতেন। পূজার সময় কোনোমতেই পিতা বাড়িতে থাকিতেন না। এইজন্য পূজার উৎসবে যাত্রা গান আমোদ যত-কিছু হইত তাহাতে আর সকলেই মাতিয়া থাকিতেন কিন্তু মা তাহার মধ্যে কিছুতে যোগ দিতে পারিতেন না। তখন নির্জন ঘরে তিনি একলা বসিয়া থাকিতেন। কাকীমারা আসিয়া তাঁহাকে কত সাধ্য সাধনা করিতেন, তিনি বাহির হইতেন না। গ্রহাচার্যেরা স্বস্ত্যয়নাদির দ্বারা পিতার সর্বপ্রকার আপদ দূর করিবার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার কাছ হইতে সর্বদাই যে কত অর্থ লইয়া যাইত তাহার সীমা নাই।'—সৌদামিনী দেবী, "পিতৃস্মৃতি", রবীন্দ্রনাথের 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থে, পৃ ১৫২

৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রানী চন্দ, 'ঘরোয়া', পৃ ৫৫

৫ সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় এর সমর্থন পাওয়া যায় : 'আমাদের বাড়ীর দালানে··· গুরুমশায়ের কাছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি।'—'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', পৃ ৪০

৬ 'ও বাড়ীর মেজদাদার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তখন এ বাড়ী ও বাড়ী কোন প্রভেদ ছিল না, আমরা তাঁকে আমাদের সহোদর ভাইএর মতই দেখতুম। তিনি ছিলেন মেজদা, আমি—সেজদাদা বা সেজবাবু

আর বড়দাদা, এই তিনজনে সর্বদাই আমরা একত্রে থাকতুম, একসঙ্গে খেলা করতুম— আমরা এই trinity তিনে এক একে তিন।'—'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', "আমার বাল্যকথা", পৃ ৩৫

৭ 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, পৃ ১৯০

৮ দ্বিজেন্দ্রনাথ অঙ্ক প্রকৃতই ভালোবাসতেন। পরবর্তী কালে 'ভারতী'তে জ্যামিতি-বিষয়ক রচনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তা ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে এর সমর্থনকারী ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় (পৃ ৮৩): জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন তখন সেখানে Rees সাহেব গণিতের অধ্যাপক ছিলেন···তিনি কাহাকেও বড় প্রশংসা করিতেন না। কেবল একবার জ্যোতিবাবুর বড়দাদার প্রশংসা করিয়াছিলেন।···দ্বিজেন্দ্রবাবু সেই সময় নূতন প্রণালীতে একখানা জ্যামিতি ছাপাইয়াছিলেন। ছাত্ররা মজা দেখিবার জন্য তাঁহার হস্তে সেই বই একখানা দিল। তিনি খানিকটা পড়িয়া বলিলেন, 'This man has brains.'

৯ 'প্রবাসী'তে (বৈশাখ ১৩২১) দ্বিজেন্দ্রনাথ বিষয়ে একটি রচনায় কিন্তু পাওয়া যায়: 'পরীক্ষায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন এবং দশটাকা করিয়া বৃত্তি পাইলেন।'

১০ 'পুরাতনপ্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, পৃ ১৯০

১১ 'কিছুকাল পরে রাজনারায়ণবাবু ও আমি আমরা পরস্পর উভয়ের প্রতি খুব আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।··· তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি।'— 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় পৃ ৩৯

১২ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যাত্রী', পৃ ৩৯। সময়ক্রম সন্নিবেশিত।

১৩ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পিতৃস্মৃতি', পৃ ৮

১৪ 'হাস্যরসের সময় যে অট্টহাসি শুনিয়াছি সে হাস্য সমস্ত শরীর ও অন্তঃকরণ দিয়া একটি বিরাট সম্পূর্ণ হাস্য, তাহার মধ্যে কার্পণ্য লেশমাত্র থাকিত না, বাড়ির ছাদ দ্বিধাবিভক্ত হইবার উপক্রম হইত এবং করতল-স্থিত টেবিলের আয়ুঃ শেষ হইবার উপক্রম হইত। এ হাসি গ্রামোফোনে তুলিয়া রাখিবার হাসি— সরস, উচ্ছসিত আনন্দের প্রাচুর্যে দীপ্তিময় হাসি।'— 'প্রবাসী', বৈশাখ, ১৩২১, পৃ ১০৭। লেখক অজ্ঞাতনামা।

১৫ এণ্ড্রুজ সম্বন্ধে তাঁর অন্তরঙ্গ অঙ্গীকার একটি পত্রে প্রকাশিত হয়েছে :

Dearest Charlie,

As I've no other,
O Charlie brother—
Friend in need
In will and deed
Send I to thee
Sweet Amritee,
A timely token
of Friendship unbroken.
Do not refuse
To make good use
Of this eleventh-Magh Cake
For Baroda's sake.

your own Barodada

—Benarasidas Chaturvedi and Marjorie Sykes, *Charles Freer Andrews*, p 210

১৬ "এই দুইটা কাব্য যে কতবার পড়িয়াছিলাম, তাহার ঠিক নাই, পড়িয়া আশ মিটিত না!"—'পুরাতন প্রসঙ্গ', পৃ ৩৯

১৭ দ্র. সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যাত্রী', পৃ ৩৯

১৮ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, "পুষ্পাঞ্জলি", 'ভারতী', মাঘ, ১৩৩২, পৃ ৩৫২

১৯ দ্র. 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্রনাথ যেখানে 'মেঘদূত' কাব্য পাঠ সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করেছেন।

২০ 'প্রবাসী', ফাল্গুন, ১৩৩২, পৃ ৭১৮

২১ পরিশিষ্টে তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা প্রদত্ত হয়েছে।

২২ 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' : ৬৬, পৃ ১২

২৩ "জ্যামিতির নূতন সংস্করণ", 'ভারতী', অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১২৮৬,

বৈশাখ ১২৮৭; "স্থান মান", 'ভারতী', পৌষ-চৈত্র, ১২৯০, বৈশাখ, ১২৯১

২৪ 'প্রবাসী', বৈশাখ, ১৩১৬, পৃ ৩৬

২৫ 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', পৃ ১২

২৬ রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', পৃ ১০৭

২৭ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', পৃ ১৫৭-৫৮। মন্মথনাথ ঘোষ অবশ্য তাঁর 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বলেছেন যে, এই নামকরণ করেন হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় (দ্র. পৃ ১২০)।

২৮ 'জীবনস্মৃতি', পৃ ২২২। প্রসঙ্গত দ্র. নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রনাথ ও 'সারস্বত সমাজ'", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', কার্তিক-পৌষ ১৩৫০, পৃ. ২১৬-২২৪

২৯ মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', পৃ ১১৬

৩০ তৃতীয় বৎসরের ভাষণে 'দুই বৎসরকাল আমি আপনাদের সাদর আহ্বানের আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া সাহসে ভর করিয়া ভয়ে ভয়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আসিতেছি'—"সভাপতির অভিভাষণ", 'নানাচিন্তা', পৃ ১৭৬

৩১ 'নানাচিন্তা', পৃ ২১৭

৩২ সাহিত্য-সাধক চরিতমালা: 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ ২৩

৩৩ 'প্রবাসী', বৈশাখ, ১৩২১, পৃ ৫১-৫৯

৩৪ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা: 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ ২৩

৩৫ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ১৮১০ শক, পৃ ২০৪: 'অনন্তর ভক্তিভাজন শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ পাঠ করেন।' ১৮১৪ শক পৃ ১২৫: 'আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।' ১৮১৭, পৃ ১৭২: 'পরে স্বাধ্যায়স্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রার্থনা পাঠ করিলেন।'—তিনি যে তাঁর কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন এই-সব উৎকলন সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

৩৬ শিবনাথ শাস্ত্রী দীক্ষা গ্রহণের কয়েকমাস পরেই একবার দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর সঙ্গে বেদীতে বসেন এবং উপদেশ

পাঠ করেন। তিনি পাঠের পরে বেদী হইতে নামিলেই দ্বিজেন্দ্রবাবু কোলাকুলি করিয়া শিবনাথ শাস্ত্রীর উপদেশের অনেক প্রশংসা করেন। দ্র. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'আত্মচরিত', পৃ ১০৩

৩৭ স্মৃতিচারণে তাঁর যে স্বীকারোক্তি: 'কিন্তু আমি কখনও বাহিরের কাহারও সঙ্গে মিশি নাই।' ('সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', পৃ ১৭৯) সম্পূর্ণ চরিত্র বিশ্লেষণী বলে মনে হয় না। তা ছাড়া তখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই এত বিভিন্ন ব্যক্তির সমাগম হত যে বাড়ির বাইরে মেশার প্রয়োজন ছিল না।

৩৮ রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ লেখেন: 'আমাদের ডান হাত বাঁ হাত, poor Nabagopal Babu is taken away from us। তাঁহার স্মরণার্থে meeting করবার জন্য তাঁহার জামাতারা ব্যস্ত। আমাকে preside করার জন্য ধরা পাকড়া কচ্চেন। এ কাজ আমা কর্তৃক হওয়া দুর্ঘট কেননা I am a perfect novice in this trade.'

৩৯ দ্বিজেন্দ্রনাথ-রচিত গানের একটি তালিকা পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।

৪০ 'পুরাতন প্রসঙ্গ', পৃ ২০৪

৪১ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', পৃ ২৪

৪২ "পুষ্পাঞ্জলি", 'ভারতী', মাঘ, ১৩৩২, পৃ ৩১৮। প্রসঙ্গত অবনীন্দ্র-নাথও তাঁর রচনায় বাঁশির উল্লেখ করেছেন: 'জানলার ফাঁকে কোনদিন দেখা যেত জ্যেঠামহাশয় বই লিখছেন, নয়তো গান রচনা করছেন কিংবা কালো রঙের একটা বাঁশি বাজাচ্ছেন।' তদেব, পৃ ৩২০

৪৩ দ্র. অমিয়কুমার মজুমদার, "দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিজ্ঞানচিন্তা", 'অমৃত', প্রথম পর্ব: ২৩ জুন ১৯৭২; দ্বিতীয় পর্ব: ৩০ জুন ১৯৭২; তৃতীয় পর্ব: ১৪ জুলাই ১৯৭২

৪৪ "স্থানমান", 'ভারতী', অগ্রহায়ণ, ১২৮৬, পৃ ৩৭৮

৪৫ বাক্স ছাড়াও কাগজে তিনি আরো রকমারী জিনিস তৈরি করতেন। তাঁর 'কাগজের ভাঁজে তৈরী গুটিদুয়েক ছোট্ট ছোট্ট নৌকা,

গুটিতিনেক দোয়াতের কলম রাখা চৌকানো খোপ আর গুটিতিনেক ছোট ছোট কাগজের পেঁটরা' সম্বন্ধে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী লিখেছেন: 'অবাক হলাম জেনে যে ঐ সব জিনিস তৈরী হয়েছে কোনোরকম আঠার সাহায্য না নিয়ে এবং কোনোরকম সেলাই ফোঁড়াই না করেই— শুধুমাত্র কাগজের ভাঁজের বিচিত্র কৌশলে। একটা ভাঁজের মধ্যে আর একটা ভাঁজ এমন কৌশলে সন্নিবেশিত করা হয়েছে দেখলে মনে হয় আঠা দিয়ে জোড়া, শক্ত মজবুত।'—'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্মৃতিকথা', পৃ ১১

৪৬ '…বাংলা সংক্ষিপ্ত লিপির চর্চা না হওয়া দুঃখের বিষয়। ইংরেজিতে যেমন সাংকেতিক লিপি দ্বারা বক্তৃতা দ্রুত লিখিয়া লওয়া যায়, বাংলায় সেরূপ লিখিবার অভ্যাস কতকগুলি লোক করিলে অনেক ভালো ভালো বক্তৃতা রক্ষিত হইতে পারে। বাংলা সাংকেতিক লিপি যে নাই, তাহাও নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রেখাক্ষর বর্ণমালার সাহায্যে বাংলা বক্তৃতা ও কথাবার্তা দ্রুত লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। এই পুস্তক আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।'—"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উন্নতি", 'প্রবাসী', "বিবিধ প্রসঙ্গ", জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪, পৃ ১১৩

৪৭ দ্র. 'রেখাক্ষর বর্ণমালা'

৪৮ রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে 'আমি এখন ভারী interesting বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত আছি। তাই একটুতেই interruption বোধ হয়। Boxometry তৈয়ার করচি— অর্থাৎ বাক্স তৈয়ার করিবার Mathematical Formula'—'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৯, পৃ ২৩

৪৯ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', পৃ ২৩

৫০ একটি প্রাসঙ্গিক চিঠি :

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কার্যালয়

সম্মানাস্পদ সম্পাদক মহাশয়েষু

সবিনয় নিবেদন

বর্তমান মাসের প্রবাসীতে সংকলন ও সমালোচনা শীর্ষক প্রবন্ধে

সমষ্টির ব্যষ্টি দিয়া চৌকোণ ক্ষেত্রের ঘর পূরণের গোটা কত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া ঐরূপ ঘর পূরণের একটি বিজ্ঞানসঙ্গত প্রকরণ পদ্ধতি সম্প্রতি আমি যাহা অঙ্ক করিয়া বাহির করিয়াছি তাহা বিদ্যানুরাগী পাঠক-বৃন্দকে হয়তো বা আমোদ প্রদান করিবে এইরূপ প্রত্যাশায় আপনাদের সারগর্ভ মাসিক পত্রিকায় উহা প্রকাশার্থে ডাকযোগে প্রেরণ করিলাম। যদি আগামী সংখ্যক পত্রিকায় উহা প্রকাশ করিতে আপনাদের কোনো আপত্তি না থাকে অনুগ্রহ করিয়া যথাসময়ে আমার নিকটে প্রুফ পাঠাইলে বাধিত হইব।

শান্তিনিকেতন — প্রত্যুত্তর প্রার্থী বশম্বদ

বোলপুর ২২ আষাঢ় — শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১ দ্বিজেন্দ্রনাথ, "শব্দচক্র বা শব্দপূরণ", 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ১৩১৬ সন, পৃ ১৪১

৫২ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', পৃ ২৪

৫৩ দ্র. 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', চতুর্থ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

৫৪ দ্র. 'প্রবন্ধমালা', পৃ ১৯৭

৫৫ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্রের অংশ: 'মোহিনীমোহন, বিগত পত্রে— Phoenix-এর বাংলা নাম দিয়েছি ব্যাঙ্গমা। এ নামটি নিতান্ত অসঙ্গত নয় যেহেতু উভয়েই ছেলে ভুলানিয়া মুলুকের পক্ষী।... বর্তমান প্রসঙ্গে ব্যাঙ্গমা শব্দে Phoenix ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না।'

৫৬ 'কলকাতা থেকে তাঁকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতুম ইংরেজি শব্দের যুতসই বাংলার জন্যে। তিনি নতুন বাক্য রচনা করে পাঠাতেন। একটি চিঠিতে লিখেছিলেন তিনি, আমি ডানাভাঙা জটায়ুর মত পড়ে আছি।'—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যাত্রী', ১ম খণ্ড, পৃ ৪১

৫৭ 'হয়ে ডানা ভাঙা জটায়ু পক্ষী
টুকরো টুকরো যা পাই ভক্ষী…
যদ্দিন জটায়ু থাকবে জ্যান্ত
আশীর্বাদটি দিতে হবে না ক্ষান্ত।'

৫৮ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত পত্র, 'উত্তরা', আশ্বিন, ১৩৫৭

৫৯ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠি :

'এবার দ্বিখণ্ডিত করা কঠিন
সবটা দিলে ভালো হয়।
যন্ত্রে সঁপে দিও, থাকিতে দিন
দ্বিজ প্রতি হইয়া সদয়।
বলিতেছ "করিব চেষ্টা"
হইবে দেখিতেছি শেষটা
—পুরুফ সাতাশে বা আটাশে
উড়িয়া আসিবে বাতাসে
পোস্টকার্ড তব— কী তোমায় কব
মাথায় গো হানিল ডাণ্ডা॥
ইহার সত্বর ভেজিয়া উত্তর
দ্বিজের মন কর ঠাণ্ডা'

—'প্রবাসী', চৈত্র, ১৩৩২, পৃ ৭৭৫

অথবা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত অন্য একটি চিঠি :

'আমার Magic Squareটার প্রুফ পাঠাইবার কত বিলম্ব আমাকে যদি একছত্র লিখিয়া জানান তাহা হইলে ভালো হয়। সংশোধনাদি যদি আবশ্যক হয়, তবে পূর্বাহ্নে তাহা হইয়া চুকিলে কোনো গোল থাকে না, নচেৎ পত্রিকা বাহির হইবার সময় সন্নিকট হইলে সংশোধনাদির বড্ড অসুবিধা ঘটে। বেশী সংশোধন করিবার কিছুই নাই— তবুও দুই এক স্থান সংশোধন করা আবশ্যক হইতে পারে। ছাপা না দেখিলে আমি ঠিক বলিতে পারি না— সংশোধন আবশ্যক হইবে কি হইবে না।—আপনার গুণে বাঁধা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

৬০ অমৃতলাল বসু, 'সেকালের কথা', পৃ ৮২

৬১ পরিমল গোস্বামী, 'স্মৃতিচিত্রণ', পৃ ১৩৯-৪০

৬২ "বিবিধ প্রসঙ্গ", 'প্রবাসী', ফাল্গুন, ১৩৩২, পৃ ৭১৯

৬৩ 'প্রবাসী', ফাল্গুন, ১৩৩২, পৃ ৭২০

৬৪ প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', পৃ ৯৬

৬৫ প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', পৃ ১৬; এবং হেমলতা ঠাকুর, "শ্বশুর মহাশয়", 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর: স্মৃতিকথা', পরিশিষ্ট, পৃ ১১১

৬৬ সত্যেন্দ্রনাথ, 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', পৃ ৩৪

৬৭ শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন কর্মী গোপালচন্দ্র বকশী -লিখিত পত্র

৬৮ 'প্রবাসী', ১৩৩২ ফাল্গুন, পৃ ৭২৪

৬৯ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যাত্রী', পৃ ৪০। তু.: 'তিনি বসে থাকতে থাকতে যখন তখন চোখ বুজে ধ্যানস্থ হতেন।'—ইন্দিরা দেবী, 'ভারতী', মাঘ, ১৩৩২

৭০ হেমলতা দেবী, "পুষ্পাঞ্জলি", 'ভারতী', মাঘ ১৩৩২

৭১ স্বর্ণকুমারী দেবী, "পুষ্পাঞ্জলি", 'ভারতী', মাঘ ১৩৩২, পৃ ৩১৮

৭২ সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁর প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য একটি চিঠি:

'আমরা থাকিতে রাজনারায়ণ বাবুর only Surviving সুচরিত্র এবং সুবিনীত পুত্র মুনীন্দ্রনাথ চিকিৎসার অভাবে অকালমৃত্যুর গ্রাসে নিপতিত হইবে— ইহা ভাল কথা নহে— শুদ্ধ কেবল এইরূপে বিবেচনায় বশবর্তী হইয়া আমার এই ঘোর অনটনের অবস্থাতেও আমি অনেক কষ্টে ২০০ টাকা যোগাড় করিয়া তাহার সাহায্যে মুনীন্দ্র বেচারীকে আসন্ন মৃত্যুর গ্রাস হইতে টানিয়া তুলিয়াছি। অ্যাকা আমার দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহা আমি সাধ্যমত করিয়া চুকিয়াছি— বাকী সাহায্য তোমরা না করিলে কে করিবে তাহা তো জানি না।··· Doctor-fee প্রত্যহ ১০ টাকা— সবশুদ্ধ ত্রিশ দশে ৩০০ টাকা That's all. অত্রসম্বলিত চিঠি দু'খানা পড়িয়া যাহা শ্রেয় বোধ কর, করিবে, আর যাহা করিবে তাহা শুভস্য শীঘ্রং এই মন্ত্রটি স্মরণপূর্বক করিলে ভালো হয়।'

—এই চিঠির প্রথমে 'ভাই সতু তথৈব জ্যোতি' এই সম্বোধন আছে। চিঠিপত্রে এইজাতীয় যুগ্ম-সম্বোধন তাঁর একটি বিশেষ রীতি।

৭৩ 'সুপ্রভাত', ১৩১৭-১৮, পৃ ৫১২

৭৪ 'ভারতী', ১২৮৫, পৃ ১৮৯

৭৫ 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, পৃ ১৮৫

৭৬ 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, পৃ ১১৯

৭৭ তু: 'আমরা যেমনি পড়া শুরু করিতাম অমনি মাথা ঢলিয়া পড়িত। চোখে জলসেক করিয়া, বারান্দায় দৌড় করাইয়া কোন স্থায়ী ফল হইত না। এমন সময় বড়দাদা যদি দৈবাৎ স্কুলঘরের বারান্দা দিয়া যাইবার কালে আমাদের দেখিতে পাইতেন তবে তখনই ছুটি দিয়া দিতেন।'— রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', পৃ ২৪

৭৮ ক্ষিতিমোহন সেন, "মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ", 'প্রবাসী', ১৩৪৬, ফাল্গুন, পৃ ৭৩২

৭৯ দ্র. 'পুরাতন প্রসঙ্গ', পৃ ১৮৩-৮৪

৮০ মূলপত্র শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত।

৮১ "মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ", 'প্রবাসী', ১৩৪৬, ফাল্গুন, পৃ ৬৪৬

৮২ রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত, 'সুপ্রভাত', ভাদ্র, ১৩১৭

৮৩ "আর্যামি এবং সাহেবিআনা", 'প্রবন্ধমালা', পৃ ১২৯

৮৪ রবীন্দ্রনাথ, 'পথে ও পথের প্রান্তে', পৃ ৮০

৮৫ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, 'দ্বিজেন্দ্রনাথ-ঠাকুর : স্মৃতিকথা', পৃ ২২

৮৬ অবনীন্দ্রনাথ, রানী চন্দ, 'ঘরোয়া', পৃ ৫৫

৮৭ স্ত্রীর মৃত্যুর পরে রচিত। "বঙ্গলক্ষ্মী", "কষ্টিপাথর", 'প্রবাসী', ১৩৪৭, বৈশাখ। প্রসঙ্গত, হেমলতা দেবীও লিখেছেন : 'এই গভীর শাস্ত্র-জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত পত্নীবিয়োগে কি নিদারুণ মর্মব্যথা পেয়েছিলেন সেই সময় রচিত দু-একটি গানে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা: গভীর বেদনা অস্থির প্রাণ করহে আমারে শান্তিদান।'

৮৮ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্মৃতিকথা', পৃ ৮২

৮৯ শাস্ত্রীমহাশয়কে লিখিত ১৫-সংখ্যক চিঠি, 'প্রবাসী', ১৩৪০

৯০ হেমলতা দেবী, "শ্বশুর মহাশয়", 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্মৃতিকথা', পরিশিষ্ট, পৃ ১১০

৯১ ২৯শে ফাল্গুন ১৩৪৬ শান্তিনিকেতন মন্দিরে পঠিত।—'প্রবাসী', ১৩৪৭ বৈশাখ, "দ্বিজেন্দ্র জন্ম শত বার্ষিকী" নামে প্রকাশিত।

৯২ *The Calcutta Review*, February, 1926, p 368-69

২৩ অনিলকুমার মিত্র, "সাধক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর", 'শান্তিনিকেতন পত্র', ১৩৩২, ফাল্গুন, পৃ ৩৪

৩. স্বদেশব্রতী ॥

১ এই সাহায্যের পরিমাণ প্রথমে মাসিক আট টাকা ও পরে আশি টাকা— দ্র. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী', পৃ ৩০৬

২ দেবেন্দ্রনাথ, 'আত্মজীবনী', পৃ ৩০৬

৩ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, "Mask বা মুখচ্ছদ", 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', পৃ ২`৪

৪ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে এই স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়: 'আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে স্বদেশের জন্য বেদনার মধ্যে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি।'

৫ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হিন্দুমেলার অন্যতম কর্মী কবি-নাট্যকার মনোমোহন বসুর উক্তি: 'সদ্বিদ্যা বিশারদ নিয়ত-স্বদেশহিতৈষী প্রসিদ্ধ-নামা বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামও হিন্দুমেলা উপলক্ষ্যে সর্বাগ্রে গণনীয়।'—'মধ্যস্থ', ফাল্গুন, ১২৮০

৬ দ্র. "সহজ শোভন এবং কষ্টকল্পিত জাতীয়ভাব", 'প্রবাসী', বৈশাখ, ১৩১৬, পৃ ৩৬

৭ বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, পৃ ২০৬

৮ তদেব

৯ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর -প্রদত্ত এই ভাষণের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ-লিখিত এই স্মৃতিও স্মরণযোগ্য: 'সেখানে··· বিবিধ উপায়ে দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করা হত।' —'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', পৃ ৩৬

১০ মনোমোহন বসু -প্রদত্ত বক্তৃতা: 'হিন্দুমেলার কার্যবিবরণ: ১৭৯০ শক'

১১ সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত চতুর্থ বর্ষের এই ভাষণটি পরে 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' "চতুর্থ বর্ষের কার্যবিবরণ" অংশের ভিতর ছাপা হয়।

১২ রাজনারায়ণ বসু, "ভূমিকা", 'বিবিধ প্রবন্ধ', প্রথম খণ্ড, পৃ ২৮৯

১৩ সত্যেন্দ্রনাথ, 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', পৃ ৩৫

১৪ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', পৃ ১২৭

১৫ রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', পৃ ৭৮

১৬ অমৃতলাল বসু, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ১১৬

১৭ রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভার সভাপতিরূপে, আদি ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষণ, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ১৩১৮, পৃ ১২৫

১৮ দ্র. "সামাজিক রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর", 'সাধনা', চৈত্র, ১২৯৮, পৃ ৪৯২

১৯ তদেব, পৃ ৪৯৩

২০ "মুখ্য এবং গৌণ", 'প্রবন্ধমালা', পৃ ১৫

২১ পাঠ সত্যেন্দ্রনাথের 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থ (পৃ ২৮-২৯) থেকে গৃহীত।

২২ 'প্রবাসী', বৈশাখ, ১৩১৬, পৃ ৬৬

২৩ 'দ্বিজেন্দ্রনাথ : পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, পৃ ২০৫

২৪ "আর্যামি এবং সাহেবিআনা", 'প্রবন্ধমালা', পৃ ১৩২

২৫ স্বর্ণকুমারী দেবী, "পুষ্পাঞ্জলি", 'ভারতী', ১৩৩২, পৃ ৩১৭

২৬/২৭ মূল পত্র দুটি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত।

২৮ আলোচ্য পত্রটিরও মূল শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে। তবে এই চিঠি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৯-এ প্রকাশিত।

২৯ দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "আলোচনা : গান্ধীজী ও শান্তিনিকেতন", 'বেতার জগৎ' আষাঢ়, ১৯৭০, পৃ ৫৬৫

৩০ 'দ্বিজেন্দ্রনাথ : পুরাতন প্রসঙ্গ', দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ২০৭

৩১ পুলিনবিহারী সেন, "গান্ধীজী ও শান্তিনিকেতন", 'বেতার জগৎ', আষাঢ়, ১৯৭০

৩২ রবীন্দ্রনাথ, "সত্যের আহ্বান", 'কালান্তর' : '…মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহু কোটি গরীবের দ্বারে— তাদেরই আপনবেশে

এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস…। এইজন্যে তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে তা তাঁর সত্য নাম।'

অপিচ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ, 'মহাত্মা গান্ধী'

৩৩ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র, (১লা ডিসেম্বর ১৯২০), 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৮, পৃ ১২২

৩৪ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যাত্রী', পৃ ১৫

৩৫ একদিন এই বিষয়টির উল্লেখ করে এণ্ড্রুজ দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র দিনেন্দ্রনাথকে হাসতে হাসতে বলেন, 'I say Dinoo your Grandfather is terrible.' তাছাড়া we had a very interesting talk from your Badodada this evening' এই বলে আরম্ভ করে সেই সন্ধের ঘটনা তিনি বহু পরিচিতজনের কাছে উল্লেখ করে আনন্দ পেয়েছেন।

৩৬ বিধুশেখর শাস্ত্রী, "বিবিধ প্রসঙ্গ", 'প্রবাসী', ১৩৩২, পৃ ৭২১

৩৭ ক্ষিতিমোহন সেন, "মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ", 'প্রবাসী' ১৩৪৬, পৃ ৭২৪

৩৮ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সভাপতির অভিভাষণ", 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ষষ্ঠ ভাগ, বঙ্গাব্দ ১৩০৬, পৃ ১০২

৪ সম্পাদক ॥

১ 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, পৃ ২০৫

২ রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', পৃ ৮৩

৩ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', পৃ ২৫১

৪ 'পুরাতন প্রসঙ্গ', পৃ ২০৫

৫-৭ শরৎকুমারী চৌধুরানী, "ভারতীর ভিটা", 'ভারতী', শ্রাবণ ১৩২৩

৮ "আমার বয়স তখন ঠিক ষোল"—'জীবনস্মৃতি', পৃ ৮৩

৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, "কবির নীড়", 'ভারতী', ১৩২৩

১০ 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, পৃ ২০৫

১১ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ভূমিকা", 'ভারতী', ১২৮৪, পৃ ৩

১২ "ভূমিকা", 'ভারতী', প্রথম সংখ্যা

১৩ "তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক", 'ভারতী', অগ্রহায়ণ, ১২৮৪, পৃ ২১৩

১৪ তদেব, শ্রাবণ, ১২৮৫, পৃ ১৮৯

১৫ দ্র. 'ভারতী', কার্তিক, ১৩০৮, পৃ ১১৩-১৬

১৬ দ্র. 'ভারতী', ভাদ্র, ১৩০৯, পৃ ৪৬৭-৭০

১৭ দ্র. 'ভারতী', শ্রাবণ, ১৩১৬, পৃ ১৭১-৮০

১৮ দ্র. 'ভারতী', ভাদ্র, ১২৮৫, পৃ ২১৪

১৯ তদেব, পৃ ২২৫

২০ দ্র. 'ভারতী', কার্তিক, ১২৯২, পৃ ২০৭, ৩০১, ৪১৮

২১ দ্র. 'ভারতী', অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১২৮৬, পৃ ৩৭৭, ৪১৬

২২ এই বাদানুবাদ ১২৮৬ থেকে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ হতে থাকে।

২৩ শরৎকুমারী চৌধুরানী এ সম্বন্ধে "ভারতীর ভিটা"-য় লিখেছেন: 'ফুলের তোড়ার ফুলগুলি সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে বাঁধা থাকে, তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল— ভারতীর সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, ভারতী ধূলায় মলিন।'

২৪ স্বর্ণকুমারী দেবী, "ভূমিকা", 'ভারতী', ৮ম খণ্ড, ১২৯১

২৫ দৃষ্টান্তস্বরূপ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৯৭ শক, পৃ ১৭১) থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে: 'স্বাধ্যায়ন্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রার্থনা পাঠ করিলেন—"ব্রাহ্মধর্ম আমাদের আপনাদেরই অকৃত্রিম হৃদয়ের কথা এবং অন্তরস্থিত ধর্মের আদেশ শুনিতে বলিতেছেন, ঘুণাক্ষরেও আমাদিগকে পরের কথা শুনিতে বলিতেছেন না। আপনার অন্তরতম জ্ঞানের কথা, অকৃত্রিম হৃদয়ের কথা এবং অন্তরস্থিত ধর্মের আদেশ শুনিয়া চলার নামই স্বাধীনতা— প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া অন্ধকারে পরের কথা শুনিয়া চলার নামই পরাধীনতা।"'

২৬ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর সেনের 'ভূপ্রদক্ষিণ' নামক গ্রন্থের সমালোচনা। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ১৮১৯, পৃ ১২৭-২৯

২৭ "শ্রীমৎ শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ১৮২৪, পৃ ৫৫

২৮ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বাঙ্গলা সাহিত্য (বর্তমান শতাব্দীর)'; ১২৮৭, পৃ ২২-২৩

২৯ "পুস্তক সমালোচনা", 'ভারতী', ভাদ্র, ১২৮৯, পৃ ২৬৩

৩০ 'ভারতী', চৈত্র, ১৮৯৯, পৃ ৫৯৯

৩১ 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্যায়, পৃ ১৬

৩২ কিরণবালা সেন, "স্মরণ : মীরাদেবী", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৭, পৃ ৪৩

৫ দ্বিজেন্দ্রব্যক্তিত্ব ও রবীন্দ্রনাথ ॥

১ দ্র. 'স্বপ্ন-প্রয়াণ', তৃতীয় সর্গ, পৃ ২৩

২ 'আমার পূজনীয় শ্বশুর মহাশয় তাঁর বয়প্রাপ্ত ছেলেদের জমিদারি দেখার কাজে নিযুক্ত করতে ইচ্ছে করেন। প্রথমে বড় ছেলেকেই সেই কাজের ভার দেন। তাঁরই মুখে সেকালের কথা শুনেছি তিনি কিছুতেই জমিদারির কাজে মনঃসংযোগ করতে পারতেন না··· [দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষায়] "কিছুতেই ওদিকে মন দিতে পারলুম না। পিতাকে সন্তুষ্ট করতে, তাঁর আজ্ঞা পালন করতে, সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি পারলুম না।" ' —জ্ঞানদা দেবী, "পুষ্পাঞ্জলি", 'ভারতী', মাঘ ১৩৩২, পৃ ৩৩০

৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জমিদারী পঞ্চায়েৎ সভা", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৯, পৃ ৪৮

৪ রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', পৃ ৬৮

৫ 'আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মূলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপর একদিন "মেঘদূত" আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না— তাহার আনন্দ আবেগপূর্ণ ছন্দোচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।'—'জীবনস্মৃতি', পৃ ৪১

৬ 'মা মনে করিলেন আমার দ্বারা অসাধ্য সাধন হইয়াছে; তাই আর সকলকে বিস্মিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তিনি কহিলেন, "একবার দ্বিজেন্দ্রকে শোনা দেখি"। তখন মনে মনে সমূহ বিপদ গণিয়া প্রচুর আপত্তি

করিলাম। মা কোনোমতেই শুনিলেন না। বড়দাদাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বড়দাদা আসিতেই কহিলেন, "রবি কেমন বাল্মীকির রামায়ণ পড়িতে শিখিয়াছে একবার শোন না।" পড়িতেই হইল। বড়দাদা বোধহয় কোনো একটা রচনায় নিযুক্ত ছিলেন, বাংলা ব্যাখ্যা শুনিবার তিনি কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। গুটিকয়েক শ্লোক শুনিয়াই "বেশ হইয়াছে" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।' —রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', পৃ ৫৯

৭ সৈয়দ মুজতবা আলী, 'বড়বাবু', পৃ ১৫৭

৮ প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র লক্ষীশ্বর সিংহকে বলতে শোনা গিয়েছে 'গুরুদেব যখনই নীচু বাংলায় যেতেন তিনি তখনই বড়দাদাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁকে "রবি" বলে জড়িয়ে ধরতেন।

৯ রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', পৃ ৬৮

১০ "জীবনস্মৃতির খসড়া", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', কার্তিক-পৌষ ১৩৫০, পৃ ১০৮। ঐ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন: 'তথাপি আমার লেখায় তাহার নকল ওঠে নাই।'

১১ পুলিনবিহারী সেন, "বাল্মীকি প্রতিভা", 'রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী', পৃ ১৫

১২ দ্র. "বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য", 'ভারতী', ভাদ্র, ১২৮৫

১৩ মতান্তরে চলত গুণেন্দ্রনাথের ৫ নম্বর বাড়িতে; ৬ নম্বর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ থাকতেন।

১৪ রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', পৃ ৮৩

১৫ দ্র. 'ভারতী', পৌষ, ১২৮৬, পৃ ৩৯৯

১৬ পুলিনবিহারী সেন, 'রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী', পৃ ৪৬-৪৭

১৭ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা; ৫ম ভাগ, ২য় সংখ্যা।

১৮ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'।

১৯ "উপসর্গ সমালোচনা", 'ভারতী', বৈশাখ ১৩০৬

২০ রবীন্দ্রনাথ, 'ছেলেবেলা'

২১ 'স্বপ্ন প্রয়াণ', দ্বিতীয় স্বর্গ, স্তবক ১১৯

২২ অশোকবিজয় রাহা, "কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ', 'তত্ত্বকৌমুদী', মাঘ ১৩৭৩, পৃ ৭২

২৩ "রসাতল-প্রয়াণ", 'স্বপ্ন-প্রয়াণ', ৫ম সর্গ, পৃ ৭৯

২৪ 'প্রাস্তিক' ১০

২৫ দ্বিজেন্দ্রনাথ, 'প্রবন্ধমালা', পৃ ৪০

২৬ পুলিনবিহারী সেন, 'রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী', পৃ ২৫৯

২৭ 'কাব্যমালা', পৃ ১

২৮ 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্রসংখ্যা ১৯৭, পৃ ৩২০

২৯ তদেব, পত্রসংখ্যা ৮৩

৩০ অবনীন্দ্রনাথ রায়, "দ্বিজেন্দ্রনাথ", 'ভারতী', চৈত্র, ১৩৩২

৩১ 'ভারতী', চৈত্র, ১২৮৬, পৃ ৫৪৩-৪৫

৩২ "জলস্থল", 'পথের সঞ্চয়', রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৪৮২

৩৩ "প্রকৃত বৈরাগ্য ও নিষ্কাম কর্ম", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ১৮১৪ শক, পৃ ৪৩

৩৪ এই শতকের প্রথম দশকের পর অনুজ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথের আগ্রহ তাঁর স্রষ্টা স্বভাব নিয়ে ততটা নয় যতটা তাঁর কর্মযোগ নিয়ে। এই প্রসঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ স্মৃতিকথা থেকে কিছুটা অংশ উদ্‌ধৃত করা যায়: 'অতিথিশালার দোতলার মাঝের ঘরটিতে বসিয়ে "ডাকঘর" পড়া হইল। পাঠ সাঙ্গ হওয়ার পর শ্রোতার দল একেবারে নীরব হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কাহারও মুখ দিয়া একটি কথা বাহির হইল না।

এই সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খুব দ্রুত-গতিতে আসিলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া ও তাহার উত্তর লইয়া, তেমনি দ্রুত গতিতে চলিয়া গেলেন।' —সীতা দেবী, 'পুণ্যস্মৃতি', পৃ ৩৯

লক্ষ করা যাচ্ছে এ ক্ষেত্রে 'ডাকঘর' রচনা বা পাঠের অভিজ্ঞতা তাঁর ঘটে নি, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর জিজ্ঞাসা এবং এষণার চাহিদা তখন সামাজিক, দার্শনিক অথবা অন্য কোনো কর্তব্য সংক্রান্ত। ফলত রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ সংকুচিত হয়ে, সেই সময় রবীন্দ্রব্যক্তিত্বেই নিবদ্ধ হয়েছিল, এ কথা বললে অসংগত হবে না।

৬ কবি ॥

১ বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, পৃ ১৯২

২ তদেব, পৃ ১৯৩

৩ ভবতোষ দত্ত এ বিষয়ে তাঁর 'কাব্যবাণী' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৪ কানাই সামন্ত, "আলোচনা", 'স্বপ্ন-প্রয়াণ', পৃ ১৭১

৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথও 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-এর একটি অনুবাদ করেন।

৬ 'স্বপ্ন-প্রয়াণ', ৩য় সর্গ, ২৭

৭ দ্র. 'ভারতী', ভাদ্র, ১২৮৫

৮ তদেব

৯ ভবতোষ দত্ত, "কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ", 'কাব্যবাণী'

১০ মোহিতলাল মজুমদার, 'বাংলা কবিতার ছন্দ', পৃ ১৬৯-৭০

১১ বুদ্ধদেব বসু, "ভূমিকা", 'মেঘদূত'

১২ বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত চিঠি (১৪.১১.৭৩), অপ্রকাশিত। বন্ধনীধৃত অংশটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে উক্ত।

১৩ রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত চিঠির অংশ।

১৪ সত্যেন্দ্রনাথ, 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', পৃ ২৭

১৫ রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭, পৃ ৩০৮

১৬ চতুর্থ সর্গের প্রথম স্তবকের প্রথম তিন পঙ্‌ক্তি

১৭ দ্বিতীয় সর্গ, স্তবক ১১৯

১৮ দ্র. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, *Lyric in Indian Poetry*, p. 51

১৯ দ্র. শঙ্খ ঘোষ, 'ছন্দের বারান্দা', পৃ ৩৩। তাঁর মতে 'আধুনিক কবিতার পরিচয় বাক্‌ছন্দে'

২০ 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা', পৌষ, ১৩৩০

২১ দ্বিজেন্দ্রনাথ কর্তৃক নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠির অংশ।

২২ 'ভারতী, বৈশাখ, ১৩২১, পৃ ১০৭

৭ অনুবাদক ॥

১ প্রমথনাথ বিশী, 'স্বপ্ন-প্রয়াণ', তৃতীয় নবতম সংস্করণ —পুনর্মুদ্রণ, ১৯৬৪-৬৫ : পরিশিষ্ট, পৃ ১৭৯

২ প্রবোধচন্দ্র সেন, ভূমিকা, যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার, 'মেঘদূত', পৃ ৭

৩ 'নবরত্নমালা' গ্রন্থে 'মেঘদূতে'র এই ভূমিকাটি পাওয়া যায় : "'মেঘদূত' গ্রন্থখানি যদিও স্বল্পায়তন, তথাপি উহা কালিদাসের এক প্রধান রচনা বলিয়া সর্বত্র গণ্য হইয়া থাকে ; আশ্চর্য এই যে কাব্যরূপ অট্টালিকাটি শূন্যের উপর নির্মিত হইয়াছে বলিলেও বলা যায়, উহার শুষ্ক কেবল গল্পটির প্রতি দৃষ্টি করিলে অধিকাংশ লোকই হাস্য করিবেন যথার্থ, কিন্তু উহার সর্বাঙ্গসুন্দর রচনাটি অবলোকন করিলে মনে করিবেন যে, উহার ন্যায় বিস্ময়কর কাব্য-রচনা আর জগতে নাই ; এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই যে, যদ্যপি আমার এই যৎসামান্য অনুবাদ পাঠ করিয়া কাহারো মন কালিদাসের মূলগ্রন্থ অবলোকনে উৎসুক হয় ; তাহা হইলেই আমি আপাতত কৃতকার্য হই।"

৪ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', পৃ ২২

৫ তদেব

৬ সত্যেন্দ্রনাথ, "ভূমিকা", 'নবরত্নমালা বা শাস্ত্রীয় প্রবচন, কাব্য ও বিবিধ কবিতা'।

৭ ভবতোষ দত্ত, "দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর", 'কাব্যবাণী', পৃ ১২৭

৮ প্রসঙ্গত রাজনারায়ণ বসুকে ১৪ জুলাই ১৮৬০-এ লিখিত মধুসূদনের একটি পত্র থেকে এই অংশ স্মর্তব্য :

I do not know your friend Debendranath personally. I hear one of his sons is a good poet. He is the author of a very readable translation of my favourite *Meghduta*.

৯ বুদ্ধদেব বসু, 'কালিদাসের মেঘদূত', পৃ ৬৬-৬৮

১০ রবীন্দ্রনাথ, 'রূপান্তর', পৃ ৬৭

রবীন্দ্রনাথ-কৃত অন্যান্য অনুবাদ দুটিও এই গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্র-অনূদিত 'কুমারসম্ভব' দ্বিজেন্দ্রনাথের সংশোধনে নবরূপ পরিগ্রহ করেছিল। দ্রষ্টব্য পাণ্ডুলিপির প্রতিচিত্রণ।

১১ রবীন্দ্রনাথ, 'ছন্দ', সম্পাদনা : প্রবোধচন্দ্র সেন, পৃ ১৮৯-৯০

১২ 'মেঘদূত', 'ধ্রুপদী' সংস্করণ, পৃ ২৮

১৩ তদেব, পূর্বমেঘ, পৃ ৬

১৪ তদেব, উত্তরমেঘ, পৃ ২২

১৫ 'রৈবতক', পঞ্চতম সর্গ, পৃ ৩২

১৬ 'রৈবতক', ষষ্ঠ সর্গ, পৃ ৩৭

১৭ 'কুরুক্ষেত্র', প্রথম সর্গ, পৃ ৪

১৮ রাজশেখর বসু, "ভূমিকা", 'মেঘদূত'

১৯ Goethe's Samtliche Werke, 37 p 212 : অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, *Goethe and Tagore*, p 28

২০ শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত -সম্পাদিত, "ভূমিকা", 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত'।

২১ রবীন্দ্রনাথ-লিখিত একটি পত্র, 'পরিচয়', কার্তিক, ১৯৩৮

২২ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', আষাঢ়, ১৭৮১, পৃ ৭২

২৩ সত্যেন্দ্রনাথ, "ভূমিকা", 'নবরত্নমালা বা শাস্ত্রীয় প্রবচন, কাব্য ও বিবিধ কবিতা'।

২৪ তদেব

২৫ 'নবরত্নমালা'য় প্রকাশিত এই শ্লোকের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির আর-একটি ভিন্ন পাঠ পাওয়া যাচ্ছে—

ভয় করি একই শাখী সুন্দর দুটি পাখী
দোঁহে দোঁহের সখা, কি ভাব আহা!
সুখে হয় চল চল একটি খায় ফল
আর একটি কেবল নিরখে তাহা।

২৬ 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা', পৌষ, ১৩৩২

২৭ 'প্রবাসী', মাঘ, ১৩২৬, পৃ ৩৩৩

২৮ 'প্রবাসী', ফাল্গুন, ১৩৩২, পৃ ৫৮৫

২৯ "পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম", 'নবরত্নমালা বা শাস্ত্রীয় প্রবচন, কাব্য ও বিবিধ কবিতা', ১ম খণ্ড, পৃ ১০৩

৩০ তদেব, পৃ ১১১

৩১ তদেব, পৃ ১২৭

৩২।৩৩ তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ ১২৮

৩৪ তদেব, পৃ ১৩৭

৩৫ তদেব, পৃ ৮১

৩৬ *Henry Vivian Derozio : A Memorial Volume*, Edited by Mary Ann Dasgupta, p. 30

কোনো কোনো স্থানে ত্রয়োদশ পঙ্‌ক্তির guerdon শব্দটির reward পাঠও পাওয়া যায়।

৩৭ ইয়ং বেঙ্গলের দীক্ষাগুরু ডিরোজিও র‍্যাশনালিজম ও এমপিরিসিজমকে জীবনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে গ্রহণ করতে শিখিয়েছিলেন।··· সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় যুক্তি ও অভিজ্ঞতাকে হাতিয়ার করেছেন, প্রাচীন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সামাজিক কুসংস্কার-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার সনাতন পথকে গ্রহণ করেন নি।

—অমর দত্ত, 'ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ন্‌স্‌', পৃ ৮৬

৩৮ 'নানাচিন্তা', পৃ ১৪৭, উৎস : শেক্সপীয়রের King John (Act IV Scene II) নাটক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ 'কোন মূঢ় চিত্রকরে পদ্মদেহ চিত্র করে' ইত্যাদি কয়েকটি লাইন ও মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে 'মিত্রাক্ষর' কবিতায় কয়েকটি এই অংশেরই ভাবানুবাদ।

৩৯ 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা', শ্রাবণ, ১৩৩২। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য রবীন্দ্রনাথ-কৃত এই অংশের অনুবাদ : 'ওষ্ঠ ও পাত্রের মধ্যে ব্যাঘাত' : দ্র. চিঠিপত্র ৮

৪০ 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৮, পৃ ১২৪

৪১ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্মৃতিকথা', পৃ ৩৫-৩৬

৪২ "বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পুরোধার···নিম্নোক্ত বক্তব্য :

"বিদ্যুৎতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সকল বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দ সাধারণের নিকট সুপরিচিত, সেগুলির কিম্ভূতকিমাকার বাংলা পরিভাষা গড়িয়া পুস্তকে ব্যবহার করি নাই। জর্মন পণ্ডিতেরা যে পরিভাষার গঠন করিয়াছেন, ইংরেজ বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অসংকোচে ব্যবহার করেন, আবার ইংরেজেরা যে-সকল

পরিভাষা রচনা করিয়াছেন, সেগুলিকে ফরাসি, জাপানি বা রুশ বৈজ্ঞানিকেরা ব্যবহার করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। পৃথিবীর সর্বত্রই ইহা দেখা যাইতেছে। সুতরাং বিশেষ বিশেষ বিদেশী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আমরা কেন আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকে ব্যবহার করিব না, তাহার কোনো হেতু পাওয়া যায় না। সংস্কৃতভাষামূলক কটোমটো দেশী পরিভাষা বৈদেশিক পরিভাষার চেয়ে দুর্বোধ্য বলে মনে করি।'

এই আধুনিক বোধ অক্ষুণ্ণ ছিল বলে তাঁর ভাষায় টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রবার, প্যারাফিন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ইউরেনিয়ম প্রভৃতি শব্দ ক্লিষ্ট তর্জমায় কণ্টকিত হয় নি। পক্ষান্তরে, আবেশবেষ্টনী—induction coil; আত্ম-আবেশ—self induction; বৈদ্যুতিক আন্দোলন—electric oscillation; মাত্রা—unit; ন্যুব্জ—concave প্রভৃতি শব্দ তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল শ্রুতিসৌকর্যের গরজে। শব্দ সম্পর্কে অণুসূক্ষ্ম ধারণা ছিল বলেই X-rayকে বাংলায় তিনি এক্স-রে হিসেবেই অব্যাহত রেখেছেন; যদিও cathode ray হয়ে উঠেছে ঋণরশ্মি।...বা Rattle সাপ—ঝুমঝুমি সাপ।"—অশোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, "স্মরণ", 'জগদানন্দ রায়', পৃ ৪৪-৪৫

৪৩ রবীন্দ্রনাথ, "প্রতিশব্দ", দ্র. 'শব্দতত্ত্ব', রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, (বিশ্বভারতী), এ বিষয়ে প্রস্তূয়মান 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের পরিবর্ধিত সংস্করণে যাবতীয় তথ্য সমাহারের চেষ্টা চলেছে।

৪৪ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র। এঁকে লেখা অন্য চিঠিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেকে কখনো 'বৃদ্ধ জটায়ু' কখনো 'phoenix ওর্ফে জটায়ু' কখনো বা 'মৃতামৃত ব্যঙ্গমা ওর্ফে অর্দ্ধমৃত জটায়ু' বলে উল্লেখ করেছেন।

৪৫ অধোরেখা সংযোজিত হল।

৪৬ 'নানাচিন্তা', পৃ ২০০

৪৭ 'নানাচিন্তা', পৃ ২০১

অধোরেখ শব্দগুলিই বাংলা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক আলোচনায় গৃহীত হয়েছে। যদিও 'কেন্দ্রনুগা ও কেন্দ্রতিগা' দুটি শব্দের অন্ত্যবর্তী আকার, রবীন্দ্রনাথ বর্জন করে 'কেন্দ্রানুগ' ও 'কেন্দ্রাতিগ' রূপ দিয়াছেন।

৪৮ 'নানাচিন্তা', পৃ ১৯৪

৮ গদ্যশিল্পী ॥

১ "মুখ্য এবং গৌণ", 'প্রবন্ধমালা', পৃ ২৮

২ "আর্যামি এবং সাহেবিআনা", 'প্রবন্ধমালা', পৃ ১৪৮

৩ "সোনায় সোহাগা", 'প্রবন্ধমালা', পৃ ৭৯

৪ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সূচনা", 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্মৃতিকথা' (সুধাকান্ত রায়চৌধুরী), পৃ ২১

৫ "সভাপতির অভিভাষণ", 'নানাচিন্তা', পৃ ১৭৯

৬ 'গীতাপাঠ', পৃ ১১৩

৭ 'প্রবন্ধমালা', পৃ ১২০

৮ "সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা", 'প্রবন্ধমালা', পৃ ১৫১

৯ "তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক", 'ভারতী', অগ্রহায়ণ ১২৮৪, পৃ ২১৩

১০ 'গীতাপাঠ', তৃতীয় অধিবেশন, পৃ ২৩

১১ 'গীতাপাঠ', পৃ ১৬৯-৭০

১২ সৈয়দ মুজতবা আলী, 'বড়বাবু', পৃ ৮

১৩ "সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা", 'প্রবন্ধমালা', পৃ ১৮০

১৪ তদেব, পৃ ১৮১

১৫ "আর্যামি এবং সাহেবিআনা", 'প্রবন্ধমালা', পৃ ১৩৫

১৬ "বিদ্যা ও জ্ঞান", 'নানাচিন্তা', পৃ ৮০

১৭ "সোনার কাটি রূপার কাটি", 'প্রবন্ধমালা', পৃ ৪০

১৮ 'গীতাপাঠ', পৃ ৪৩

১৯ ইংরেজির ব্যবহার : 'সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে Gentleman এর certificate প্রদান করিলে…'—'প্রবন্ধমালা', পৃ ১০৬

'বাংলা সমাজে গৃহবিচ্ছেদের cyclone ডাকিয়া আনা হয়'—তদেব, পৃ ১৮১

'Cold water throw করার মানসে'—তদেব, পৃ ৬৪

'পাশ্চাত্য শাস্ত্রে বলে Conscience is the voice of God অন্তরাত্মার বাণী ঈশ্বরেরই বাণী'—'গীতাপাঠ', পৃ ১০৪

'তখন তাঁহার সেই কথাটি theory of Gravitation বলিয়া পণ্ডিত মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।…'

'দৃষ্টান্তগুলো কাঁচা সামগ্রী raw materials'—'নানাচিন্তা', পৃ ২০২

২০ 'গীতাপাঠ' পৃ ১২৫

২১ 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃ ১৭৬

২২ মূলপত্র, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত। পত্রটি 'সুপ্রভাত', ১৩১৭ আশ্বিন-এ মুদ্রিত হয়।

২৩ এলাহাবাদ থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র— ৭টি স্তবকের ২টি এখানে উদ্ধৃত হল।

২৪ রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত। 'সুপ্রভাত', জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮

২৫ শান্তিনিকেতন থেকে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

২৬ শান্তিনিকেতন, ১লা জুলাই, ১৯১৮

২৭ এই পৃষ্ঠার তিনটি চিঠিই রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

২৮ প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', পৃ ৯৮

৯ সৌন্দর্যভাবনা ॥

১ Theophile Gautier-এর ব্যবহৃত মূল কথাটি হল L'art pour l'art যার পেটার-কৃত পরিভাষা art for art's sake।

প্রিয়নাথ সেনের প্রতিশব্দ, 'ললিত কলার জন্যই সৌন্দর্য'। সুধীন্দ্রনাথ দত্তর তর্জমা 'কলাকৈবল্যবাদ'।

২ Herder. *Ursachen des gesunkner Geschmacks bei den verschiedener volkern, da er geblieht*, 1775, p. 78; অনুবাদ: অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দ্র. *Goethe and Tagore*, p 8

৩ ১৮৯৫, তাঁর কারাদণ্ডের পরে রচিত।

৪ মূল রচনা: ১৮৯৬; অনুবাদ Aylmer Maude (১৮৯৮)

৫ দ্র. Geddes MacGregor, *Aesthetic Experience in Religion*, p. 37-38

৬ প্রমথনাথ বিশী, "আলোচনা", 'স্বপ্ন-প্রয়াণ', পরিশিষ্ট, পৃ ১৮৯

৭ তু. 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্রসংখ্যা ১১৭, পৃ ২৫১-৫২

৮ 'স্বপ্ন-প্রয়াণ', ৩/৭৮। তু. A landscape is a state of mind (আমিয়েল) ও একাধারে রোমান্টিক ও মিস্টিক রবীন্দ্রসংগীত— 'পুষ্প বনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে'।

৯ 'স্বপ্ন-প্রয়াণ', ৭/১২২

১০ Andrews, "Baradada", *Visva-Bharati News*, 1971

১১ দ্র. Geddes MacGregor, *Aesthetic Experience in Religion*, p. 32-33

১২ 'কঠোপনিষদ', ২/১-২

১৩ 'স্বপ্ন-প্রয়াণ', ৭/১৭-১৮। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য 'প্রেয়সী' পত্রিকার প্রকাশকালে তার নামকরণ পর্বে দ্বিজেন্দ্রনাথের ভূমিকা।

১৪ তু. 'আর্ট' মাত্রেরই ভিতর খানিকটা সমাজনাশকতা আছে— সেই জন্য ভালো গান কিংবা কবিতা শুনলে আমাদের মধ্যে একটা চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে, সমাজের লৌকিকতার বন্ধন ছেদন করে নিত্য সৌন্দর্যের স্বাধীনতার জন্যে মনের ভিতর একট নিষ্ফল সংগ্রামের সৃষ্টি হতে থাকে— সৌন্দর্যমাত্রেই আমাদের মনে অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে অকারণ বেদনার সৃষ্টি করে'— রবীন্দ্রনাথ, 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্রসংখ্যা ২১১

১৫ তদেব, পত্রসংখ্যা ১৯৭

১৬ "সৌন্দর্য" : খেয়ালখাতা, 'ভারতী', বৈশাখ, ১৩১২, পৃ ৮৭

১৭ "বিদ্যা এবং জ্ঞান", 'নানাচিন্তা', পৃ ৬৫

১৮ প্রফুল্ল দাশগুপ্ত, "নন্দন তত্ত্ব ও মার্কসীয় পদ্ধতি", 'স্বাধীনতা', শারদীয় সংখ্যা ১৩৬৫, পৃ ৪০

১৯ তু. রবীন্দ্রনাথ : 'সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না'।

২০ বইটি ১৮৫৪তে প্রকাশিত।

২১ 'সত্য সুন্দর মঙ্গল', অনুবাদ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ৯২

২২ দ্র. এস. কে. নন্দী, "Aesthetics of Abanindranath Tagore, Indian Aesthetics and Art Activity", I. I. of A. S.. Simla, 1968, পৃ ১৪৪

২৩ 'প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি', পৃ ২৬৩

১০. দার্শনিক ও ধর্মীয় ভাবুক ॥

১ 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭, পৃ ৩৭৬

২ শশিমোহন বসাক, "হেগেলের পরমার্থবাদ", 'বান্ধব', আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১২, পৃ ২৪২

৩ এই সূত্রে স্মর্তব্য তাঁর 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্য প্রসঙ্গে উক্তি : 'সেই সময়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মশগুল ছিলুম তাই অস্য উহাতে metaphysics ঢুকিয়াছে।'—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ৬ পৃ ১২

৪ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অবশ্য তাঁর *New Essays in Criticism* (1905) বইতে হেগেলীয় ও রাবীন্দ্রিক চিন্তাধারার মধ্যে মূর্ত একটি সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। কিন্তু দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে দ্বিজেন্দ্রনাথ হেগেলকে বর্জন করে বলেছিলেন : 'As for Hegel, the very mention of Hegel's name would rouse Borodada's irony.'—"Borodada", *Visva-Bharati News*. Feb-March, 1971, p. 184.

৫ স্মর্তব্য : Kant was to Borodada unrivalled and unparallaled in the West. He could not, it is true, ever dream of coming nearer to Upanishads. They were the greatest of all. Borodada knew them by heart and lived them all day long. But Kant was the only western philosopher that counted··· He would turn to me with supreme satisfaction and say 'after all there's nothing that can ever touch the Upanishads. They are quite unsurpassable,' this word 'unsurpassable' gave him supreme pleasure to repeat.—পূর্বোক্ত ৪ সংখ্যক পাদটীকার প্রবন্ধ, p. 185

৬ রবীন্দ্রনাথ, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ', পৃ ৯৫

৭ 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা', মাঘ ১৩৪৭, পৃ ৪৩২

৮ 'তত্ত্ববিদ্যা', পৃ ১৫৭

৯ "কাণ্টের দর্শন ও বেদান্ত দর্শন", 'ভারতী', অগ্রহায়ণ, ১২৯৫, পৃ ৪৯০-৯১

১০ তদেব, পৃ ৩৯১

১১ 'প্রবাসী', মাঘ, ১৩২৪, পৃ ৫৮০-৮৮

১২ 'প্রবাসী', ফাল্গুন, ১৩২৪, পৃ ৪২৭ :০

১৩ 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩২৫, পৃ ১৪৬-৫২

১৪ 'প্রবাসী', পৌষ, ১৩২৫, পৃ ১৯৩-৯৯

১৫ 'প্রবাসী', ফাল্গুন, ১৩২৫, পৃ ৪৪৭-৫৩

১৬ 'প্রবাসী' চৈত্র, ১৩২৫, পৃ ৫২১-২৭

১৭ 'প্রবাসী', বৈশাখ, ১৩২৬, পৃ ৬৫-৭৪

১৮ 'প্রবাসী', আষাঢ়, ১৩২৬, পৃ ২৬৬-৭২

১৯ 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩২৬, পৃ ৩০৯-১৬

২০ 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩২৬, পৃ ৪৭১-৭৮

২১ 'প্রবাসী', কার্তিক, ১৩২৬, পৃ ৬০০-৬২

২২ 'প্রবাসী', পৌষ, ১৩২৬, পৃ ২০১-১১

২৩ 'অদ্বৈতমতের সমালোচনা', পৃ ১ ; চৈতন্য লাইব্রেরিতে ১৮১৮ শকে পঠিত।

২৪ "পজিটিবিজম ও আধ্যাত্মিক ধর্ম", 'ভারতী', ১২৯২ বঙ্গাব্দ, পৃ ৩০১

২৫ 'ভারতী', বৈশাখ, ১৩২৭, পৃ২৩

২৬ তদেব, পৃ ২৫

২৭ তুলনীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'অক্ষয়বাবুকে···নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম, এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম ; কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর, তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ ;— আকাশ পাতাল প্রভেদ!'— দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী', পৃ ৩৬-৩৭

২৮ Lizelle Raymond, *The Dedicated*, p. 117

২৯ কালিদাস ভট্টাচার্য, "দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ", 'তত্ত্বকৌমুদী', মাঘ, ১৩৭৩, পৃ ৬৩

৩০ তদেব। এই উদ্ধৃতিটির সাহায্যে অধ্যাপক ভট্টাচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথের ঈপ্সিত সমন্বয়বাদের ব্যাখ্যা করেছেন।

৩১ "পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র", 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব', ১২৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ ৫৩

৩২ শ্রীঅরবিন্দ, 'গীতার ভূমিকা', পৃ ১৫-২২

৩৩ 'গীতাপাঠ', পৃ ১, ৫-৬

৩৪ বালগঙ্গাধর তিলক, 'শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতারহস্য অথবা কর্মযোগ শাস্ত্র', অনুবাদ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ২২৯

৩৫ চিঠিটির শুরু এইরকম : 'তিনখানি "কৃষ্ণচরিত্র" পাঠাইলাম। অনুগ্রহ-পূর্বক আপনি…গ্রহণ করিবেন।' (১০ অগাস্ট, বর্ষক্রম অনুল্লিখিত), 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', শ্রাবণ, ১৩৪৯, পৃ ২৮

৩৬ দ্র. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা', 'বঙ্কিম-রচনাবলী', পৃ ৭৩৭

৩৭ বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', পৃ ১৯৪

৩৮ Talcot Persons, *The Social System*, পৃ ৩৫০

৩৯ "পজিটিবিজম এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম", 'ভারতী' কার্তিক, ১২৯২, পৃ ৩০১

৪০ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের "পজিটিবিজম কাহাকে বলে ?" এই নিবন্ধের ('ভারতী', শ্রাবণ, আশ্বিন, ১২৯২, পৃ ১৫৯, ২৯২) উত্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথের রচিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ ৩০৭

৪১ 'গীতাপাঠ', ৩য় অধিবেশন

৪২ "ভূমিকা", 'গীতাপাঠ', পৃ ১৩

৪৩ 'গীতাপাঠ', পৃ ২৯

৪৪ শ্রীঅরবিন্দ, 'গীতার ভূমিকা', পৃ ৭৭, ৮০

৪৫ তদেব, পৃ ৮৪

৪৬ 'গীতাপাঠ', পৃ ৩১

৪৭ তু. রবীন্দ্রনাথ, 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্রসংখ্যা ২৩৮

৪৮ "আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাত", 'নানাচিন্তা', পৃ ১১৯। অধোরেখ অংশটি দ্বিজেন্দ্রনাথের চিহ্নিত।

৪৯ আদি ব্রাহ্মসমাজে "শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর" -কর্তৃক বিবৃত, ১৭৩৭ শক, পৃ ১৯। তু. রবীন্দ্রনাথের উক্তি, চিঠিপত্র ৯, পৃ ১৮১

৫০ বসন্ত, সুরফাঁক্তা। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৩/৮১

৫১ তু. "My relegious life has followed the same mysterious line of grcwth as had my poetical life"— রবীন্দ্রনাথ, *The Religion of an Artist*, p. 10

পরিশিষ্ট

১

বংশলতিকা

পঞ্চানন ঠাকুর

|

জয়রাম (?-১৭৫৬)

|

নীলমণি (?-১৭৯১)

|

রামমণি (১৭৫৯-১৮৩৩)

|

দ্বারকানাথ

দিগম্বরী দেবী (১৭৯৪-১৮৪৬)

|

দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫)

সারদা দেবী (১৮২৬-৭৫)

|

দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬)

সর্বসুন্দরী দেবী

পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

দ্বিজেন্দ্রনাথ

- দ্বিপেন্দ্রনাথ
  - দিনেন্দ্রনাথ
  - নলিনী
- অরুণেন্দ্র
  - অজীন্দ্র
  - ললিতা
  - সাগরিকা
  - কণিকা
- নীতীন্দ্র
- সুধীন্দ্র
  - সৌম্যেন্দ্র
  - স্বরীন্দ্র
  - রমা
  - এণা
  - চিত্রা
- সরোজা
- ঊষাবতী
- কৃতীন্দ্র

২

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবন ও কৃতিক্রম

জন্ম	:	১১ মার্চ ১৮৪০
বিবাহ	:	৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮
মেঘদূত	:	১৮৬০
(প্রথম প্রকাশিত রচনা)		
প্রথম পুত্রের জন্ম	:	১৮৬২
সম্পাদক, আদি ব্রাহ্মসমাজ	:	১৮৬৪-৭১
স্বদেশী মেলার প্রথম অনুষ্ঠান	:	১২ এপ্রিল ১৮৬৭
সম্পাদক, হিন্দুমেলা	:	১৮৭০-১৮৭৩
'স্বপ্ন-প্রয়াণ'	:	১৮৭৩
বিদ্বজ্জন সমাগম	:	১৮৭৪
সহ সভাপতি ন্যাশনাল সোসাইটি	:	১৮৭৪
'ভারতী'র প্রথম সংখ্যা	:	জুলাই ১৮৭৭
ট্রাস্টি, আদি ব্রাহ্মসমাজ	:	১৮৮১
'হিতবাদী'র প্রবর্তন	:	১৮৮১
অন্যতম সহকারী সভাপতি সারস্বত সমাজ	:	১৮৮২
সহকারী সভাপতি, বেঙ্গল থিওসফিকাল সোসাইটি	:	১৮৮২
সম্পাদক, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'	:	১৮৮৪-১৯০৯
আচার্য, আদি ব্রাহ্মসমাজ	:	১৮৯০
বিশিষ্ট সভ্য, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ	:	১৮৯৪
'স্বপ্ন-প্রয়াণ' (দ্বিতীয় সংস্করণ)	:	১৮৯৬

সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ	:	১৮৯৭-১৯০০
সভাপতি, আদি ব্রাহ্মসমাজ	:	১৮৯৯
আচার্য ও সভাপতি, আদি ব্রাহ্মসমাজ	:	১৯০৮
মূল সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন	:	১৯১৩
'স্বপ্ন-প্রয়াণ' (নবতম সংস্করণ)	:	১৯১৪
মৃত্যু	:	১৯ জানুয়ারি ১৯২৬

৩

'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্যের পাঠান্তরের নিদর্শন

পূর্বভাষ

ভাষাশিল্পী দ্বিজেন্দ্রনাথ 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্যের সংস্করণ থেকে সংস্করণে উল্লেখ্য পরিমার্জনা ও সংশোধন ঘটিয়েছেন। "An artist is known by what he rejects"— উক্তিটির প্রাসঙ্গিকতা আমরা এ ক্ষেত্রে অনুভব করি। তিনি সংশোধন সূত্রে শ্লথ কথন ঝরিয়ে দিয়েছেন, পুনরুক্তির প্রলোভন জয় করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় তাঁর সমীপ্যকালীন দুই কবি: মাইকেল মধুসূদন এবং অক্ষয়কুমার। তাঁরা উভয়েই নানা বিকল্প রূপভেদের মধ্য দিয়ে, ক্রমশ একটি সুমার্জিত শব্দশিল্পের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ-কৃত পরিবর্তন ও পাঠভেদের দিকে লক্ষ রাখলে একটি কথা মনে হয় যে, তিনি শব্দ-সংহতির দিকে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তাই তাঁর হাতে "বাসনার নদী" হয়ে ওঠে "বাসনা-জলধি", "দিগন্তের বুকে" রূপান্তরিত হয় "চাঁদের ময়ুখে।" তাই কখনো-বা প্রথম সংস্করণের দুটি স্তবক সংকুচিত হয়ে একটি স্তবকের ঘনীভবন লাভ করে (২/১৩)। 'অমনি আইল তথা' ধ্বনিময়তা অর্জন করে হয়ে ওঠে 'আইল মুহূর্ত মাঝে' (২/১৫)। স্বরসম্মিতির চাহিদায় 'কুহরিছে দেখ পিক রসাল-শাখিতে' হয়ে ওঠে 'কোথা হৈতে কোকিল লাগিল কুহরিতে' (২/১০৪)। মনে হয়, ভাবাবেগকে শব্দের অন্তর্লীন শক্তিতে পরিণত করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। তাই সমাসবদ্ধ শব্দচয়ন এবং অন্ত্যমিল ও অন্তর্মিলের নবোন্মেষশালিনী এষণায় তিনি ক্রমশই যেন যত্নবান হয়ে উঠেছিলেন। এর পাশাপাশি আর-একটি প্রবর্তনাও লক্ষ করা যায়। কখনো কখনো তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে সাধিত পরিবর্তনগুলিকে প্রত্যাহার করে নিয়ে তৃতীয় তথা পরিণামী সংস্করণে মৌল সংস্করণের পাঠে ফিরে গিয়াছেন। এই কাব্যের প্রথম দুটি সর্গের পাঠভেদ নিরূপণ করলেই তাঁর এই প্রবর্তনাগুলি অনুধাবন করা সহজ হবে।

সম্পূর্ণ পাঠান্তর সংকলন এবং তার তুলনামূলক বিচার আমাদের

আলোচনার মূল লক্ষ্য নয়। কিন্তু পাঠান্তর রীতির প্রবণতা থেকে যে-কোনো কবির শিল্প-মানসিকতার কিছু কিছু লক্ষণ ধরা পড়ে। সেইজন্যই এখানে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যের পাঠান্তরের আদর্শের নিদর্শনস্বরূপ স্বপ্ন-প্রয়াণের প্রথম দুটি সর্গের পাঠভেদ উপস্থিত করা হল।

পাঠান্তরের নির্দশন

প্রথম সর্গ ॥ মনোরাজ্য-প্রয়াণ

১৭ স্তবক ॥ দ্বিতীয় সংস্করণে এইরূপ আছে—

"কোথায় চ'লেছে রথ, কোণাকুণি।"
"মনোরাজ্যে কবিবর!" হাসি বলে কল্পনা-তরুণী।
কবি কহে "ওহো! ঘুচি গেল মোহ!
রাজ্য পাইলাম হাতে 'মনোরাজ্য শুনি ॥

নবতম সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ পুনর্গৃহীত।

১৮ স্তবক ॥ ইহা প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ১৯ স্তবক। এই স্তবকের শেষ ছত্র—

প্রথম সংস্করণ : কল্পতরু সুচারু ছায়ায় ছায় ধরা!
দ্বিতীয় ও নবতম সংস্করণ : কল্পতরু-ছায়া-তলে রঙ্গে হাসে ধরা ॥

১৯ স্তবক ॥ ইহা প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে ১৮ স্তবক। এই স্তবকের শেষ ছত্র—

প্রথম সংস্করণ : অই দিকে ধায় সদা বাসনার নদী
দ্বিতীয় ও নবতম সংস্করণ : অই চাঁদে উনমাদে বাসনা-জলধি

প্রথম সংস্করণের ২০ স্তবক দ্বিতীয় এবং নবতম সংস্করণে বর্জিত :

মনোবাঞ্ছা পূরিবে তথায় গিয়া!
মিলিবে সে সুখ-নিধি, সদা চিন্তা যাহার লাগিয়া!
ধরাতল-রূপ
ছাড়ি' অন্ধকূপ,
এইবার বাঁচিব নিশ্বাস তেয়াগিয়া!

দ্বিতীয় সর্গ ॥ নন্দনপুর প্রয়াণ

২ স্তবক ॥ তৃতীয়-পঞ্চম ছত্র

প্রথম সংস্করণ :

কহিল কল্পনা
চারু চন্দ্রাননা
"মনোরাজ্য দেখ এই নয়ন-রুচির ॥

দ্বিতীয় সংস্করণ : কহিল কল্পনা "এসেছ অল্প না—
তোমার মনের মত সরোবর তীর—

নবতম সংস্করণ : কহিল কল্পনা
"এসেছ অল্প না—
কেমন দেখিছ এই সরোবর তীর ?

৩ স্তবক ॥ প্রথম ছত্র

প্রথম সংস্করণ ; বইল সরসী-তীরে এক ঠাঁই।

দ্বিতীয় সংস্করণ : জিরাও বসিয়া কবি এই ঠাঁই।

নবতম সংস্করণ : "দুদণ্ড জিরাও বসি এই ঠাঁই।

৪ স্তবক। চতুর্থ-পঞ্চম ছত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ : চলিল রমণী,
অন্ধকারে ডুবাইয়া পূরণিমা রাত্রি ॥

নবতম সংস্করণ : নাহি সে রমণী !
অন্ধকারে ডুবিল গো পূরণিমা রাত্রি ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ৫ম স্তবক নবতম সংস্করণে বর্জিত। বর্জিত এই অংশ নিচে দেওয়া হল :

"কোথা যাও সুন্দরি !" এতেক বলি'
তাকাইয়া থাকে কবি, কল্পনা যখন যায় চলি'।
মন্দ-মৃদু-গতি,
গেল সে যুবতী,
কবি ভাবে "শীঘ্র গেল যেমতি বিজলি ॥

নবতম সংস্করণে ৪র্থ স্তবকের পরেই প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ৬ষ্ঠ স্তবক (হায় হায় কল্পনা···) ৫ম স্তবক রূপে গৃহীত।

৯ স্তবক ॥ দ্বিতীয় ছত্র

২য় সংস্করণ : 'কাব্য রস-কামী' স্থলে
বাক্য রস-কামী। —সম্ভবত মুদ্রণপ্রমাদ

১১ স্তবক ॥ দ্বিতীয় ছত্র

১ম ও ২য় সংস্করণ : এতেক কহিয়া মোরে পুরাও মনের অভিলাষ
নবতম সংস্করণ : কুশল বারতা কহি' পুরাও মনের অভিলাষ।

১৩ স্তবক ॥ নবতম সংস্করণে ১৩ স্তবকের স্থলে প্রথম সংস্করণে নিম্নলিখিত স্তবক দুইটি ছিল :

কবি কহে "এই ঠাঁই আছি ভাল ;
এমন চন্দ্রমা ফেলি' রচিবে না প্রদীপের আলো !
এ বা কি চন্দ্রমা !
তা'র সে উপমা
কোথায় পাইব ! হায় ! কোথায় লুকা'ল ॥ ১৪

কথা ভাসে মনের বারত লভি'
সখ্য-রস বলিল "নিরখি কেন ম্লান-মুখ-চ্ছবি ?
কি কষ্টের লাগি
নিশ্বাস তেয়াগি'
লভিলে অমন করি', বল'-দেখি কবি ?" ১৫

দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠও প্রথম সংস্করণের অনুরূপ, কেবল ১৫ স্তবকের শেষ ছত্রে 'বল'-দেখি' স্থলে 'কি ভাবিছ' আছে।

১৫ স্তবক ॥ দ্বিতীয় ছত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ :
ভৃত্য এক অমনি আইল তথা, না করি' আলস।

নবতম সংস্করণ :
ভৃত্য এক আইল মুহূর্ত্ত মাঝে, না করি' আলস

২০ স্তবকের পর প্রথম সংস্করণে আছে—

মনোরথে করে ধনী করে যাওয়া-আসা,
মায়া-বিদ্যা শিখিয়া মায়ের কাছে ; অই মোর বাসা

সরোবর তটে,
বন সন্নিকটে,
পদার্পণ কর যদি পূর্ণ হয় আশা ॥ ২৩

দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে এ স্তবক বর্জিত।

২৩ স্তবক

প্রথম সংস্করণ :

এই যে দেখিছ দিব্য সরোবর,
এ'র নাম মানস ; নন্দন পুর যেমন সুন্দর,
তেমনি মানস
অমৃত পরশ
নন্দন-বাসীরা তেঁই অজর অমর ॥ ২৬

দ্বিতীয় সংস্করণ :

এই যে দেখিছ দিব্য সরোবর,
মানস ইহার নাম ; মনোরাজ্য যেমন সুন্দর,
মানস সরসী তাহারি আরসি ;
শত শত নদী সেবায় তৎপর ॥ ২৫

নবতম সংস্করণে প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় ছত্র রক্ষিত।

২৪ স্তবক ॥ প্রথম ছত্র

প্রথম ও নবতম সংস্করণে 'নামি', দ্বিতীয় সংস্করণে 'নাবি'

২৫ স্তবক ॥ প্রথম ছত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে 'দিগন্তের বুকে'র পরিবর্তে 'চাঁদের ময়ূখে'।

২৭ স্তবকের পর প্রথম সংস্করণে আছে—

এড়াইয়া সুরভি কানন-পথ,
নব-নব দৃশ্য-সব দেখাইয়া চলে পুষ্পরথ।
কভু গাছ-পালা,
বিহঙ্গম-শালা,
কভু নদী-সরোবর কভু পরবত ॥ ৩১

পথ করি' বিপিনের ছায়ে ছায়ে,
তটিনী চলিয়া যায় হেলিয়া তটের গায়ে গায়ে।
দু-ধার শ্যামল,
ভিতর নির্মল,
অন্তরে স্ফটিক-শোভা শ্যাম-শোভা কায়ে ॥ ৩২

এই দুই স্তবকের দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত ;
নবতম সংস্করণে দুটি স্তবকই বর্জিত।

২৮ স্তবক ॥ দ্বিতীয় ছত্র
'এই ঠাঁই' (নবতম সংস্করণ) স্থলে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে 'সেই ঠাঁই'।

২৯ স্তবকের পর নবতম সংস্করণের ৩০, ৩১ স্তবকের পরিবর্তে প্রথম সংস্করণ, এবং যৎসামান্য পরিবর্তন সহ দ্বিতীয় সংস্করণে নিম্নলিখিত চারিটি স্তবক ছিল :

সভা দেখি' অতুলন শোভাময়,
এগোইতে নারে কবি, থমকিয়া দাঁড়াইয়া রয়।
বলে "মর্ত্য দেহে,
হেন দিব্য গেহে,
কেমনে পা বাড়াইব শঙ্কিছে হৃদয় ॥" ৩৫

সভায় পশিয়া কবি ধীরি ধীরি,
দেখে দেব-মূর্তি সব আছে বসি', সিংহাসন ঘিরি'।
নিরখে সম্মুখে,
প্রেমোজ্জল মুখে
বিরাজে আনন্দ যেন আনন্দ শরীরী ॥ ৩৬

নৃপতিরে অভিবাদে কবিবর,
অভিবাদে সমস্ত সভাস্থ-জনে, যা'রে যা'র পর।[১]

১ দ্বিতীয় সংস্করণে "যা'রে যা'র পর" স্থলে "যোড় করি কর"।

বসিতে সহসা
না হয় ভরসা ;
উঠিল আনন্দ-রাজ সদয়-অন্তর ॥ ৩৭

নামি'-আসি' আনন্দ জ্যোতিরময়,
আলিঙ্গন করিলেন কবিবরে ঢালিয়া হৃদয়।
তখন কবির,
মন হ'ল স্থির,
ভাবে "অভাজন-প্রতি দেবতা সদয় ॥" ৩৮

৩৩ স্তবক ॥ দ্বিতীয় ছত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের যথাক্রমে ৪০ ও ৩৮ স্তবকের দ্বিতীয় ছত্র—

কবি কহে "কিবা তরু কিবা নদী কিবা সরোবর,

নবতম সংস্করণে :

চারিদিক নিরখিয়া ধীরে ধীরে কহে কবিবর

৩৪ স্তবকের পরিবর্তে

প্রথম সংস্করণে ৪১ স্তবকের পাঠ—

দ্যুতিময় বিচিত্র এ নিকেতন !
প্রথমে পশিনু যবে, মনে হ'ল সকলি নূতন ;
দেখি' এবে স্নেহ
ঘুচিল সন্দেহ,
সবে যেন করিছে মোরে প্রিয় সম্ভাষণ ॥ ৪১

দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৯ স্তবকের পাঠ অনুরূপ— কেবল শেষ ছত্র—

সেই ঘর ! সেই দ্বার ! সেই বাতায়ন" !

৩৮ স্তবক ॥ শেষ ছত্র

১ম সংস্করণ ৪৫ স্তবক : অসাধ্য হইয়া উঠে, করিলে শক্তাই ॥

২য় সংস্করণ ৪৩ স্তবক : শক্ত হ'য়ে ওঠে, করিলে শক্তাই ॥

নবতম সংস্করণ,

৩৮ স্তবক : কেমনে ঘটিতে পারে ভাবিতেছি তাই ॥

৩৯ স্তবক ॥ চতুর্থ পঞ্চম ছত্র

প্রথম সংস্করণ ৪৬ স্তবক—

চাই সাবধান ;

দুগ্ধে নাহি পশে যেন অম্ল-রস-কণা ॥"

দ্বিতীয় ও নবতম সংস্করণে যথাক্রমে ৪৪ ও ৩৯ স্তবক—

চাই অবধান ;

দুধে না পড়ে গো যেন অম্ল-রস-কণা ॥"

৪৪ স্তবক ॥ প্রথম ছত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের ৪৯ স্তবকে পাঠ—

'সে জন' এর পরিবর্তে 'যুবক'

৪৭ স্তবক ॥ শেষ ছত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের 'হেয়' স্থলে

নবতম সংস্করণে 'প্রেয়'

৫০ স্তবকের পর

প্রথম সংস্করণের ৫৮, ৫৯ ও ৬০ স্তবক ছিল—

বীর-রসে পাঠায়েছ, তাহা জানি ;

কিন্তু পাতালের দৈত্য শত কোটি, বীর একা প্রাণী।

বিলাস পুরের

সেনা আছে ঢের,

যুদ্ধে এগোবে না কেহ— ইহা বেদ-বাণী ॥ ৫৮

বীর রস, দুর্গ আগুলিছে বটে ;

সেই বীর একা যে সহস্র বধে, কিছুতে না হঠে !

জানি বীর রস

দুর্জয় সাহস,

সাহসে কি ক'রে কিন্তু সংখ্যার নিকটে ॥ ৫৯

হ'বে এই, দেখিতেছি ভীরুগণ

পলায়ে বাঁচিবে সবে ; বীররস ত্যজিবে জীবন,

শত শত অরি

ধরা-শায়ী করি ;

বীর সৈন্য এক দল পাঠাও রাজন" ॥ ৬০

৬৬ স্তবক ॥ দ্বিতীয় ছত্র

'বিহরেন' স্থলে ১ম ও ২য় সংস্করণে 'নিবসেন'

৬৮ স্তবক ॥ ২য়-৫ম ছত্র, প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে :

গৃহ-মধ্যে পথ দেখাইল ধনী, খেলিয়া বিজলি

বলয়-কঙ্কণে ;

আলেখ্য-ভবনে

লয়ে গেল তা'র পর পাছু পাছু চলি' ॥

৬৯ স্তবক ॥ ইহার পরিবর্তে প্রথম সংস্করণে :

চিত্র এক, নিরখিল চিত্র-লেখা,

পথে পড়ি' যাইতেছে গড়াগড়ি— যেই মাত্র দেখা

অমনি যতনে

(কি যেন রতনে)

তুলি' রাখে ; শোভা-কাছে বিদ্যা তা'র শেখা ॥

দ্বিতীয় সংস্করণে এই স্তবক নেই।

৭০ স্তবক ॥ প্রথম সংস্করণে :

চিত্র-পট তুলি'-রাখি' ধীরে ধীরে,

নৃপের আজ্ঞায় ধনী সম্ভাষিয়া কহিল কবিরে,

"দেখ' এ'স ছবি।"

হেরি' কহে কবি

"বন্দি হ'লে পুরে আশ এ তব মন্দিরে ॥"

দ্বিতীয় সংস্করণে, এই স্তবকের

৪-৫ ছত্র প্রথম সংস্করণের অনুরূপ,

৩-৪ ছত্র নবতম সংস্করণের অনুরূপ,

১-২ ছত্র নিম্নলিখিত রূপ—

নৃপতির আদেশ ধরিয়া শিরে

রচিয়াছে ভয়ে ভয়ে (চিত্রলেখা কহিল কবিরে)

৭২ স্তবক ॥ দ্বিতীয় ছত্রে 'চক চক' স্থলে

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে 'ভক্ ভক্'

৮১ স্তবক ॥ প্রথম ছত্র। 'এমনি' স্থলে

দ্বিতীয় সংস্করণে 'কি এক'

৮২ স্তবক ॥ পঞ্চম ছত্র। 'গাহিছে' স্থলে

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে 'গাইছে'

৮৭ স্তবক ॥ দ্বিতীয় ছত্র

প্রথম সংস্করণে—

দেখা যায় অদূরে ; যেমন স্থান তেমনি নিরালা!

দ্বিতীয় সংস্করণে—

দেখা যায় জ্যোৎস্নায় চারিদিক্ নিভৃত নিরালা!

৮৯ স্তবক ॥ পঞ্চম ছত্র। 'মারুতচ্ছলে' স্থলে

দ্বিতীয় সংস্করণে 'মারুতছলে'

৯০ স্তবক ॥ দ্বিতীয় ছত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে—

গান্ধর্ব্বী গাইছে তায় অনুপম রস-বরিষণে।

৯২ স্তবক ॥ চতুর্থ ছত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে

'সঙ্গীত-আসবে',

৯৩ স্তবক ॥ পঞ্চম ছত্র। 'সংকেতিয়া' স্থলে

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে 'চেয়াইয়া'

৯৪ স্তবক ॥ দ্বিতীয় ছত্রে। 'কবিবর' স্থলে

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে 'কবির'

৯৭ স্তবক ॥ দ্বিতীয় ছত্রে 'ডাকিতেন কত' স্থলে

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে 'ডাকিতেন কিবা

পঞ্চম ছত্র 'তাঁরে আনি' স্থলে

দ্বিতীয় সংস্করণে 'আনি যবে'

৯৮ স্তবক। প্রথম ছত্র। 'কত' স্থলে

প্রথম সংস্করণে—'ভবে'

১০০ স্তবক ॥ প্রথম সংস্করণের অনুরূপ।

দ্বিতীয় সংস্করণে আছে—

"এ'স লয়ে যাই তথি ; কত তিনি
কহেন তোমার কথা !" এত বলি, পথ চিনি চিনি,
কবি-পানে ফিরি চলে ধীরি ধীরি।
সঞ্চারিণী লতা যেন নব-পল্লবিনী !

১০১ স্তবক ॥ তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ছত্র

প্রথম সংস্করণে

"একি" বলে কবি
না উঠিতে রবি
ডাকে ক্ষান্ত দিল কেন, চথা আর চখী !

দ্বিতীয় সংস্করণে স্তবকটি বর্জিত।

১০২ স্তবক ॥ দ্বিতীয় ছত্র

প্রথম সংস্করণ : বাহির হয়েছে কিবা ঋতু কুল-পতি
দ্বিতীয় সংস্করণ : বাহির হইল কিবা ঋতুকুল-পতি

তৃতীয় ছত্র—"ফুটাইল" স্থলে
প্রথম সংস্করণে "ফুটাইছে"
চতুর্থ ছত্র— "পরাইল" স্থলে
প্রথম সংস্করণে— "পরাইছে"

১০৩ স্তবক ॥ তৃতীয় চতুর্থ ছত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ :

ভয়ে ভয়ে পদার্পয়ে, তবু পথ ভুল্যে
গন্ধ-মদে ঢলি পড়ে এফুলে ওফুলে ॥

১০৪ স্তবক ॥ দ্বিতীয় ছত্র

প্রথম সংস্করণে : কুহরিছে দেখ পিক রসাল-শাখিতে ॥
দ্বিতীয় সংস্করণে · কোথা হৈতে কোকিল লাগিল কুহরিতে ॥

১১১ স্তবক ॥ দ্বিতীয় ছত্র

দ্বিতীয় সংস্করণে :

কথা কহিবার ভানে মোর পানে তাকাইয়া সখী—

পঞ্চম ছত্র

দ্বিতীয় সংস্করণে :

যেমন মুখের ছিরি তেমনি স্থঠাম !

১১৪ স্তবকের পরিবর্তে—

প্রথম সংস্করণে—

নাম তা'র কল্যাণ গুণের নিধি !

তা'রি ধ্যান হইয়াছে সজনীর প্রাণ-প্রতিনিধি ।

তেঁই দিবা-নিশি,

ভ্রমে দিশি দিশি ;

শয়নে নয়ন-কোণে উথলে বারিধি ॥"

দ্বিতীয় সংস্করণে ১-২ ছত্র প্রথম সংস্করণের অনুরূপ ।

৩-৫ ছত্র এইরূপ—

সখী পঙ্কজিনী, নবারুণ তিনি,

দোঁহারে দোঁহারি তরে গঠিয়াছে বিধি ॥"

১১৫ স্তবক ॥ ষষ্ঠ ছত্র 'বুকে' স্থলে

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে 'হৃদে' ।

১১৯ স্তবক ॥ প্রথম ছত্রে 'যথায়' স্থলে

দ্বিতীয় সংস্করণে 'কোথাও' ।

১২০ স্তবক ॥

২-৪ ছত্র প্রথম সংস্করণে এইরূপ—

ঝাঁঝাঁ করিছে নিশি, দিশি দিশি বিরাম নাই ।

এমনি নব নব, সউরভ আসিতে থাকে,

পরাণ উন্মাদি', উঠে কাঁদি', তাহার পাকে ॥

দ্বিতীয় সংস্করণে ১-২ ছত্র নবতম সংস্করণের ৩-৪ ছত্রের অনুরূপ ।

দ্বিতীয় সংস্করণের ৩-৪ ছত্র এইরূপ—

হেতায় আম্রবন স্থশোভন মুকুলে ভরা ।

হোতা বকুল-মূলে ফুলে ফুলে ফুলেছে ধরা ॥

১২১ স্তবক ॥

প্রথম ছত্র 'হেতায়' স্থলে

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে 'নিকটে'
চতুর্থ ছত্রে 'আচম্বিত' স্থলে
প্রথম সংস্করণে 'বেণুসহিত'।

১২৪ স্তবক ॥

৩-৪ ছত্র দ্বিতীয় সংস্করণে এইরূপ—

হেরিয়া অপরূপ সবে চুপ। ক্ষণেক বই,
সখিকা সুরনারী (মায়া মা'রই প্রাণের সই)

১২৪ স্তবকের পরে প্রথম সংস্করণে এই স্তবক ছিল—

নয়ন মেলি' পাখী, উঠে ডাকি', আলোক-ভুখে;
ভ্রমর গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া বিচরে সুখে;
যে দিকে আঁখি যায়; উগরায় শ্যামল শোভা;
ছাদ খিলান থাম, সর্ব শ্যাম, নয়ন-লোভা॥

দ্বিতীয় ও নবতম সংস্করণে এই স্তবক বর্জিত।

১২৫ স্তবক। প্রথম ছত্রে 'মায়ার সখী' স্থলে
দ্বিতীয় সংস্করণে ॥ 'কবিরে লখি';

১২৬ স্তবক ॥ প্রথম ছত্রে 'তোমার' স্থলে
দ্বিতীয় সংস্করণে "তোমারি"।

১৩১ স্তবক। তৃতীয় ছত্রে 'সতত এই ঠাঁই, স্থান পাই' স্থলে
দ্বিতীয় সংস্করণে 'চরণতলে পাই যেন ঠাঁই ॥'

১৩২ স্তবকের পরিবর্তে প্রথম সংস্করণে নিম্নলিখিত স্তবকগুলি আছে—

বলিল মায়া-মাতা, "বিশ্বপিতা পুরা'বে আশ;
তোমারি হ'বে, কবি, এ অটবী, দ্বাদশ মাস।
শুন' আমার কথা, মনোব্যথা, না র'বে আর;
আইলে কি কারণ, বিবরণ, শুন তাহার" ॥

"বালিকা কল্পনা, সে ললনা, কিছু না জানে,
পাঠা'নু আমি তা'রে, তোমা-দ্বারে, সারথি-ভানে।
তোমার অনুরাগে হো'ক আগে আহুতি-সেক,
দুজনে বিয়া দিয়া, দুই হিয়া, করিব এক ॥

মনে ভাবিল গুণী, "দিনগুণি" রহিব জিয়া,
তখন মৃত জীবে, প্রাণ দিবে, বিবাহ দিয়া ;
ত'দিন বাঁচি কিসে ! আশীবিষে হৃদয় পালি' ;
দংশে যদি না সে, বিষ-শ্বাসে হইব কালি ॥

কেন বিজলি-রেখা, দিল দেখা, এ খেলা খেলি' !
কেন বা গেল চলি' আঁখি ছলি', আঁধারে ফেলি' ।
কোথা লুকা'লে প্রিয়ে ! দেখা দিয়ে বাঁচাও প্রাণ !
দেখি আরেকবার, সে তোমার, বিধু-বয়ান !"

১৩৩ স্তবক প্রথম সংস্করণে এইরূপ আছে—

রাজসী মায়া-সখী, ভাব লখি', বলিল "আহা !
ছবি একটি আছে আমা-কাছে, দেখ'-সে ভাবে ।
দেখিতে দোষ নাই, এই ঠাঁই আইস উঠি',
কি ছবি নাহি' ক'ব, দেখি তব নয়ন তুটি !"

এই স্তবক দ্বিতীয় সংস্করণে এইরূপ—

রাজসী নাম যার মায়া মা'র দ্বিতীয়া সখী
হাসে আপন মনে অকারণে কবিরে লখি' ।
বলিল কবিবরে সুধাস্বরে "আইস উঠি',
কেন তা নাহি ক'ব ! দেখি তা নয়ন তুটি ॥"

(নবতম সংস্করণেও ছত্রটি এইরূপ আছে)

১৪০ স্তবক ॥

তৃতীয় ছত্রে 'করিছে' স্থলে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে 'কর্য্যেছে'

পঞ্চম ছত্রে 'ফুল তাহে ধরিয়াছে' স্থলে

প্রথম সংস্করণে 'ফুল কিবা ফুটিয়াছে',

দ্বিতীয় সংস্করণে "ফুল কিবা ধরিয়াছে।"

ষষ্ঠ ছত্র প্রথম সংস্করণে "কে হায় সাধিয়াছে"

সপ্তম ছত্র 'বনেরে' স্থলে দ্বিতীয় সংস্করণে 'কাননে'।

১৪৩ স্তবক ॥

সন্ধ্যা থেকে অই ধারা … উথলি উঠে।”—

দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত।

১৪৪ স্তবক ॥

একাদশ ছত্র, ‘ধরা’ স্থলে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে ‘মর্ত্ত্য’

১৪৫ স্তবকের পর প্রথম সংস্করণে আছে—

এতেক বলিয়া,
বিকলিয়া,
মনের শিকলিয়া
বাঁধিতে যায়।

উপবনে আঁখি
দিয়া রাখি’,
মন কেমনে ঢাকি,
ভাবে উপায়।

নিরখে মল্লিকা
বিকলিকা!
নিরখে মাধবিকা
কুসুমে ভরা।

বকুল-তলা-টি
ঢাকা-মাটি;
কুসুম পরিপাটি
ছেয়েছে ধরা॥

বলে “সই শোন্,
কোন্ কোন্
ফুল ফুটেছে গোন্,
করিয়া নাম।

পরাণ ফুরা'ল!
আর না লো!
অই অবধি ভাল!
এখন থাম্!

পারিনে লো আর,
বার বার!
হৃদে পাষাণ-ভরি,
তাই সামালি!

নড়েনা লো রাত্র
অণুমাত্র,
জ্বলিয়া দায় গাত্র
হুতাশে খালি!॥

চল দেখি যাই
ওই ঠাঁই,
যদি আরাম পাই
ফাঁকায় গিয়া!

ঘরে যেন বিছে
দংশিছে,
অনল বাহিরিছে
শরীর দিয়া।"

উদ্যান-ভূমিতে
পদার্পিতে,
মলয় আচম্বিতে
মাতিয়া বহে;

বিরহিণী তায়
মৃত প্রায়,

কাতরে ক্ষমা চায়,
আর না সহে! ॥

গগনে নক্ষত্র
যত্র তত্র,
কাননে ফুল-পত্র
পবনে দুলে।
নয়ন-দুর্লভা
নারী-সভা
তা'-সবে নিষ্প্রভা
করিয়া-তুলে ॥

জুঁই তুলে নুয়ে,
মৃদু ছুঁয়ে,
কেহ কুড়ায় ভুঁয়ে
বকুল গাদা।
পাড়ে চাঁপা-ফুলে
বাহু তুলে,
পায় গোলাব-মূলে
কাঁটার বাধা ॥

ভাল ফুল খুঁজি'
করে পুঁজি,
লতার সনে যুঝি'
নিকুঞ্জ ঘুঁটে।
পিক, পেয়ে নাড়া,
দিল সাড়া,
পল্লব দিয়া ঝাড়া
হরিণ উঠে ॥

কল্পনার মন,
ক্ষণে ক্ষণ,

ফিরিছে ত্রিভুবন
কবির সাথে।
ক্ষণে আঁখি-দুটি
ভরি' উঠি',
অলক ভিজাইছে
পলক-পাতে ॥

১৪৭ স্তবক ॥ প্রথম সংস্করণে এইরূপ আছে—

বিষবাণ পশিল কবির চিতে!
হৃদয়-হইতে বাহিরয় শ্বাস পরাণ-সহিতে।
হেরি' আশে-পাশে,
বলে হা-হুতাশে
"কল্পনা কোথায়!"—হায় কে পারে কহিতে!

দ্বিতীয় সংস্করণে এইরূপ—

দারুণ বিরহে কবিবর দহে
হৃদয় হইতে বাহিরয় শ্বাস, যাতনা না সহে!
হেরি আশে পাশে,
বলে হাহুতাসে
"কোথা সে!" অমনি আর চক্ষে ধারা বহে ॥

১৪৭ স্তবকের পর প্রথম সংস্করণে ছিল—

এমনি হইল মন উচাটন
ধরাতলে ঢলিয়া পড়িল কবি হয়্যে অচেতন।
চরাচর বিশ্ব
হইল অদৃশ্য
পড়িয়া রহিল কবি জড়ের মতন।

চটক ভাঙিল যেই, কহে কবি "কা'রেই বা বলি!
"চকিতের প্রায় সুস্বপন-রবি অস্তে গেল চলি'!
যায় বটে দিনকর, (সন্ধ্যাসতী প্রকাশ্যে আসিতে
লজ্জে নাকি সে থাকিলে) কিন্তু তবু স-স্মিত রশ্মিতে—

বিলম্বে পশ্চিম-মূলে ; তরুদের জটিল মাথায়
ক্ষীণ কর নিবেশিয়া, আশিষিয়া, মাগিয়া বিদায়,
অতিশয় অনিচ্ছায় লয় পরে সব অপসারি' !
যায় বটে জলধর, চাতকেরে দিয়া যায় বারি ॥

১৪৮ স্তবকের প্রথম ছত্র প্রথম সংস্করণে ছিল—
কোথা গেল অচল সিন্ধু-অটবী !

১৪৯ স্তবকের দ্বিতীয় ছত্র প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে—
'মায়া-মা'র আজ্ঞা' স্থলে 'মায়ারি আদেশ' ছিল

১৫০ স্তবক দ্বিতীয়-চতুর্থ ছত্র প্রথম সংস্করণে ছিল—
নব-রসে পক্ক হ'বে যখন হেরিয়া ভব-মেলা,
চাহে যাহা মন
পাইবে তখন।

দ্বিতীয় সংস্করণে দ্বিতীয় ছত্রে—
'দেবীর' স্থলে 'মায়ার'।

৪

দ্বিজেন্দ্রনাথের গানের তালিকা

॥ ব্রহ্মসংগীত ॥

প্রথম কলি	উৎস-সূত্র	রাগরূপ
১. অকূল ভবসাগরে	॥ ব্রস ৪ ॥	ভৈরবী, কাওয়ালী
২. অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি	॥ ব্রস ৪ ॥	বন্দনা, ঝাঁপতাল
৩. অনুপম-মহিম পূর্ণব্রহ্ম ॥	॥ ব্রস ১ ॥	ভৈরব ঝাঁপতাল
৪. আজিকে মধুর	॥ * ॥	গান্ধারী টোড়ি, ঝাঁপতাল
৫. আজি কি হরষ সমীর	॥ ব্রস ৬ ॥	মিশ্র পরজ, কাওয়ালী
৬. আনন্দে আকুল সবে	॥ ব্রস ৩ ॥	বসন্ত, সুরফাঁক্তা
৭. আর গো কত ঘুরি	॥ ব্রস ৩ ॥	কুকুভ, ধামার
৮. আশ্চর্য দেখি এক	॥ ব্রস ৫ ॥	দেওশাক, ঝাঁপতাল
৯. এক প্রথমজ্যোতি	॥ ব্রস ৩ ॥	কেদারা, চৌতাল
১০. কর তাঁর নাম গান	॥ ব্রস ২ ॥	ঝিঁঝিট, ঠুংরি
১১. কেমনে কহিব, কি সুধাময় শোভা	॥ ব্রস ৪ ॥	সাহানা, আড়াঠেকা
১২. ঘোর গহন ভব-সংকটে	॥ ব্রস ৫ ॥	হাম্বীর, সুরফাঁক্তা
১৩. চমৎকার অপার জগত-রচনা	॥ ব্রস ৩ ॥	কানাড়া, ঝাঁপতাল
১৪. জগত-বন্দনে ভজ	॥ ব্রস ১ ॥	মোহিনী বাহার, ঝাঁপতাল
১৫. জয় জয় পরব্রহ্ম	॥ ব্রস ৬ ॥	বিভাস, ঝাঁপতাল
১৬. জাগো সকল অমৃতের	॥ ব্রস ৪ ॥	আসোয়ারি, ঝাঁপতাল
১৭. জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে	॥ ব্রস ৩ ॥	ভৈরবী, চৌতাল
১৮. দরশন দাও হে হৃদয়সখা	॥ ব্রস ১ ॥	কেদার, সুরফাঁক্তা
১৯. দীনহীন ভকতে নাথ	॥ ব্রস ৩ ॥	কাফি, সুরফাঁক্তা
২০. ধন্য দেব পূর্ণ ব্রহ্ম	॥ স্বরলিপি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮৫০ শক ॥	খট্, একতাল
২১. নয়ন বাহিয়ে ঝরে	॥ ব্রস ৪ ॥	তিলেক কামোদ, চৌতাল

* ব্রহ্মসংগীত, একাদশ সংস্করণ। স্বরলিপি নাই।

২২. ভজো রে ভজো রে ভবখণ্ডনে	॥ ব্রস ১ ॥	নারায়ণী, যৎ
২৩. বহিছে কৃপা-পবন	॥ ব্রস ৩ ॥	কেদারা, চৌতাল
২৪. বিশ্ব-ভুবন-রঞ্জন	॥ ব্রস ১ ॥	মেঘমল্লার, সুরফাঁক্তা
২৫. বিষয়ের তমোজাল	॥ ব্রস ৪ ॥	জয়জয়ন্তী, চৌতাল
২৬. সকল-মঙ্গল-নিদান	॥ ব্রস ১ ॥	ইমন কল্যাণ, চৌতাল
২৭. সব দুঃখ দূর হইল	॥ ব্রস ৩ ॥	ভৈরব, সুরফাঁক্তা
২৮. হৃদয়-চাতক মোর	॥ ব্রস ১ ॥	নটনারায়ণ, চৌতাল

॥ প্রেম সংগীত ॥

১. বসন্তের কাল গেছে কেন ফুল ফুটিবে আর ॥ সঙ্গীত মুক্তাবলী ॥ পূরবী—আড়া

২. সে জন বিহনে প্রাণ বাঁচে না ॥ ঝিঁঝিট খাম্বাজ / কাওয়ালি

॥ জাতীয় সংগীত ॥

১. মলিন মুখচন্দ্রমা ॥ বীণাবাদিনী, শ্রাবণ ১৩০৪ ॥ তিলক কামোদ, ঝাঁপতাল

৫

রচনাপঞ্জী

ক. দ্বিজেন্দ্রনাথের গ্রন্থমালা

খ. পাণ্ডুলিপি

গ. সাময়িক পত্রে প্রকীর্ণ রচনা

ঘ. অন্যান্য

ক. দ্বিজেন্দ্রনাথের গ্রন্থমালা

বাংলা

১. মেঘদূত

মহাকবি কালীদাস প্রণীত / **মেঘদূত**। / সংস্কৃত হইতে পদ্যে / অনুবাদিত। / কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে / শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা বাহির মৃজাপুর, / চাশাধোবা পাড়া ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত। / [সম্বৎ ১৯১৭। মূল্য তিন আনা মাত্র] / পৃ ৩১

সংস্করণ:

মেঘদূত / পদ্যানুবাদ / দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর / সুশীল রায় সম্পাদিত / ধ্রুপদী প্রকাশন / কলকাতা ১৯

প্রথম ধ্রুপদী-সংস্করণ / অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ : ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দ : ১৮৮২ শকাব্দ। মূল্য দেড় টাকা। প্রচ্ছদ মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত -অঙ্কিত 'যক্ষপত্নী' চিত্রে ভূষিত।

এই সংস্করণে 'নবরত্নমালা' (১৩১৪) গ্রন্থে সংকলিত পাঠ অনুযায়ী মেঘদূতের এই অনুবাদটি মুদ্রিত। পরবর্তীকালে (১৩২৭) দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত 'কাব্যমালা' গ্রন্থে যে পাঠান্তর দেখা যায় তার তালিকা গ্রন্থশেষে যুক্ত হয়েছে।

২. **ভ্রাতৃভাব**। ইং ১৮৬৩

"নূতন গ্রন্থ।…শ্রীযুত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক যে প্রবন্ধ ব্রাহ্ম ভ্রাতৃসভায় পঠিত হয় তাহা এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাহাতে পরস্পর ভ্রাতৃ-ভাব উন্নত হয় সেই ভ্রাতৃ-ভাবের ফল অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।"—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', আষাঢ় ১৭৮৫ শক

৩. **তত্ত্ববিদ্যা**:

১ম খণ্ড — জ্ঞানকাণ্ড। ৮ অগ্রহায়ণ ১৭৮৮ শক (ইং ১৮৬৬) পৃ ১৮২

২য় খণ্ড — ভোগকাণ্ড। (১৮ অক্টোবর ১৮৬৭) পৃ ৬৪

৩য় খণ্ড — কর্মকাণ্ড। (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮) পৃ ৭০

৪র্থ খণ্ড — সাধন প্রকরণ। সংবৎ ১৯২৬ (১০ এপ্রিল ১৮৬৯) পৃ ৪৪

৪. **স্বপ্ন-প্রয়াণ**। / শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। / অচেতনে চেতন! ঘুমন্তে জাগা! / সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা! / কলিকাতা / বাল্মীকি যন্ত্র / শকাব্দা ১৭৯৭। পৃ. [২]+রূপকের দুর্ব্বোধ অংশের তাৎপর্য্য ৵৹+সংক্ষিপ্ত বচনের উচ্চারণ পদ্ধতি ৶৹+অশুদ্ধ শোধন ৵৹+২৪৩

সংস্করণ: **স্বপ্ন-প্রয়াণ**। / শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। / দ্বিতীয় সংস্করণ। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড। শ্রাবণ ১৩০৩। / মূল্য ১৲ টাকা। পৃ [২]+অশুদ্ধি-শোধন [২]+১৬১

স্বপ্ন-প্রয়াণ।/ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত / অচেতনে চেতন! ঘুমন্তে জাগা। / সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা!/ নবতম সংস্করণ / প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস / এলাহাবাদ / ১৯১৪ / মূল্য ১॥০ / পৃ [৪]+২২৮

বহুকাল পরে স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যের একটি ('আলোচনা' এবং 'পরিশিষ্ট'-সহ) পুনর্মুদ্রণ হয়:

স্বপ্ন-প্রয়াণ / দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর / অচেতনে চেতন! ঘুমন্তে জাগা! / সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা! / ১৯৬৪

আখ্যাপত্রের পিছনে:

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের / উত্তরাধিকারিগণের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত: কার্তিক ১৩৭১: ১৯৬৪ / প্রথম প্রকাশ ১৭৯৭: ১৮৭৫ / দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৩০৩: ১৮৯৬ / তৃতীয় নবতম সংস্করণ: ১৯১৪ / পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৩৭১: ১৯৬৪ / ... / প্রাপ্তিস্থান / জিজ্ঞাসা / ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯ / ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯ / প্রকাশক: শ্রীপুলিনবিহারী সেন / ৫৪বি হিন্দুস্থান পার্ক। কলিকাতা ২৯

স্বপ্ন-প্রয়াণ সম্পর্কে 'আলোচনা' অংশে সতীশচন্দ্র রায়ের রচনা তাঁহার রচনাবলী (১৩১৯) হইতে; প্রিয়নাথ সেনের রচনা 'প্রিয়-

পুষ্পাঞ্জলি' (১৩৪০) হইতে ; শ্রীকানাই সামন্তের রচনা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২ হইতে এবং শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর রচনা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' মাঘ চৈত্র ১৩৬২ হইতে সংযোজিত ; এবং 'পরিশিষ্টে' সতীশচন্দ্র রায়ের ডায়ারি হইতে অংশবিশেষ এবং প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের দুখানি পত্র সংকলিত। এ ছাড়া প্রথম সংস্করণের 'রূপকের দুর্বোধ অংশের তাৎপর্য' যুক্ত হয়েছে।

৫. **সোনার কাটি রূপার কাটি**। (২ জুন ১৮৮৫) পৃ ৫৮

৬. **সোনায় সোহাগা** / শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / চিৎপুর রোড ৫৫ নং। / আষাঢ় ১২৯২ সাল। পৃ ২০

৭. **আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা** / ২৫ ভাদ্র ১২৯৭ (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯০)। পৃ ৩১

৮. **সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা** / (২৪ আগস্ট ১৮৯১)। পৃ ৮২

৯. **সাধনা— প্রাচ্য ও প্রতীচ্য**। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ (ইং ১৮৯২) পৃ ৪৮+৪ পরিশিষ্ট।

১০. **অদ্বৈত মতের প্রথম ও দ্বিতীয় / সমালোচনা**। / শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড। / ৩০ অগ্রহায়ণ ১৩০৪ / পৃ ৭০

অদ্বৈত মতের সমালোচনা। পৃ ১-৪২

অদ্বৈত মতের দ্বিতীয় সমালোচনা। পৃ ৪৩-৭০

১১. **অদ্বৈত মতের সমালোচনা**। অগ্রহায়ণ ১৩০৩ (১ ডিসেম্বর ১৮৯৬) পৃ ৪৪+৮ পরিশিষ্ট

১২. **পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম**। / শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক / অনুবাদিত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড। / বৈশাখ ১৩০৫। মূল্য চার আনা। পৃ [৪]+।০+৬৮

উৎসর্গ পত্র। / যিনি সর্ব্ব-মঙ্গলালয় পরমপিতা পরমাত্মার সত্য এবং মঙ্গল ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রুতি স্মৃতি হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অমৃত মন্থন করিয়া আমাদিগকে এ যাবৎকাল তাহা আস্বাদন করাইয়া আসিতেছেন সেই পরমারাধ্য পিতৃদেবের ৮৩ বৎসরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার পাদপদ্মে ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ-বিকসিত এই পদ্যকুসুমাঞ্জলি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে সমর্পণ করিলাম। / সেবক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

গার্হস্থ্য ব্রহ্মোপাসনা ১০-১৬

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ১-১৬ অধ্যায় ১-৬৭

১৩. **আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর / ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত**। / ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর একতম অধিবেশনে / আলবার্ট হলে / শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত। / কলিকাতা, / বাল্মীকি যন্ত্রে / শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা / মুদ্রিত। / ১৩০৬ সাল। পৃ [১]+১০৩

১৪. **ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন**। / পারিবারিক উপাসনায় / আচার্য্য শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক / পঠিত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। / ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড। / পৌষ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ। পৃ [২]+২৬

"উৎসর্গপত্র। / পরমারাধ্য পরম পিতা পরম দেবতা এবং পরম গুরু পরমাত্মাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার অপরাজিত স্নেহ ও করুণা প্রত্যক্ষবৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমার এই সুচিন্তার আন্দোলনের ফল আমাদের গৃহাশ্রমের ভক্তিভাজন কুলপতি পরম পূজনীয় পিতৃদেবের পাদপদ্মে প্রণিপাত পূর্ব্বক সমর্পণ করিলাম। / সেবক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।"

১৫. **আচার্য্যের উপদেশ** / প্রথম খণ্ড / মাসিক ব্রাহ্মসমাজে / আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও/ প্রকাশিত। / ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড। / ১৪ চৈত্র ১৩০৬ সাল। / মূল্য ॥০ আনা।

৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৩ চৈত্র রবিবার পর্যন্ত দশটি উপদেশের সংকলন।

১৬. **আচার্য্যের উপদেশ**। / দ্বিতীয় খণ্ড। / মাসিক ব্রাহ্ম সমাজে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর / কর্তৃক পঠিত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে / শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড। / পৌষ ১৩০৮ সাল / মূল্য ।॰ আট আনা / পৃ [২]+৬১

১৭. **শ্রীমন্মহর্ষি দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে / আচার্য্য শ্রীদ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের / বক্তৃতা**। কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত। / ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড। / ১৩০৮ সাল। পৃ [২]+৩২

১৮. **বিদ্যা এবং জ্ঞান**। / (২০ এপ্রিল ১৯০৬)। পৃ ২৪

১৯. **একটি প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর**। (২ সেপ্টেম্বর ১৯০৬)। পৃ ২২। ১৩১৩ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা 'ভাণ্ডার' পত্রে প্রথম প্রকাশিত।

২০. **বঙ্গের রঙ্গভূমি**। ১৩১৪ সাল। ২০ জুলাই ১৯০৭। পৃ ২৫
সূচী: পিতৃভূমি এবং মাতৃভূমি; বাবুর গঙ্গাযাত্রা। প্রথমটি 'দেশের ব্যথার ব্যথী' স্বাক্ষরে ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে এবং দ্বিতীয়টি 'বঙ্গের রঙ্গ দর্শক' স্বাক্ষরে ১৩১৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত।

২১. **হারামণির অন্বেষণ**। / শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / Calcutta / S. K. Lahiri & Co / 54, College Street / 1908 / পৃ [৪]+৬৪
সূচীপত্র: উপক্রমণিকা; ব্যক্তাব্যক্ত রহস্য; ত্রিগুণ রহস্য; দ্বন্দ্ব রহস্য।

২২. **দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব**। (২০ ডিসেম্বর ১৯০৮)। পৃ ৩২

২৩. **রেখাক্ষর-বর্ণমালা** / শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর / ১৩১৯ / কলিকাতা / পৃ. ১২০

মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় :

এই পুস্তক কলিকাতা ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ / আদি ব্রাহ্ম-সমাজ কার্য্যালয়ে এবং প্রধান প্রধান / পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। / ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে, / শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২৪. **গীতাপাঠ**। / শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / প্রকাশক / ইণ্ডিয়ান প্রেস / এলাহাবাদ / ১৩২২ সাল। পৃ [২]+৩৩৮

আখ্যাপত্রের পিছনে :

প্রকাশক / শ্রীঅপূর্ব্ব কৃষ্ণ বসু—ইণ্ডিয়ান প্রেস / এলাহাবাদ। / এই "গীতাপাঠ" তত্ত্ববোধিনী এবং প্রবাসীতে ছাপাইতে দিবার পূর্ব্বে সময়ে সময়ে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আচার্য্যগণের সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তরোত্তর ক্রমে শুনানো হইয়াছিল, তাই ইহার অধ্যায়গুলির নাম দেওয়া হইয়াছে "অধিবেশন।" / কলিকাতা / ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। / ১৩২২ সাল। / মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

নূতন সংস্করণ / পুনর্মুদ্রণ ॥

গীতাপাঠ / পুনর্মুদ্রণ / সংস্করণ / টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট। ১৯৭৩।

ভূমিকা : প্রিয়দারঞ্জন রায়

২৫. **নানা চিন্তা** / শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত / প্রথম সংস্করণ / ১৩২১ / প্রকাশক শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর / শান্তিনিকেতন / মূল্য ২৲ টাকা / পৃ [৬] + ৩৩৬

আখ্যাপত্রের পিছনে :

শান্তিনিকেতন প্রেসে / শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত / শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)

সূচী ॥ সাধনা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ; বিদ্যা ও জ্ঞান ; সাধনের সত্য ; আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত ;

সভাপতির অভিভাষণ ; উপসর্গের অর্থবিচার ; দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব।

"প্রকাশকের নিবেদন॥ এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধ পূজনীয় লেখক কর্ত্তৃক নানা সভায় পঠিত হইয়াছিল। "উপসর্গের অর্থ-বিচার" প্রবন্ধটি সাহিত্য পরিষদের দুই অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল এবং সেই দুই অধিবেশনে আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত বিদ্বজ্জনের মধ্যে দুই এক জনের সহিত পূজনীয় বক্তার কোনো কোনো বিষয়ে মতভেদ হওয়ার দরুন তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ বক্তার বক্তব্যগুলি মূল প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধটির কিয়দংশ বাদ দিয়া পরিবর্ত্তিত আকারে এই পুস্তকে মুদ্রিত হইল।

স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা যখন চরম সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল এবং বঙ্গের যুবকেরা যখন আত্মবিস্মৃত হইয়া ঘোরতর বিনাশের পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইয়াছিল তখনই পূজ্যপাদ লেখকের "দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব" প্রবন্ধটি প্রবাসী পত্রিকায় বাহির হয় এবং পুস্তিকাকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তিকাখানি বিলম্বে হস্তগত হওয়ার দরুন প্রবন্ধটি বর্ত্তমান গ্রন্থের শেষভাগে স্থান পাইল।"

২৬. **প্রবন্ধ-মালা** / শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত / প্রথম সংস্করণ / ১৩২৭ / প্রকাশক শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর / শান্তিনিকেতন / মূল্য ১৷৹ টাকা। পৃ [৬] + ২০২

আখ্যাপত্রের পিছনে :

শান্তিনিকেতন প্রেসে / শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত / শান্তি-নিকেতন, (বীরভূম)।

সূচী॥ মুখ্য এবং গৌণ ; কাল্পনিক এবং বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোক ; সোনার কাটি রূপার কাটি ; সোনায় সোহাগা ; নব্যবঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি ; আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা ; সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা ; বাবুর গঙ্গাযাত্রা।

"প্রকাশকের নিবেদন॥ পূজনীয় গ্রন্থকর্ত্তার সামাজিক প্রবন্ধগুলি

এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। ইহা পাঠ করিবার সময় পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে "বাবুর গঙ্গাযাত্রা" ব্যতীত অন্য প্রবন্ধগুলি ৩০ হইতে ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে যে সকল সামাজিক ব্যাধির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে— আধুনিক কালে তাহার প্রকাশ হ্রাস পাইয়াছে যদিও, তবু পুরাকালে সেই সকল ব্যাধির প্রকোপাবস্থায় সেগুলি সমাজের গাত্র হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার যে কী একান্ত আগ্রহ লেখকের ছিল তাহাই এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে জাজ্বল্যমান। বর্ত্তমান কালের অনেক সামাজিক সমস্যার মীমাংসাও এই সকল রচনার পত্রে পত্রে এখানে-ওখানে লুকাইয়া আছে, সমজদার লোক চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই তাহা দেখিতে পাইবেন।"

২৭. **কাব্য-মালা** / শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত / প্রথম সংস্করণ / ১৩২৭/ প্রকাশক শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর / শান্তিনিকেতন / মূল্য ১৷৷০ টাকা / পৃ [৬] + ১৬৭

আখ্যাপত্রের পিছনে :

শান্তিনিকেতন প্রেসে / শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত / শান্তি-নিকেতন, (বীরভূম)

সূচী। যৌতুক না কৌতুক; গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য; মেঘদূত; সেরাগালি; অন্তিম বাসনা; বাসন্তী পদাবলী; তেতালায় দুপুর রাত্রি; বরাহনগরের উদ্যানে; পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

"প্রকাশকের নিবেদন।

এই গ্রন্থের কবিতাগুলি কবির মধ্যম বয়সের রচনা। ইহা ছাড়া ইহার রচিত আরো কতকগুলি চম্পূ শ্রেণীর কবিতা বহু বৎসর পূর্ব্বে দুই একটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি কালের অতল গর্ত্তে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, এখন আর খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। "পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম" পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদেশে মূল সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে অনুবাদ করা হইয়াছিল। উপনিষদের গভীর বাণীর এমন প্রাঞ্জল ও মধুর অনুবাদ দুর্ল্লভ জানিয়া উহাও এই গ্রন্থভুক্ত করা হইল।"

২৮. **চিন্তামণি** / শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত / প্রথম সংস্করণ / ১৩২৯ / প্রকাশক / শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর / শান্তিনিকেতন। / মূল্য ১৲ টাকা। পৃ [৪] + ২৭০

আখ্যাপত্রের পিছনে :

শান্তিনিকেতন প্রেসে / শ্রীজগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত। / শান্তি-নিকেতন (বীরভূম)

সূচী ॥ হারামণির অন্বেষণ ; সারসত্যের আলোচনা।

২৯. **উপসর্গের অর্থবিচার** / দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর /

রবীন্দ্রনাথ ; 'উপসর্গ-সমালোচনা' প্রবন্ধ / শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ; প্রাসঙ্গিক টীকা / জিজ্ঞাসা / কলিকাতা-৯ ॥ কলিকাতা-২৯ / মূল্য পাঁচ টাকা

বিচিত্রবিদ্যা গ্রন্থমালা : প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৭৯

পৃষ্ঠাসংখ্যা [২]+৪+৯৪

সূচী ॥ ভূমিকা : পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ; উপসর্গের অর্থ-বিচার ; পরিশিষ্ট : প্রাসঙ্গিক টীকা ; অনুষঙ্গ : উপসর্গ-সমালোচনা ; প্রসঙ্গ-কথা : শ্রীপুলিনবিহারী সেন।

'প্রসঙ্গ-কথা'য় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি প্রাসঙ্গিক পত্র সন্নিবিষ্ট।

ইংরেজি

1. Geometry in which the 12th axiom has been replaced by new ones.
2. Ontology ; being a translation of "Tattwa-Vidya", a Bengali work, by Dwijendranath Tagore with subsequent additions and alterations made by him in the original text, 1871, pp. 70
3. Boxometry (১৩২০ ?)

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে এই বাক্সরচনা প্রণালীর চারখানি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে।

খ. পাণ্ডুলিপি

পারিবারিক স্মৃতিলিপি-পুস্তক

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত এই 'পারিবারিক খাতা'য় দ্বিজেন্দ্রনাথের কিছু রচনা পাওয়া যায় :

১. "৫৪ সংখ্যক প্রস্তাব" : সৌন্দর্য : পৃ ৫৫।

২. "৫৬ সংখ্যক প্রস্তাব"।

৩. রাজা ও রানীর সমালোচনা।
"রবি ··· আজ আমি 'রাজা ও রানী' খানা শেষ কল্লুম ··· দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 2. 10. 89"—রবীন্দ্র হস্তাক্ষর

৪. দ্বিজের আশীর্বাদ : S. P. G. "বাবাজী"। পৃ ১২১ ॥ অন্যের হস্তাক্ষরে

৫. রঙ্গপ্রদর্শন পদাবলী : ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ : খেয়াল খাতা থেকে ॥ অন্যের হস্তাক্ষরে

৬. বিজয়ার আশীর্বাদ : "হয়ে ডানা ভাঙ্গা জটায়ু পক্ষী"। পৃ. ১৫১ ॥ অন্যের হস্তাক্ষরে

৭. উড়ো পত্র : "অন্নপ্রাশন দিয়েছিলি যাকে··· ।"

৮. অসবুজপাতার প্রতিবাদ : "সবুজপাতায় উড়ালে নিশান বাঙ্গালীর ছেলে কেহ ··"

৯. সবুজ পত্রের রসোপহার : "সবুজ পত্র রহে না সবুজ···'

এ ছাড়া

'বক্সোমেট্রি'র	৪টি	খাতা
রেখাক্ষর বর্ণমালা	৩টি	খাতা
এবং গীতাপাঠ	উপসংহার	

গ. সাময়িক পত্রে প্রকীর্ণ রচনা

উত্তরা

জ্ঞানাঙ্কুর

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

১৮২৭ ॥

বৈশাখ-আশ্বিন	। আমাদের বর্তমান অবস্থা ?	পৃ. ৪১
অগ্রহায়ণ	। নববর্ষ	১৭
	। বিদ্যা এবং জ্ঞান	১৭৩
	। ষষ্ঠসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ?	
	। সারসত্যের আলোচনা	৩, ২৩, ৩১, ৫০, ৬৭, ৭২, ৮২, ৯৫, ১১১

পুণ্য

১৩১৫ ফাল্গুন-চৈত্র । রেখাক্ষর বর্ণমালা

১৩১৬ আষাঢ়-শ্রাবণ । রেখাক্ষর বর্ণমালা

প্রবাসী

১৩১৫ ॥ আষাঢ়	। চক্ষু পদার্থটা কি ?	১২৪
শ্রাবণ	। দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব	১৯০
ভাদ্র	। চক্ষু পদার্থ টা কি ? (দ্বিতীয় ক্ষেপ)	২৪০
অগ্রহায়ণ	। ধর্ম্মের বলবত্তা	৪৫৭
মাঘ	। একটি চিঠি	৫৭২
১৩১৬ ॥ বৈশাখ	। সহজ শোভন এবং কষ্ট কল্পিত জাতীয়ভাব	৩৫
জ্যৈষ্ঠ	। ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর (প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যাবর্তন উপন্যাস পাঠে লেখা)	১০২
১৩১৮ ॥ বৈশাখ-আশ্বিন		
	। গীতাপাঠের ভূমিকা	৪১, ১১৩, ২১৭, ৩৬০, ৪৯২, ৬২৯
১৩১৮ ॥ কার্তিক-পৌষ		
	। গীতাপাঠ (আবহমান)	৫, ১৫৯, ২৯১
মাঘ	। গীতাপাঠ	৩৭২
১৩১৯ ॥ শ্রাবণ	। গীতাপাঠ	৪৪০
জ্যৈষ্ঠ	। ব্রাহ্ম হিন্দু কি অহিন্দু	১৪৩

মাঘ	। [কৃতি চতুষ্ক । প্রকৃতি, অনুকৃতি, বিকৃতি এবং শেষে চমৎকৃতি] (প্রকৃতির বনে ফুল ফুটান)	পৃ. ৩১৭
	। একটি পুরাতন সংস্কৃত পদ্যের বাংলা অনুবাদ (আর যা দাও বিধি)	৩৩৩
১৩২৭ ॥ অগ্রহায়ণ	। মহাত্মা গান্ধীর মনোগত অভিপ্রায়	১০৬
১৩৩০ ॥ আষাঢ়	। "বিশ্বভারতীর আরতি" । কবিতা ।	৩১৩
	"বিশ্বভারতীর চরণবন্দনার ফল" । কবিতা ।	৩১৩
	—(শান্তিনিকেতন পত্র বৈশাখ ১৩৩০ থেকে উদ্‌ধৃত)	৫৮৪
১৩৩১ ॥ পৌষ	। "বিজন কুটীরে মায়ার ফাঁদ" কবিতা । সম্পাদকের টীকাসহ ।	৩৮৫
	—(শান্তিনিকেতন পত্র, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ থেকে উদ্‌ধৃত)	
১৩৩২ ॥ ফাল্গুন	। দ্বিজের ত্রিজত্ব (কী দেখচিত্র ! কী করুণা)	৫৮৫
	। ত্রিপথগা আনন্দলহরী (সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ)	৫৮৫
চৈত্র	। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা ছয়টি চিঠি	৭৭৫
১৩৪৬ ॥ চৈত্র	। চিঠি / অমিয় চক্রবর্তীকে	৭১৫
	। জন্মদিনের চিঠি (কবিতায়) / দিনেন্দ্রনাথকে	৭৩৬
	। চিঠি / সত্যেন্দ্রনাথকে	৮১৯
	। চিঠি / গুণেন্দ্রনাথকে	৮১৯
১৩৪৭ ॥ বৈশাখ	। উদ্ধৃত (কী গাচ্‌চ তুমি বসিয়া কোণে)	৮১
মাঘ	। মানুষের সাধনা / চিঠি / অমিয় চক্রবর্তীকে	৪৩২

প্রবাসীতে দ্বিজেন্দ্রনাথের বিষয়ে রচনা

১৩১৫ ॥ ভাদ্র	। হারামণির অন্বেষণ নামক পুস্তিকার সমালোচনা	পৃ. ২৫৭
১৩১৮ ॥ ভাদ্র	। একটি ঘোষণা ('ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞান' বিষয়ক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য দুইটি সুবর্ণ পদক দেওয়া হইবে— শ্রীযুক্ত	

বঙ্গদর্শন

বালক

* পৌষ সংখ্যায়; স্বপ্নপ্রয়াণ। [দ্বিতীয় সংস্করণ] শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। শ্রীসতীশচন্দ্র রায় -লিখিত সমালোচনা, পৃ. ৪৯৬

বিশ্বভারতী পত্রিকা

চিঠিপত্র

দ্বিজেন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে রচনা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ পত্রাবলী : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত।
শ্রাবণ ১৩৪৯ পৃ. ২৮

বিনয় ঘোষ ॥ "ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"।
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০ ২৯

শরৎকুমারী চৌধুরাণী ॥ "ভারতীর ভিটা"। কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ ১১২

শান্তাদেবী ॥ চিঠিপত্র দাদামহাশয়কে
[দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর] লিখিত।
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮ ৪৩

ভাণ্ডার

১৩১৩ ॥ শ্রাবণ-ভাদ্র। একটি প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর

ভারতী

১২৮৪ ॥ শ্রাবণ-চৈত্র। তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক ৪, ৪৯, ৯৭, ১৪৫, ২০৯, ২৪১, ৩০০, ৩৫৪, ৪০১

১২৮৫ ॥ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ
। তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক ২৮, ৮২, ১৮৪

ভাদ্র । কাল্পনিক ও বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোক। ('প্রবন্ধমালা'য় অন্তর্ভুক্ত) ২১৪

। অন্তিম বাসনা ॥ গীতিকবিতা
"অস্তাচলে গেল গো দিনমণি" ('কাব্যমালা'য় অন্তর্ভুক্ত) ২২৫

কার্তিক-অগ্রহায়ণ
। ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা (প্যারিসবাসী কোন হিন্দু যুবকের প্রবন্ধ পাঠে লিখিত) ৩১৪, ৩৩৭

পৌষ, মাঘ, চৈত্র
। প্রকৃতি এবং তাহার মূল নিয়ম ৩৮৫, ৪৩৩, ৫৪০

১২৮৬ ॥ বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র-কার্তিক

। প্রকৃতি এবং তাহার মূল নিয়ম পৃ. ২৫, ৭৮, ১০৩, ২০২, ২৬৫, ৩৬৫

অগ্রহায়ণ। "য়ুরোপ যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র" রচনাটির উপর দীর্ঘ টিপ্পনি ৩৫৮

। জ্যামিতির নূতন সংস্করণ ৩৭৭

পৌষ । জ্যামিতির নূতন সংস্করণ ৪১৬

১২৮৭ ॥ বৈশাখ । জ্যামিতির নূতন সংস্করণ। সরল-সীমক ক্ষেত্রধ্যায়। (সচিত্র) ২

আশ্বিন । অধ্যাত্ম-বিদ্যার প্রথম প্রস্তাব ১৫১

চৈত্র । পারিবারিক দাসত্ব : সম্পাদকের মন্তব্য ৫৫৩

১২৮৮ ॥ ভাদ্র-আশ্বিন, পৌষ

। জর্মন দেশীয় তত্ত্ববিৎ কাণ্টকৃত বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের মীমাংসা (অনুবাদ) ২০৬, ২৭৩, ৩৯১

১২৮৯ ॥ ভাদ্র । মনোবৃত্তির সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ ২১৮

মাঘ । দার্শনিক শব্দ ও তাহার সহজ অর্থ ৫০৫

১২৯০ ॥ জ্যৈষ্ঠ । যৌতুক না কৌতুক ৪৯

পৌষ-চৈত্র । স্থান-মান ৩৮৫, ৪৮৯, ৫৫২

১২৯১ ॥ বৈশাখ । স্থান-মান ১

ভারতী ও বালক

১২৯৩ ॥ শ্রাবণ । মানুষ ঘুড়ি ২৩৮

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা ২৩৯

ভাদ্র । দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ ৩০৩

পৌষ । ধর্মের নিয়ম ("এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক মধ্য বাঙ্গলা সম্মিলনী সভায় পঠিত হয়।") ৪৯৭

দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদের সমন্বয় ৫৪৬

* প্রভাতচন্দ্র সেন -লিখিত রচনা : দ্বিজেন্দ্রনাথের টীকা-সহ

১৩০৮ ॥ অগ্রহায়ণ । সেরামাঙ্গি পৃ. ১১৩
১৩১২ ॥ বৈশাখ । সৌন্দর্য্য ৮৭
১৩১৬ ॥ শ্রাবণ । সাধনের সত্য ১৭১
১৩১৯ ॥ ভাদ্র । সালগম-সংবাদ
(দাদামহাশয় ও নাতনীর পত্রালাপ)
১৩২১ ॥ বৈশাখ । অভিভাষণ
("কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি
মহাশয়ের ভাষণ") ৪
১৩২৩ ॥ বৈশাখ । পুষ্পাঞ্জলি ৪
১৩৩১ ॥ জ্যৈষ্ঠ । খেয়াল খাতা ২২৭
। সাধনা ও আনন্দ ২২৭
শ্রাবণ-ভাদ্র । হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরকার কথা ৩৫৮, ৫৩৪

মানসী

১৩১৬ ॥ কার্তিক । জ্ঞানপ্রাণের হরগৌরী ভাব ৪০৫
১৩১৯ ॥ কার্তিক । মুখ ও হাত (ভারতী থেকে উদ্ধৃত) : "নিদর্শন"
শীর্ষক রচনার অন্তর্ভুক্ত । ৫৫৮

মাসিক বসুমতী

১৩৩২ ॥ ফাল্গুন । পাণ্ডুলিপি চিত্র : আচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়
মহাশয়কে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র । ৭৮২
১৩৭১ ॥ ফাল্গুন । পত্র : রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত ।

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ

১৩৭৫ ॥ বৈশাখ । শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বঙ্গ কবিতা ।
শান্তিনিকেতন (শান্তিনিকেতন পত্র, পৌষ ১৩২৬)
অনিলগ্রস্থ পদাবলী (শান্তিনিকেতন পত্র, পৌষ ১৩২৬)
বিশ্বভারতীর আরতি (শান্তিনিকেতন পত্র, বৈশাখ
১৩২৯)

শান্তিনিকেতন পত্র

১৩২৬ ॥ পৌষ । শান্তিনিকেতন। কবিতা

। অনিলগ্রন্থ পদাবলী। কবিতা

১৩২৭ ॥ শ্রাবণ । একটি পুরাণ গীত। পৃ. ১৩৫

আশ্রম সংবাদ: স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুদিনে একটি স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। ৭

অগ্রহায়ণ। দেশীয় তত্ত্ববিদ্যার সাগরমন্থন। ৪৪১

১৩৩০ ॥ বৈশাখ । "বিশ্বভারতীর আরতি" (ভকতি তৈল পুরিয়া প্রদীপ) "বিশ্বভারতীর চরণ-বন্দনার ফল" (বিশ্বমাতার চরণ তাবেজ)

শ্রাবণ. । ঊনবিংশ পুরাণের দুই চরণ শ্লোক: এবং তাহার টীকা "হাস্যরসাত্মক পদ্য হইতে (Comedy হইতে) বীররসাত্মক পদ্য (Tragedy) চুনিয়া বাহির করণ।" ৯৯

কার্তিক । বঙ্গ প্রদর্শনী পদাবলী। ১৫৭

পৌষ । বর্ণমালার অব্যবস্থা। ১৯৩

। ভাষাচার্য্যের উপদেশ।

। হিত বাক্যের তিতো ফল। ১৯৪

চৈত্র । বাংলা ভাষার আঁদাড়ে পাঁদাড়ে দ্বিধরের কেঁচো খুঁড়তে সর্প বাহির। ৪১

১৩৩১ । জ্যৈষ্ঠ । ভবিষ্যৎ বাংলা ব্যাকরণের অঙ্গপোষণার্থে পাথেয় সংগ্রহ। ৮১

আষাঢ় । প্রাণকাঁদানিয়া। পদাবলী। ৯৭

মন-নাচানিয়া। পদাবলী। ৯৭

আশ্বিন । আশ্রম সংবাদ: পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রেখাক্ষর বর্ণমালা নামে একখানি পুস্তক শীঘ্রই বাহির হইবে। এই বর্ণমালা অভ্যাস করিলে অতি সংক্ষেপে বাংলা ভাষা লিখিতে পারা যাইবে।

সবুজ পত্র

সাধনা

চৈত্র। সামাজিক রোগের চিকিৎসা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর। পৃ. ৪৮৪
(এই সংখ্যায় "সামাজিক রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে একটি প্রশ্নে"র উত্তর)। 'সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা' গ্রন্থাকারে (১৮৯১) প্রকাশিত।

১২৯৯ ॥ জ্যৈষ্ঠ। সাধনা— প্রাচ্য ও প্রতীচ্য। (চৈতন্য লাইব্রেরির ষড়বিংশ অধিবেশনে পঠিত) গ্রন্থাকারে (১৮৯২) 'নানাচিন্তা' ২৪

অগ্রহায়ণ। অভিব্যক্তির ধারাত্রয় (সচিত্র)। ৩৬

পৌষ। অভিব্যক্তির ভিত্তিমূল। ১৪৮

মাঘ। বৃত্তিত্রয়ের অভিব্যক্তি। ২৩৭

ফাল্গুন। দার্শনিক মতামত। ৩৩২

চৈত্র। প্রকৃতির অভিব্যক্তি (সচিত্র)। ৪১৪

১৩০০ ॥ জ্যৈষ্ঠ। ত্রিগুণের পরস্পরাপেক্ষিতা। ১৬

আষাঢ়। মহতের অভিব্যক্তি। ১২৯

সাবিত্রী

(লাইব্রেরীতে পঠিত বক্তৃতার একত্র সংকলন। আশ্বিন ১২৯৬ সাল

১২৯৩ ॥ সোনার কাঠি রূপার কাঠি। (৭ম বার্ষিক (১২৯২) প্রবন্ধ)। 'প্রবন্ধমালা'। গ্রন্থাকারে ১৮৮৫।
সোনায় সোহাগা। পৃ. ১৫৩-৬০ (পূর্বপ্রবন্ধের সঙ্গে এর বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলেই এটি এখানে প্রকাশিত হল)। 'প্রবন্ধমালা। গ্রন্থাকারে ১৮৮৫।

সাহিত্য

১৩১৩ ॥ আশ্বিন। বাবুর গঙ্গাযাত্রা, 'বঙ্গের বঙ্গদর্শক' স্বাক্ষরে 'বঙ্গের বঙ্গভূমি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

১৩১৬ ॥ ঘর-পূরণ

॥ উপসর্গের অর্থবিচার

॥ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের) সভাপতির অভিভাষণ

সুপ্রভাত

১৩১৭ ॥ ভাদ্র। কৌতুক গীতিনাট্য: পত্রাকারে রাজনারায়ণ বসু রচিত 'সারধর্মে'র উত্তর।

ঘ. অন্যান্য

অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'রবীন্দ্রনাথ', কলিকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬৭

অনিলকুমার মিত্র, "সাধক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর". 'শান্তিনিকেতন পত্র' শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩৩২

অবনীনাথ রায়, "দ্বিজেন্দ্রনাথ", 'ভারতী' চৈত্র, ১৩৩২

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পুষ্পাঞ্জলি", 'ভারতী', মাঘ ১৩৩২; 'ঘরোয়া', কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৫৮; 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'. কলকাতা: রূপা, ১৩৬৯

অমর দত্ত, 'ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ান', কলকাতা: সান্ত্বনা দত্ত, ১৯৭০

অমিয়কুমার মজুমদার, "দ্বিজেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চিন্তা", 'অমৃত', জুন, জুলাই ১৯৭২

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', কলকাতা: বাক্-সাহিত্য, ১৯৬৫

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, "দান্তে ও আমাদের প্রতিকৃতি", 'একক', দান্তে বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৭২

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য', কলকাতা: পাঠভবন, ১৯৬৯

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'দুই সতীর্থ', *Bulletin of the West Bengal Headmasters' Association* (Vidyasagar Number), October 1970; 'শিল্পিত স্বভাব'। কলকাতা: সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার, ১৩৬৯; "প্রবন্ধের গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ" *Spur* ১৯৬১; "আলোচনা", 'জগদানন্দ রায় স্মরণ', শান্তিনিকেতন: পুস্তক প্রচার সমিতি, ১৩৭৬

অশোকবিজয় রাহা, "কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ", 'তত্ত্বকৌমুদী', মার্চ ১৩৭৩

অসিতকুমার হালদার, 'রবিতীর্থে', কলকাতা : পাইওনিয়ার বুক কোং, ১৩৬৫

ইন্দ্র মিত্র, 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর', কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬১

কাজী আবদুল ওদুদ, 'শাশ্বত বঙ্গ', কলকাতা ১৩৫৮ ; 'বাংলার জাগরণ', কলকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৬৩

কালিদাস ভট্টাচার্য, "দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ", 'তত্ত্বকৌমুদী', মাঘ ১৩৭৩

কানাই সামন্ত, "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ", 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান', কলকাতা : ইন্দিরা ১৩২২ ; "স্বপ্নপ্রয়াণ", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫২ ; 'রবীন্দ্র প্রতিভা', কলকাতা : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, ১৩৬৮

ক্ষিতিমোহন সেন, 'মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ', 'প্রবাসী', চৈত্র, ১৩৪৬

ক্ষুদিরাম দাস, "রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়", কলকাতা : বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিঃ ১৩৬৮

গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী, 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী' কলকাতা : উদ্বোধন ১৩৩৪

চিন্মোহন সেহানবীশ, 'রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী', কলকাতা : মনীষা, ১৯৭৩

জীবনানন্দ দাশ, "রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা", 'কবিতার কথা' : কলকাতা : সিগনেট, ১৩৭০

জীবেন্দ্র সিংহরায়, 'সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ', কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৯৬৯

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কবির নীড়", 'ভারতী', ১৩২৩ ; 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল', কলকাতা : আদি ব্রাহ্ম সমাজ, (১৯১১)

দেবীপদ ভট্টাচার্য, "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও উত্তরাধিকার", 'তত্ত্ব-কৌমুদী', ১-১৬ জ্যৈষ্ঠ, কলকাতা ব্রাহ্ম সমাজ ১৩৭২ ; 'রবীন্দ্র-চর্যা', কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ১৯৭৩

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আত্মজীবনী' সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬২

নবীনচন্দ্র সেন, "ভূমিকা", 'রৈবতক কুরুক্ষেত্র-প্রভাস, সম্পাদনা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৩০

পরিমল গোস্বামী, 'স্মৃতিচিত্রণ', কলকাতা : প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ১৩৬৫

পুলিনবিহারী সেন, 'রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী', প্রথম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী ১৯৭৩ ; -সম্পাদিত, 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', রবীন্দ্রসংখ্যা, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৩-৪, ১৩৭১ ; "রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্র", 'দেশ', রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৩৬৯ ; -সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ' কলকাতা : বাক্ সাহিত্য ১৩৬৮

পুলিনবিহারী সেন, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, "গান্ধীজি ও শান্তিনিকেতন", 'বেতার জগৎ', ১-১৫ জুলাই, ১৯৭০

'প্রগতি' (মাসিক সাহিত্য পত্রিকা), শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭৭

প্রতিমা দেবী, 'স্মৃতি চিত্র', কলকাতা : সিগনেট, ১৩৫৯

প্রফুল্লকুমার দাস, 'রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রসঙ্গ' কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৩৭৫ ; 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত-গবেষণা গ্রন্থমালা' কলকাতা সুরঙ্গমা, ১৩৭৯

প্রফুল্ল দাশগুপ্ত, "নন্দনতত্ত্ব ও মার্কসীয় পদ্ধতি", 'স্বাধীনতা' শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৫

প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৪৫ "ভূমিকা", যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার, 'মেঘদূত', কলকাতা : জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ১৩৭৫

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য 'প্রবেশক', কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৭ ; 'রবীন্দ্রজীবনকথা', কলকাতা : বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা, ১৩৬৮

প্রমথ চৌধুরী, 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর', প্রবন্ধ/স্মৃতিকথা, মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৩২

প্রমথনাথ বিশী, "কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' মাঘ-চৈত্র ১৩৬২; 'বাংলার লেখক', কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৫০ ; "ভূমিকা", 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক', কলকাতা মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৭ ; 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা, ১৩৭২

প্রমোদনাথ সেন সম্পাদিত, স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন বিরচিত, 'প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি', "স্বপ্নপ্রয়াণ", পরিশিষ্ট ক : পত্রাবলী ১-৬, কলকাতা : ১৩৪০

'বঙ্কিম রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', কলকাতা : শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৩২৬

বালগঙ্গাধর তিলক 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতারহস্য (অথবা কর্মযোগ শাস্ত্র)', অনুবাদ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা : আদি ব্রাহ্মসমাজ, ১৯২৪

বিধুশেখর ভট্টাচার্য, "মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ", 'প্রবাসী', বৈশাখ, ১৩২১

বিনয় ঘোষ, "সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র" : ১৮৪০-১৯০৫ দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বীক্ষণ গ্রন্থন ভবন, ১৯৬৩ ; "ঠাকুর পরিবারের আদি পর্ব ও সেকালের সমাজ", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৯,

বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্যায়, কলকাতা, ১৩২০ ; 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, কলকাতা, : হৃষিকেশ সিরিজ, ১৩৩০

'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা : বিদ্যাভারতী, ১৩৭৩

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, 'রবীন্দ্র বিচিত্রা', কলকাতা : সাহিত্যম, ১৩৭৯

'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৯

বুদ্ধদেব বসু, 'কালিদাসের মেঘদূত', কলকাতা : এম. সি. সরকার এণ্ড কোং ১৯৫৭

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' ৬৬, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৪ ; 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' ৬৮, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৪ ; 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' ৪৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫১ (১৯৪৪), তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬৪ (১৯৫৭) ; 'রাজনারায়ণ বসু', 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' ৪৯, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫১ (১৯৪৫), দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬২ (১৯৫৫) ; 'কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য', 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' ২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫১ ; "দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫২

ভবতোষ দত্ত, 'কাব্যবাণী', কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৬৬ ; 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'ভারতকোষ', কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭১ ; 'দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা', 'পরিচয়', সমালোচনা সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৭২

'ভারতকোষ', ১ম থেকে ৫ম খণ্ড, কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭১-১৩৮০

মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', কলকাতা : (আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত), ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

মলিনা রায়, 'চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ', কলকাতা : বিশ্বভারতী ১৯৭১

মোহিতলাল মজুমদার, 'বাংলা কবিতার ছন্দ', কলকাতা, ১৯৪৫

যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার 'মেঘদূত', কলকাতা : জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ১৩৭৫ সন 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা', রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪১ ; 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা', কলকাতা সাহিত্য

পরিষৎ, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৬৩ ; 'জাতীয়তার নব-মন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত', এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১৯৪৫ ; 'বাংলার নব্যসংস্কৃতি', (লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা), কলকাতা : বিশ্বভারতী ১৯৫৮ ; 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত', কলকাতা : মৈত্রী, (নূতন সংস্করণ) ১৩৭৫

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পিতৃস্মৃতি', কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৩৭৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' বিশ্বভারতী, ১৩৪২ ; 'পথে ও পথের প্রান্তে', বিশ্বভারতী, ১৯৩৮ ; 'চিঠিপত্র ৮', কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৭০ ; 'ছিন্নপত্রাবলী', কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৬০ ; 'ছেলেবেলা', কলকাতা : বিশ্বভারতী ১৯৪০ ;'জীবনস্মৃতি', কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৬২ ; 'প্রান্তিক', ১৯৩৮ , 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ', কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৮৯০ শক ; 'সাহিত্য', কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৬৪, ৩য় পুনর্মুদ্রণ সং ; 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', রবীন্দ্র শতবর্ষ-পূর্তি সংস্করণ, কলকাতা : বিশ্বভারতী ; 'রূপান্তর', কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৭২ ; 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', ১-২৭ খণ্ড, অচলিত ১-২ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী ;

রাজনারায়ণ বসু, 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত', সম্পাদনা দেবীপদ ভট্টাচার্য, কলকাতা : এম. সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬০

রাজশেখর বসু, 'কালিদাসের মেঘদূত', কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫২

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' আষাঢ় ১৭৮১

রানী চন্দ, 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ' কলকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৭৯

শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত', কলকাতা : নতুন সাহিত্য ভবন ১৩৬৯

শঙ্খ ঘোষ, 'ছন্দের বারান্দা', কলকাতা : চিত্রক, ১৩৭৮

শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পবিত্রকুমার রায়, নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-দর্শন', শান্তিনিকেতন: Centre of Advanced Study in Philosophy, ১৩৭৫

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, "নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ", 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান', কলকাতা: ইন্দিরা, ১৯৭২

শরৎকুমারী চৌধুরানী, 'ভারতীয় ভিটা', 'ভারতী', শ্রাবণ ১৩২৩

শশিমোহন বসাক, 'হেগেলের পরামার্থবাদ', 'বান্ধব', আশ্বিন- কার্তিক, ১৩১২

শান্তা দেবী, 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা', কলকাতা : প্রবাসী কার্যালয়, তারিখ অনুল্লিখিত

শিবনাথ শাস্ত্রী 'আত্মচরিত', কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ১৩৫১; 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ', কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ১৩৫৯

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, 'হিন্দুমেলার বিবরণ', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', বর্ষ ৬৭ সংখ্যা ২ কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৭

শ্রীঅরবিন্দ, 'গীতার ভূমিকা', পণ্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ১৩৫৮

শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২/১৫, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়

শ্রীশচন্দ্র দাস, 'সাহিত্য সন্দর্শন', কলকাতা: প্রকাশক: শ্রীমতী অর্জুন দাশ, শ্রীমতী নন্দিনী দাশ, ১৯৫৭

সতীন্দ্রনাথ ভৌমিক, 'বড়দাদা ও রবীন্দ্রনাথ', 'সুরঙ্গমা, রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ, কলকাতা: ১৩৬৮

[সত্যেন্দ্রকুমার বসু], 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর', মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৩২

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', কলকাতা: ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯১৫

স্বর্ণকুমারী দেবী, 'পুষ্পাঞ্জলি', 'ভারতী', ১৩৩২

সরলাদেবী চৌধুরানী, 'জীবনের ঝরাপাতা', কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৮

সীতা দেবী, 'পুণ্যস্মৃতি', কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৩৭৮

সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, বর্ধমান: বর্ধমান

সাহিত্য সভা, ১৩৬২ ; 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৩য় খণ্ড, কলকাতা : ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৩৬৮ ; 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা : ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৩৭৩

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী "শান্তিনিকেতনে তিন পুরুষ", 'দিনেন্দ্র রচনাবলী', কলকাতা : ১৩৪৩ ; 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর', স্মৃতিকথা, কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯২৬

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিত্রালী', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩২৬

সুধীরঞ্জন দাশ, 'আমাদের শান্তিনিকেতন'. কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

সুশীল রায় -সম্পাদিত, 'বঙ্গপ্রসঙ্গ', কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫৮; 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', কলকাতা : জিজ্ঞাসা,

সুশোভন সরকার 'সমাজ ও ইতিহাস', কলকাতা : ১৩৬৪

সৈয়দ মুজতবা আলী, "রামানন্দ তর্পণ" 'কথাসাহিত্য', রামানন্দ জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭২ ; 'বড়বাবু', কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭২

সোফোক্লেশ, 'আন্তিগোনে', অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, নিউ দিল্লী : সাহিত্য আকাদেমী, ১৯৬৩

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যাত্রী', ১ম খণ্ড, কলকাতা : অভিযান পাবলিশিং হাউস, ১৩৫৭

স্বর্ণকুমারী দেবী, 'শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পূজনীয় বড়দাদা)' : কবিতা, মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৩২

হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, 'বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ), ১৯৬৯

হরপ্রসাদ মিত্র (সম্পাদক), 'রবীন্দ্র চর্চা', কলকাতা : সুরভি প্রকাশনী, ১৯৬১

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, "আলোচনা", বাঙ্গলা সাহিত্য (বর্তমান শতাব্দীর), ১২৮৭

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঠাকুরবাড়ীর কথা', কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৬

হেমলতা দেবী, "পুষ্পাঞ্জলি", "ভারতী' মাঘ ১৩৩২

A Centenary Volume : *Rabindranath Tagore* : *1861-1961*, New Delhi : Sahitya Akademi, 1961

Alokeranjan Dasgupta, *The Lyric in Indian Poetry* (a comparative study in the evolution of Bengali lyric forms up to the seventeenth century). Calcutta ; Firma K. L. Mukhopadhyaya, 1962 ; *Goethe and Tagore*, Delhi : South Asia Institute, 1973

Atul Chandra Gupta (edited) *Studies in the Bengal Renaissance*, Jadavpur : The National Council of Education, 1957

Alfred von Martin, *Sociology of the Renaissance*, London : Kegan Paul, Trench, Trubner and Co Ltd., 1945

Banarasidas Chaturvedi & Marjorie Sykes, *Charles Freer Andrews*, London : George Allen & Unwin Ltd , 1949

Bipin Chandra Paul, *Beginning of Freedom Movement in Modern India*, Calcutta : Jugayatri Prakashak.

Brajendranath Seal, *New Essays in Criticism*, Calcutta : 1903 ; *Rammohun, the Universal Man*, Calcutta : Sadharan Brahmo Samaj.

Calcutta Review, February 1926

C. F. Andrews, *Andrews' Papers*, Deshbandhu Andrews Centenary, 1971 ; 'Borodada', *Visva-Bharti News*, Santiniketan, February-March, 1971 ; *Representative Writings*, Ed : Marjorie Sykes, New Dalhi : National Book Trust, 1973

David Kopf, *British Oriental and Bengal Renaissance.* California : University of California, 1969

Encyclopaedia Britanica, Vol. 19, Bi-centenary edition, 1968

Ernst Fischer, *The necessity of Art (A Marxist Approach)*, Middlesex : Penguin. 1963

G. D. Khanolkar, *The Lute and the Plough : A Life of Rabindranath*, Bombay : The Book Centre Private Ltd., 1963

Geddes Mac Greger, *Aesthetic Experience in Religion*, London : Macmillan and Co., 1947

George D. Bearce, *British Attitude towords India*, London : Oxford University Press, 1961

H. M. Dasgupta, *Western Influence on 19th Century Bengali Poetry*, Allahabad ; Pilgrim Publishers, 1969

Indian Aesthetics and Art Activity, Simla ; Indian Institute of Advanced Study, 1968

Krishna Kripalani, *Tagore : A Life*, published by the author, 1971 ; *Rabindranath Tagore : A Biography*, Visva-Bharati, Calcutta, 1980.

Lizelle Reymond, *The Dedicated*, (*A biography of Nivedita*) New York : The John Day Company, 1953

Mary Ann Das Gupta (edited and arranged), *Henry Louis Vivian Derozio* (Anglo Indian patriot and poet) : A memorial volume, Calcutta : The Derozio Commemorative Committee, 1973

N. S. V. Ayyar, "A peep into Patanjali" *Visva-Bharati Quarterly* October, 1928, p. 295-302

Narayan Chawdhuri *Maharshi Devendranath Tagore*, New Delhi : Sahitya Akademi, 1973

Niharranjan Roy, *An Artist in Life*, Trivandrum : University of Kerala, 1967

Nemai Sadhan Bose, *The Indian Awakening and Bengal*, Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyaya, 1969

Nirmal Kumar Bose, *Modern Bengal*, Calcutta, Vidyodaya, 1959

Rabindranath Tagore, *Religion of Man*, London : Allen and Urwin, 1931

Rathindranath Tagore, *On the Edges of Time*, Calcutta, Orient Longmans, 1958

S. K. Nandi, "Aesthetics of Abanindranath Tagore", *Indian Aesthetics and Art Activity*, Indian Institute of Advanced Studies, Simla : 1968

Sophia Dobson Collet, *The Life and Letters of Raja Rammohan Roy*, Calcutta : Sadharan Brahma Samaj, 1962

Swami Satyananda, *World Philosopy* (a Synthetic Study), Book I, Calcutta : Sree Sree Ramkrishna Sevayatan, 1959

Talcot Persons, *The Social System*, U, S. A. : Davixtock Publications Ltd., 1952

Tandulkar D. G., *Mahatma*, vols. 1-8 Bombay, 1952

The National Flag, Modern Review, June 1931, p. 684

Indira Devi Choudhurani, "Dwijendranath Tagore, In Memoriam" *The Visva-Bharati Quarterly*, (Silver Jubilee Issue), Volume XXV, number 3 and 4, 1960

Visva-Bharati News, February-March 1971, Santiniketan

নির্দেশিকা